উপদেশ অথবা নীতিকথা, যাহাকে কাব্যশ্রেণীতে ভুক্ত করা যাইতে পারে না। কিন্তু সংস্কৃত ভাষার সংহতিগুণে এবং সংস্কৃত শ্লোকের ধ্বনিমাধুর্য্যে তাহা পাঠকের চিত্তে সহজে মুদ্রিত হইয়া যায় এবং সেই শব্দ ও ছন্দের ঔদার্য্য শুষ্ক বিষয়ের প্রতিও সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্য অর্পণ করিয়া থাকে। কিন্তু বাঙ্গলায় তাহাকে ব্যাখ্যা করিয়া অনুবাদ করিতে গেলে তাহা নিতান্ত নির্জ্জীব হইয়া পড়ে। বাঙ্গলা উচ্চারণে যুক্ত অক্ষরের ঝঙ্কার, হ্রস্ব দীর্ঘস্বরের তরঙ্গলীলা, এবং বাঙ্গলা পদে ঘনসন্নিবিষ্ট বিশেষণবিন্যাসের প্রথা না থাকাতে সংস্কৃত কাব্য বাঙ্গলা অনুবাদে অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর শুনিতে হয়। যতিপঞ্চকের নিম্নলিখিত শ্লোকে বিশেষ কোন কাব্যরস আছে তাহা বলিতে পারিনা —

পঞ্চাক্ষরং পাবনমুচ্চরন্তঃ
পতিং পশূনাং হৃদি ভাবয়ন্তঃ
ভিক্ষাশিনো দিক্ষু পরিভ্রমন্তঃ
কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ।—

তথাপি ইহাতে যে শব্দযোজনার নিবিড়তা ও ছন্দের উত্থানপতন আছে তাহাতে আমাদের চিত্ত গুণী হস্তের মৃদঙ্গের ন্যায় প্রহৃত হইতে থাকে; কিন্তু ইহার বাঙ্গলা পদ্য অনুবাদে তাহার বিপরীত ফল হয়;—

পঞ্চাক্ষর যুক্ত মন্ত্র পরম পাবন,
একান্তেতে সদা যারা করে উচ্চারণ;
নিখিল জীবের পতি, পশুপতি দেবে,
হৃদয়েতে ভক্তিভরে সদা যারা ভাবে;
ভিক্ষাশী হইয়া, সুখে সর্ব্বত্র চারণ,
কৌপীনধারীরা হেন, বটে ভাগ্যবান্

এক ত, আমরা পাঠকদিগকে ভিক্ষাশী ও কৌপীনধারী হইতে উপদেশ দিই না, দ্বিতীয়তঃ বাঙ্গলার নিস্তেজ পয়ার ছন্দে সে উপদেশ শুনিতেও শ্রুতিমধুর হয় না। একস্থানে দেখা গেল "পাণিদ্বয়ং ভোক্তুমমন্ত্রয়ন্তঃ" পদটিকে অনুবাদে "আহারের পাত্ররূপ শুধু বাহুদ্বয়" করা হইয়াছে; বলা বাহুল্য, এস্থলে পাণিদ্বয়ের স্থলে বাহুদ্বয় শব্দের প্রয়োগ সমুচিত হয় নাই।

নীতিশতক বা সরল পদ্যানুবাদসহ চাণক্যশ্লোক। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত। মূল্য দুই আনা মাত্র।

চাণক্যশ্লোকের নীতিগুলি যে নূতন তাহা নহে কিন্তু তাহার প্রয়োগনৈপুণ্য ও সংক্ষিপ্ততাগুণে তাহা আমাদের দেশে সাধারণের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছে। যে সকল উপদেশ জীবনযাত্রায় সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য তাহাকে সরল লঘু এবং সুডৌল করিয়া গড়িতে হয়; তাহাকে মুখে মুখে বহনযোগ্য এবং হাতে হাতে চালনযোগ্য করা চাই; চাণক্যশ্লোকের সেই গুণটি আছে, এই জন্য তাহা আমাদের সংসারের কাজে পুরাতন মুদ্রার মত চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই ব্যক্ত করিয়াছি বাঙ্গলা ছন্দে সংক্ষিপ্ততা ও ত্বরিৎগতি না থাকাতে সংস্কৃতের জোড়া কথাকে ভাঙ্গিয়া এবং ছোট কথাকে বড় করিয়া গুরু কথার গুরুত্ব এবং লঘু কথার লঘুত্ব উভয়ই নষ্ট করা হয়। মহতের আশ্রয়ে থাকিলে সকল সময়ে যদি বা কোন প্রত্যক্ষ উপকার না পাওয়া যায় তথাপি তাহার অপ্রত্যক্ষ সুফল আছে এই কথাটিকে চাণক্য সংক্ষেপে সুনিপুণভাবে বলিয়াছেন;—

সেবিতব্যো মহাবৃক্ষঃ ফলচ্ছায়াসমন্বিতঃ।
যদি দৈবাৎ ফলং নাস্তি ছায়া কেন নিবার্য্যতে॥

মনে রাখিবার এবং আবশ্যকমত প্রয়োগ করিবার পক্ষে এ শ্লোকটি কেমন উপযোগী! ইহার বাঙ্গলা অনুবাদে মূলের উজ্জ্বলতা

এবং লাঘবতা হ্রাস হইয়া এরূপ শ্লোকের কার্য্যকারিতা নষ্ট করিয়াছে ;—

ফল আর ছায়া যাতে আছে এ উভয়,
এরূপ তরুর তলে লইবে আশ্রয়।
দৈববশে ফল যদি নাহি মিলে তায়,
সুশীতল ছায়া তার বল কে ঘুচায়।

দুটিমাত্র ছত্রে ইহার অনুবাদ হওয়া উচিত ছিল।

রাণী।

মধুর অধরে তার প্রভাতের প্রভা,
লাবণ্যললিত বাহু নিন্দিছে নবনী ;
নিঃশ্বাসে নন্দন গন্ধ, ভালে শুভ্রশোভা ;
চরণপরশে রক্ত অলক্ত অবনী।
অখণ্ডসুন্দর তনু অনিন্দ্য অতুল,
গীতগন্ধবর্ণভরা সুধার ভাণ্ডার,
এরি মাঝে জ্বলিতেছে জ্যোতিষ্কের মত
প্রশান্ত প্রস্ফুট প্রাণ অনন্ত অপার।
অন্তরের আশা তার তৃষার্ত্ত ভ্রমর
সৌন্দর্য্য সঙ্গীতপুঞ্জ তুলিছে গুঞ্জরি ;
হৃদয়ের প্রেম তার রেখেছে ফুটায়ে
জীবন-নিকুঞ্জবনে যৌবন-মঞ্জরী।
রাণী হয়ে করিয়াছে রাজত্ব স্থাপন
আমারি হৃদয়ে তার পদ-পদ্মাসন॥

সাধনা।

য়ুরোপীয় সঙ্গীত।

পৌষ মাসের সাধনায়, 'সঙ্গীতের গঠনরীতি' শীর্ষক প্রবন্ধে, আমরা সঙ্গীতচর্চ্চার বর্ত্তমান প্রণালীর ত্রুটি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম। যতপ্রকার ত্রুটি আবিষ্কার করা যাইতে পারে, সবগুলি সংশোধন হইলে, আমাদের বর্ত্তমান প্রণালী সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল, বলা যাইতে পারে।

তথাপি কেবল দোষ সংশোধনে আবদ্ধ থাকিলে, উন্নতিপথে অল্পদূরমাত্র অগ্রসর হওয়া যায়। অন্তরের দোষের দুরীকরণ যেমন আবশ্যক, বাহির হইতে নূতন গুণের আনয়নও তেমনি আবশ্যক।

য়ুরোপীয় সঙ্গীতরাজ্য আমাদের সম্মুখে প্রসারিত রহিয়াছে;--ইচ্ছা হইলে, উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিলে, আমরা তাহার মধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে পারি, এবং অনুসন্ধান করিয়া যদি আমাদের দেশের সঙ্গীতকে অলঙ্কৃত করিবার উপযুক্ত কোন রত্ন পাওয়া যায়, তাহা হইলে পরিশ্রম সার্থক হইবে, তাহার আর সন্দেহ কি?

প্রথমতঃ সকল বিষয়েই য়ুরোপীয়দের কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া বিস্তর শিক্ষা লাভ করা যায়। শ্রেষ্ঠত্ব লাভের জন্য প্রত্যেক ছোট-খাট বিষয়ে যে কত দূর পর্য্যন্ত পরিশ্রম ও যত্ন করা যাইতে পারে,

তাহা য়ুরোপীয় দৃষ্টান্তের পূর্ব্বে, আমাদের দেশের কাহারো কল্পনাতেও আসিত না। উপস্থিত ক্ষেত্রেও সে কথা খাটে। প্রত্যেক যন্ত্রের গঠন সম্বন্ধে উহারা কত চিন্তা করিয়াছে। কোন্ জাতীয় কাঠ ব্যবহারে কি ফল পাওয়া যায়—সে কাঠ কি ভাবে কাটিলে অল্প আয়তনে অধিক শব্দ পাওয়া যায়—তন্ত বা তারের কত লম্বাই, ওজন, টান প্রভৃতি হইলে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর আওয়াজ পাওয়া যায়—ইত্যাদি। ইহার ফলে উহাদের সামান্য ব্যাঞ্জো বা মাণ্ডোলীন যন্ত্র, যাহা ভিক্ষুকেরা রাস্তায় রাস্তায় বাজাইয়া বেড়ায়, তাহা গঠনে এবং আওয়াজে আমাদের ভাল ভাল সেতার প্রভৃতিকে লজ্জা দিতে পারে। শুধু তাহা নহে। কোন্ ভঙ্গীতে বসিলে বা দাঁড়াইলে শরীরের মাংসপেশীসকল ভালরকম কার্য্য করিতে পারে—কি ভাবে যন্ত্র ধারণ করিলে অঙ্গুলিচালনার সুবিধা হয়—তন্ত বা তারের কোন্ স্থানে ছড় বা মেজরাফ লাগাইলে আওয়াজের কিরূপ তারতম্য ঘটে—এ সকল বিষয়েও উহারা মনোযোগ দিয়া থাকে এবং এইরূপে নিজ শরীর এবং বাদ্যযন্ত্র উভয়কেই পূর্ণমাত্রায় কাজে খাটাইতে সক্ষম হয়।

ইহা ত গেল সঙ্গীতের উপকরণের কথা—বাহিরের কথা। এখন দেখা যাক উহাদের সঙ্গীতের ভিতর হইতে কি পাওয়া যায়। আমাদের সঙ্গীতের সহিত উহাদের সঙ্গীতের সাতটি মূল সুর এবং পাঁচটি কোমল সুরের যা ঐক্য। ইহা ছাড়া আর সকলই ভিন্ন। তবে প্রধানতঃ দুইটি মূল প্রভেদের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

১। সুরের গঠনপ্রণালীর ভিন্নতা।

২। য়ুরোপীয় সঙ্গীতে স্বরমিশ্রণ প্রণালীর প্রাধান্য এবং দেশীয় সঙ্গীতে উহার অভাব।

এই দুইটির মধ্য হইতে গ্রহণ করিবার উপযুক্ত কিছু পাওয়া যাইতে পারে কি না, বিচার করিবার পূর্ব্বে স্মরণ রাখা উচিত. আমরা দেশী সঙ্গীত পরিবর্ত্তন করিতে বসি নাই, উহার জন্য অলস্কার সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি মাত্র। যেহেতু, য়ুরোপীয়দের অনেকগুলি ভাল গুণ আমাদের দেশে স্থান পাওয়া বাঞ্ছনীয় হইলেও হঠাৎ সাহেব সাজিতে গেলে কোন উপকার হয় না, পরন্তু ফিরিঙ্গিতে পরিণত হইতে হয়; অথবা যেহেতু, য়ুরোপীয় সাহিত্যের প্রভাবে বঙ্গসাহিত্যের অনেক উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও, ভাষার গঠনের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া য়ুরোপীয় ভাব ঢুকাইতে গেলে, বঙ্গভাষার মর্য্যাদা রক্ষা হয় না; সেইহেতু দেশী সঙ্গীতের উন্নতি করিতে গিয়া উহার দেশীত্ব নাশ না হয়, তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক।

এখন বিবেচ্য এই যে আমাদের সঙ্গীতের বিশেষত্ব কোন্ খানে? কতখানি এবং কিরূপে পরিবর্ত্তন করিলে উহা ক্ষুণ্ণ হইবে? আমাদের বিবেচনায় সুরের গঠনপ্রণালী বজায় রাখিলে আর কোন গোল হইবে না। গঠন যে একেবারে অপরিবর্ত্তনীয় তাহা নহে। আদিম কাল হইতে আমাদের সঙ্গীতের গঠন নিশ্চয়ই অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও সম্ভবতঃ পরিবর্ত্তিত হইবে। কিন্তু এ পরিবর্ত্তন স্বাভাবিক নিয়মানুসারে হইয়া থাকে সুতরাং উহাতে আমাদের হস্তক্ষেপ না করাই ভাল। অতএব য়ুরোপীয় গঠনপ্রণালী হইতে আমরা বিশেষ কিছু আদায় করিতে পারিব না।

তবে য়ুরোপীয় সুর হইতে যে আমরা কোন রকম উপকার পাইতে পারিব না, এমন নহে। দেশী সুরের গঠন যেমন আছে তেমনি রাখিয়া আমরা উহাদের সুর গ্রহণ করিতে পারি। গীতি-

নাট্যে কতকগুলি বিশেষ অবস্থায় বিশেষ সুর দরকার। এ স্থলে সচরাচর চলিত সুর দিলে ভাবের সে বিশেষত্ব রক্ষা হয় না। এই জন্য গীতিনাট্যে বিদেশী সুর অনেক সময়ে খুব কাজে লাগে। কতকগুলি গুজরাটী গীতিনাট্যে বিলাতি সুর এরূপ কাজে লাগান হইয়াছে। বাঙ্গলায়ও, সাধনাসম্পাদক-মহাশয়কৃত 'বাল্মীকি-প্রতিভা' গীতিনাট্যে, অনেকগুলি য়ুরোপীয় সুর ব্যবহার করিয়া ফল পাওয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া অন্য গানেও সুযোগমত বিলাতী সুর প্রয়োগ হইতে পারে। গোয়াদ্বীপের নিকটবর্ত্তী স্থানে অনেক পোর্ত্তুগীজ সুর চলিত আছে। মান্দ্রাজ অঞ্চলেও ইংরাজি সুরের (বেশীর ভাগ মজার গানে) ব্যবহার দেখা যায়। সব গুলি কিছু উপযোগিতা হিসাবে নির্ব্বাচিত অথবা উপযুক্ত কথার সহিত বসান হয় নাই। কিন্তু ভাল (অর্থাৎ দেশী ভাবের উপযোগী) সুর যদি বাছিয়া লওয়া হয় এবং তাহাতে উপযুক্ত কথা বসান হয় তাহা হইলে অনেকগুলি ভাল গান তৈয়ারী হইতে পারে।

অবশ্য এ দোআঁসলা গানগুলাকে খাঁটি য়ুরোপীয় ঢঙে গাহিলে আমাদের কাণে বড় অদ্ভুত লাগিবে সেই জন্য দেশী খোঁচখাঁচ দিয়া একটু পরিবর্ত্তন করিয়া লওয়া আবশ্যক। স্বরলিপির স্থানে দুইটি ঈষৎ পরিবর্ত্তিত গানের নমুনা দেওয়া যাইতেছে। প্রথমটির সুর পর্ত্তুগীজ—ভাবে বোধ হয় ইহা কিছু বদলান হইয়াছে। দ্বিতীয়টি স্কচ্—উহা প্রায় খাঁটি অবস্থাতেই আছে। এই দুইটি দৃষ্টান্ত হইতে পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে বাঙ্গালা কথার সহিত বিলাতী সুর কেমন থাপ খাইতে পারে। * । এইরূপ গানের সুর

* ভারতী ১৬শ ভাগ বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত "মন্দং মন্দং" এবং ভারতীর অপর এক সংখ্যায় প্রকাশিত "সকাতরে ওই" এই দুইটি গান পর্ত্তুগীজ সুরের আর দুইটি দৃষ্টান্ত।

সংগ্রহ ছাড়া য়ুরোপীয় স্বর-গঠনপ্রণালী হইতে আর বড় কোন উপকার পাওয়া যাইবে না।

কিন্তু, স্বরমিশ্রণ প্রণালী আমাদের সঙ্গীতে সম্ভবমত প্রয়োগ করা হইলে, বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা। আমাদের সঙ্গীতে যে স্বরমিশ্রণ মোটেই করা হয় না তাহা নহে। গান গাহিবার সময়ে একটি সুর ধরিয়া রাখিলে এক রকমের স্বরমিশ্রণ হয়। গানের প্রত্যেক স্বরের সহিত এই খরজ যুক্ত হইতে থাকে। তানপুরায় ষড়জপঞ্চমের রেশে অথবা সেতারাদির ষড়জপঞ্চমের ঝঙ্কারে মূল সুরের প্রত্যেক স্বরের সহিত উক্ত দুইটি স্বর যুক্ত হইতে থাকে। ইহা অপেক্ষা জটিল স্বরসংযোগও দৈবাৎ শুনা যায় যথা, যখন গানের সহিত এসরাজ বা সারঙ্গী বাজিতেছে, গাইয়ে যখন তান দিতেছেন বাজিয়ে তখন সাদাসিধা ভাবে বাজাইতেছেন, আবার গাইয়ে যখন সুরে ফিরিয়া আসিতেছেন তখন বাজিয়ে তান দিতেছেন।

কিন্তু, এ সকল থাকিলেও, ইহার ভিতরকার নিয়মটা কেহ জানেন না - সে বিষয়ে কেহ চিন্তাও করেন না; সেই জন্য এক সুর গাওয়া বা বাজান অপেক্ষা, এইরূপ স্বরমিশ্রণের দ্বারা, কিছু সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয় না—বরং অনেক সময়ে সৌন্দর্য্য খর্ব্ব হইতে দেখা যায়। মনে করা যাক তানপুরার সহিত গান হইতেছে। গাইয়ে ষড়জ পঞ্চম অথবা গান্ধার উচ্চারণ করিবার সময়ে কোন গোল নাই, কিন্তু রেখাব অথবা ধৈবতের সঙ্গে তানপুরায় ষড়জ-পঞ্চমের যোজনা কিছু বিরক্তিজনক বোধ হইবে, * এবং নিখাদ অথবা মধ্যমের সহিত (কোমল সুরগুলির ত কথাই নাই) ষড়জ-

* পূর্ব্ব নোটে উল্লিখিত "সকাতরে" গানের স্বরলিপিতে প্রথম প্রণালী সঙ্গতের ভাল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

পঞ্চম একেবারেই কর্কশ লাগিবে। গান যখন চলিতেছে তখন, কতকটা গানের দিকে সমস্ত মনোযোগ থাকাতে, কাহারো কানে ইহা ততটা নাও ঠেকিতে পারে; কিন্তু হার্মোনিয়ম যন্ত্রে উল্লিখিত স্বরগুলি একত্র বাজাইয়া দেখিলে, স্বরজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেরই পীড়া বোধ হইবে। এখন সকলেই স্বীকার করিবেন যে, যে জিনিষ মনোযোগ এবং শিক্ষার অভাবে পার পাইয়া যায় অথচ শিক্ষিত ব্যক্তি মনোযোগ দিলে নিতান্তই কর্কশ বোধ করে, তাহা সংশোধনের যোগ্য। এ স্থলে য়ুরোপীয় প্রণালী অবলম্বন করিলে কি হইত? য়ুরোপীয়েরা আমাদের তানপুরার ন্যায় গানের সহিত গিতার যন্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকে। এই যন্ত্রে সেতারের মত পর্দ্দার দ্বারা স্বর বদলাইবার উপায় আছে সুতরাং উহারা ষড়জ, গান্ধার অথবা পঞ্চম গাহিবার সময়ে যেমন ষড়জ পঞ্চমের ঝঙ্কার দিতে পারে তেমনি রেখাব, মধ্যম অথবা ধৈবত উচ্চারণের সময় রেখাব ধৈবতের ঝঙ্কার দিতে পারে এবং এইরূপে স্বরমিশ্রণের নিয়মানুসারে প্রত্যেক স্বরের সহিত তাহার উপযুক্ত স্বরসমষ্টি যোজনা করিতে পারে।

এই নিয়মগুলি আমাদের প্রথমতঃ শিক্ষা করা উচিত। কিন্তু শুধু য়ুরোপীয় শিক্ষাপুস্তক হইতে নিয়ম শিখিলেই যথেষ্ট হইবে না। সেগুলি আমাদের সঙ্গীতে প্রয়োগ করিবার নিয়ম আবিষ্কার করিতে হইবে। স্বরমিশ্রণ শাস্ত্রে দুই শ্রেণীর নিয়ম আছে। এক শ্রেণীয়কে প্রাকৃতিক বলা যাইতে পারে। কোন্ দুই বা অধিক স্বর যুক্ত হইলে ভাল শুনাইবে ইহা বৈজ্ঞানিক নিয়ম জানিলে বলিয়া দেওয়া যায়। এ জাতীয় নিয়ম সকল সঙ্গীত শাস্ত্রে বজায় থাকিতেই হইবে—ইহা অপরিবর্ত্তনীয়। কিন্তু আর এক শ্রেণীর নিয়ম আছে যাহাতে কোন্ স্বরসমষ্টির পর কোন্‌টি থাকিলে রচনা

ভাল হয় তাহার বিধান পাওয়া যায়। এ বিধান সুরের গঠন-প্রণালী অনুসারে বদলাইবার কথা এবং সম্ভবতঃ য়ুরোপীয় সঙ্গীতে এবং আমাদের সঙ্গীতে ভিন্ন হইবে।

এ সব বিষয়ে বিচার করিতে হইলে বোধ জন্মান আবশ্যক এবং আমাদের দেশে য়ুরোপীয় সঙ্গীতের চর্চ্চা ছাড়া উপায়ান্তর নাই। দুরদৃষ্টবশতঃ আমরা য়ুরোপীয় সঙ্গীতের প্রথম নমুনা-স্বরূপ খেলো ইংরাজি গান শুনিতে পাই। সেগুলিকে যে আমরা শৃগাল কুক্কুরের ডাকের সহিত তুলনা করিয়া থাকি তাহা কেবলমাত্র আমাদের বোধশক্তির অভাবে নহে। য়ুরোপীয়েরাও এইগুলিকে ঠাট্টা করিয়া থাকেন। তাহা ছাড়া গলার আওয়াজ সম্বন্ধে য়ুরোপীয়দের সহিত আমাদের রুচির বিশেষ ভেদ আছে। উহারা যে রকম গলায় গান গাহিতে ভালবাসে তাহা অভ্যাস হইতে আমাদের একটু সময় লাগে। কিন্তু রসজ্ঞ শিক্ষার্থী যদি প্রথম নমুনায় পিছপাও না হইয়া ইতালীয় জর্ম্মাণ প্রভৃতি সঙ্গীতের চর্চ্চা করেন তাহা হইলে ভরসা করিয়া বলা যাইতে পারে যে তিনি পরিশ্রমের শতগুণ মূল্য পাইবেন।

তবে এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে প্রথমবার উহাদের কোন শ্রেষ্ঠ বাদ্যরচনা শুনিলেই কিন্তু ভাল লাগিবে না। এমন কি বার দুইতিন শুনিলেও সহসা রসগ্রহণ ক্ষমতা জন্মাইবে না। আমাদের পক্ষে উহাদের সঙ্গীতের রসগ্রহণ করা দুই কারণে বিশেষ শক্ত। প্রথমতঃ উহাদের সুরগঠন প্রণালীর সহিত পরিচয় না থাকাতে কোন স্বরশ্রেণীকে একটা সুর বলিয়া হয়ত ধরিতেই পারা যাইবে না। দ্বিতীয়তঃ একটি রচনার সমগ্র স্বরবিন্যাসের মধ্য হইতে কোন কয়টি স্বরের দ্বারা মূল সুরটি গঠিত হইতেছে এবং কোন্ স্বরগুলি আনুষঙ্গিক ভাবে ব্যবহার করা হই-

তেছে মাত্র, ইহা পৃথক করিয়া ধরা অভ্যাস ব্যতীত একপ্রকার অসম্ভব।

এই আনুষঙ্গিক স্বরগুলি মূল সুরের সহিত দুই ভাবে যুক্ত হইয়া থাকে। এক প্রণালী অপেক্ষাকৃত সহজ। ইহাতে প্রধান সুর স্বতন্ত্র ভাবে বাজিতে থাকে এবং খাদের দিকের কতকগুলি স্বরসমষ্টি সঙ্গে সঙ্গে তাল রাখিয়া সঙ্গতের কার্য্য করে। এইরূপ সঙ্গতের দ্বারা কতকটা তানপূরার অনুরূপ কানে সুর থাকে কতকটা তবলা জাতীয় যন্ত্রের অনুরূপ নানা বোলের দ্বারা তালের বিচিত্র ভাব প্রদর্শন করা হয়, এবং উপরন্তু প্রধান সুরের ভাবের ব্যাখ্যার কার্য্যও হইয়া থাকে। অতএব এ প্রণালী যে আমাদের সুরের সঙ্গৎ হিসাবে বিশেষ কাজে লাগিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

সাদাসিধা ভাবের সুরের পক্ষে—উল্লিখিত প্রণালীর সঙ্গৎ যথেষ্ট। কিন্তু এমন অনেক সুর আছে যাহার মধ্য হইতে অনেক জটিল ভাব আদায় করা যাইতে পারে। তাহার উপায়স্বরূপ য়ুরোপীয় সঙ্গীতে আর এক প্রণালী ব্যবহার হইয়া থাকে। ইহাতে মূল সুরের সঙ্গৎ হিসাবে পূর্ব্ব প্রণালীর ন্যায় কতকগুলি গঠনহীন স্বরসমষ্টির পরিবর্ত্তে, দুইতিনটি স্বতন্ত্র সুর তাহার সঙ্গে সঙ্গে বাজিতে থাকে। এই সুর কয়টির প্রত্যেক ছত্র পরস্পরের সহিত স্বরমিশ্রণের নিয়মানুসারে মিলিত হইতে থাকে। এইরূপে যে সৌন্দর্য্যের কত দূর পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইতে পারে তাহা যে না শুনিয়াছে তাহার ভালরূপ ধারণা হওয়াই কঠিন। পূর্ব্ব প্রণালীতে মনের কোন একটি ভাবকে স্বতন্ত্র করিয়া লইয়া তাহার নানা অবস্থা দেখান যাইতে পারে।

মনে করা যাক প্রিয়বিয়োগশোকে কেহ কাতর আছে; সমস্ত দিনের বৈষয়িক ঝঞ্ঝাটের পর, শরীর মনের ক্লান্তির সঙ্গে

সঙ্গে শোকেরও কিয়ৎ পরিমাণে উপশম হইয়াছে; বাহ্য প্রকৃতি, জ্যোৎস্নালোক এবং মলয় বাতাসের দ্বারা, মনকে শান্তি প্রদান করিবার সাহায্য করিতেছে; সম্ভবতঃ উপস্থিত দুঃখের তীব্রতার হ্রাস হওয়াতে পূর্ব্ব সুখদুঃখের স্মৃতি মনের মধ্যে প্রবাহিত হইতেছে। ঐ অবস্থায় বাহিরে শান্তি, মনে সুখদুঃখপ্রবাহ, কিন্তু তথাপি উভয় ভাবের মধ্য দিয়া, উভয়কেই অতিক্রম করিয়া, দুর্দ্দমনীয় শোক মাঝে মাঝে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবে, সে চলিয়া গেছে, আর আসিবে না,—এই কথা, একঘেয়ে সুরের ন্যায়, আর সমস্ত ভাবপ্রবাহের সহিত, কখন প্রধান কখন অপ্রধান আকারে, ধ্বনিত হইতে থাকিবে। এইরূপ একটি অবস্থা সুর-সম্মিশ্রণের দ্বারা অতি সুন্দররূপে চিত্রিত করা যায়। শুধু তাহা নহে। এই দ্বিতীয় সুরসম্মিশ্রণ প্রণালীর দ্বারা নাট্যকাব্যের অনুরূপ রচনা সম্ভব—যাহাতে, এক পক্ষে ছত্রে ছত্রে গীতিকাব্যের সৌন্দর্য্য অনুভব করা যায়, প্রত্যেক লোকের চরিত্রগঠনের নৈপুণ্যে চমৎকৃত হইতে হয়, অপর পক্ষে সমগ্র রচনার কল্পনার মহত্ত্ব-জনিত আনন্দও উপভোগ করা যায়।

শিক্ষার্থীকে পুনর্ব্বার সাবধান করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য যে এ সকল জটিল উঁচুদরের য়ুরোপীয় সঙ্গীতের রসগ্রহণে ইচ্ছুক হইলে পরিশ্রম আবশ্যক। কিন্তু এ পরিশ্রমের আবশ্যকতা দোষস্বরূপ গণ্য হইতে পারে না। উচ্চশ্রেণীর সুখের অধিকারী হইতে গেলে নিজেকে তাহার উপযুক্ত করিবার নিমিত্ত কষ্ট স্বীকার করা অনিবার্য্য। যে লোক মেঠোসুরে অভ্যস্ত, কালোয়াতী গান তাহার ভাল না লাগিতে পারে কিন্তু সেটা কালোয়াতী গানের দোষ নহে। তেমনি য়ুরোপীয় সঙ্গীতের রসগ্রহণ করিতেও বিশেষ শিক্ষার আবশ্যক।

জর্ম্মণির একজন শ্রেষ্ঠ ওস্তাদ বেটোফেনের বাজনার স্বর-সম্মিশ্রণপ্রণালীর দ্বারা সঙ্গীতের উৎকর্ষ কতদূর হইতে পারে তাহার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কিন্তু উহাঁর কোন রচনা, প্রথমবার শুনিলে, অনভ্যস্ত ভারতবর্ষীয় শ্রোতার নিকট কতকগুল নিরর্থক শব্দের মত বোধ হইবে। যদি সে ব্যক্তি, পরিশ্রম করিয়া সাধারণ য়ুরোপীয় গানবাজনা শিক্ষার পর, আবার সেই একই রচনা শোনে তাহা হইলে স্থানে স্থানে হয়ত সুরের আভাস পাইতে থাকিবে। শুভাদৃষ্টক্রমে যদি এই একই রচনা বার কতক শিক্ষার্থীর কর্ণে পতিত হয়, তাহা হইলে সে আবিষ্কার করিবে যে জিনিষটি ক্রমে বড়ই ভাল লাগিতে আরম্ভ করিয়াছে। এরূপ বার দশেক আবৃত্তির পর, তবেই এই এক রচনার মধ্যে বুঝিবার কতটা আছে তাহা সে প্রকৃত পক্ষে ধরিতে পারিবে। সে দেখিবে যে, য়ুরোপীয় সঙ্গীতে সে এক অগাধ সৌন্দর্য্যখণি প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং অশিক্ষিত অবস্থায় তাহার নিকট যাহা প্রস্তররাশি বলিয়া বোধ হইত, এক্ষণে তাহার প্রত্যেকটি এক একটি অমূল্য রত্ন বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে।

যে সাধন করিতে হইবে তাহা কিছু কঠিন, কিন্তু যে ফল পাওয়া যাইবে তাহা ততোধিক সুখদায়ক—ইহাই আমাদের অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতানুসারে, সঙ্গীতানুরাগী পাঠকগণের নিকট আমাদের বক্তব্য এই যে, অভ্যাস এবং সংস্কারের জড় বাধা অতিক্রম করিয়া মানুষের আনন্দের পরিধি বিস্তৃত করিয়া দেওয়া আমাদের পরম কর্ত্তব্য। যেমন ইংরাজি সাহিত্য হইতে অকুণ্ঠিত চিত্তে আমরা বিচিত্র ভাব গ্রহণ করিতেছি, তেমনি য়ুরোপীয় সঙ্গীত হইতে সৌন্দর্য্য আহরণ করিয়া আমাদের স্বদেশীয় সঙ্গীতের আনন্দ-ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিয়া তুলিলে তদ্দ্বারা আমাদের

দেশানুরাগ ক্ষুণ্ণ হইবে না, পরন্তু তাহাতে আমাদের দেশহিতৈষিতাই চরিতার্থ হইবে।

স্বরলিপি।

কর্ণাটী ঝিঁঝিট—কাওয়ালি।

বড আশা করে এসেছি গো কাছে ডেকে লও
ফিরায়ো না জননী।
দীনহীনে কেহ চাহে না তুমি তারে রাখিবে জানি হে।
আর আমি যে কিছু চাহিনে চরণতলে বসে থাকিব,
আর আমি যে কিছু চাহিনে জননী বলে শুধু ডাকিব,
তুমি না রাখিলে গৃহ আর পাইব কোথায়
কেঁদে কেঁদে কোথা বেড়াব!
ঐ যে হেরি তমসঘনঘোরা গহন রজনী।

৩|২

সা রা ॥ গা -া গা -া। গা -মগা রা -গা। পা মা গা রগরা।
ব ড় ॥ আ — শা —। ক — রে —। এ সে ছি গো।

। সা সা রা গরা। সা -া -া -া। সা ধ্া সা রা।
। কা ছে ডে কে। ল — — ও। ফি রা য়ো —।

। পা -া -া মা। গা রগরা সা রা ॥ পা -া ধা না।
। না — — জ। ন নী ব ড় ॥ দী — ন হী।

। র্সা -া -া নধা। পা ধা পা মা। গা -া -া -মগা।
। নে — — —। কে হ চা হে। না — — —।

। রা -া গা সা। রগরা -া -া -া। সা ন্া প্া ধ্া।
। তু — মি তা। রে — — —। রা — খি বে।

। সা -া সগরা -া। সা -া -া -া। সা -া গা রা।
। জা — নি —। হে — — —। আ র আ মি।

। গা -া -া -া। পা মা গা রা। ধা -া -া -া।
। যে — — —। কি ছু চা হি। নে — — —।

। সা ন্া ধ্া ন্া। রা -া -া গরা। সা ন্া ধ্া ন্া।
। চ র ণ ত। লে — — —। ব সে থা কি।

। প্া -া -া -া। সা -া গা রা। গা -া -া -া।
। ব — — —। আ র্ আ মি। যে — — —।

। পা মা গা রা। ধা -া -া -া। না ধা পা ধা।
। কি ছু চা হি। নে — — —। জ ন নী ব।

। র্রা -া -া -া। র্সা না ধা নধা। পা -া -া -া।
। লে — — —। শু ধু ডা কি। ব — — —।

। ধা না র্সা -া। পা পা পা -া। ধা না পা -া।
। তু মি না —। রা খি লে —। গৃ হ আ র।

। মা গা রা রা। ধা -া -া -া। পা মা গা রা।
। পা ই ব কো। থা — — —। কেঁ দে কেঁ দে।

। সা -ন্া ধ্া ন্া। রা -া -া -া। সা -া -া -া।
। কো — থা বে। ড়া — — —। ব — — —।

। পা -া -া -া। সা -া -া -া। রা -া -া -া।
। ঐ — — —। যে — — —। হে — — —।

। গা -া -া -া। পা মা গা রা। সা ন্া ধ্া -া।
। রি — — —। ত ম স ঘ। ন ঘো রা —।

। ধা পা মা গা। রগরা সা সা রা॥
। গ হ ন র। জ নী ব ড়॥

মিশ্র—একতালা।

ফলে ফুলে ঢোলে ঢোলে বহে কিবা মৃদু বায়।
তটিনী হিল্লোল তুলে কল্লোলে চলিয়া যায়।
পিক কিবা কুঞ্জে কুঞ্জে কুহু কুহু কুহু গায়।
কি জানি কিসের লাগি প্রাণ করে হায় হায়।

৩।৩

॥ মা -া মা। পাঃ -মঃ পা। ধা র্সা ধা। পধপা -মা পা।
॥ ফু — লে। ফু — লে। ঢো — লে। ঢো — লে।

। ধাঃ -পঃ মা। মরা -া সা। সা -রা রমা। মা -া -া।
। ব — হে। কি — বা। মৃ — দু। বা — য়।

স গ
। সা -া সা। মা -া মা। মগমা -পা পা। পমপা -ধা পা।
। ত — টি। নী — হি। ল্লো — ল। তু — লে।

। মা -া মগা। মা -ধা পা। মপমা -গা মা। রা -া সা।
। ক — ল্লো। লে — চ। লি — য়া। যা — য়।

ধ
। র্সা -া নর্সর্রা। র্সা -ঞা ধা। ঞা -া ধঞর্সা। ঞা -ধা পা।
। পি — ক। কি — বা। কু — ঞ্জে। কু — ঞ্জে।

। র্সা -ধা মা। র্স -ধা মা। র্সা -ঞর্সঞা ধা। পা -া -সা।
। কু — হু। কু — হু। কু — হু। গা — য়।

। সা -ম্মা মা। পাঃ -মঃ পা। ধা -র্সা ধা। পধপা -মা পা।
। কি — জা। নি — কি। সে — র। লা — গি।

র
। ধাঃ -পঃ মা। মরা -া সা। সা -রা -মা। মা -া -া॥
। প্রা — ণ। ক — রে। হা — য়। হা — য়॥

ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন।

বুদ্ধচরিত।

সেই রাত্রে, অঞ্জনাব্দের ১৩৩ সনে কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথিতে সিদ্ধার্থের মনে হঠাৎ দিব্যজ্ঞান উপস্থিত হয়। ধর্ম্মজগতের নিয়মই এই যে হৃদয় শূন্য হইলে দেবভাব তাহাকে অধিকার করে এবং ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান তাহার আয়ত্ত হয়। তিনি অনন্ত ধনের অধিকারী হইলেন—তাঁহার আর কি চাহিবার আছে? কি ধনে তাঁহাকে ধনী করিতে পারে? পৃথিবীর ঐশ্বর্য্য যে তাঁহার নিকট তুচ্ছ পদার্থ। তিনি এতদিন সিদ্ধার্থ ছিলেন—আজ হইতে বুদ্ধ হইলেন। এখন হইতে আমরা তাঁহাকে বুদ্ধ বলিয়া ডাকিব।

যে দিন এই ব্যাপারটি ঘটিল সে দিন জগতের আনন্দের আর সীমা রহিল না। কথিত আছে যে পৃথিবীতে যত বৃক্ষ ছিল সকলই সেই মুহূর্ত্তে ফল ফুলে পরিশোভিত হইল। পাষাণময় পর্ব্বতমালা হইতে নানা বর্ণের পুষ্পরাশি বিকশিত হইল এবং সমুদয় বিশ্ব যেন একটি বৃহৎ পুষ্পোদ্যানে পরিণত হইল। সমুদ্রের লবণাক্ত জল মিষ্ট হইল এবং স্রোতস্বতী স্তম্ভিত হইয়া জল-স্রোত বন্ধ

করিল। বুদ্ধ সেই বোধিদ্রুমের সন্নিধানে ঊনপঞ্চাশৎ দিবস সমাধিতে নিমগ্ন রহিলেন। এত বৎসরের পরিশ্রম, কষ্ট, পরীক্ষা, ব্যাকুলতা অবশেষে চলিয়া গেল।

এই ঊনপঞ্চাশৎ দিনে তিনি বোধিবৃক্ষের চতুর্দ্দিকে এক এক স্থানে সাত দিন করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ইহার মধ্যে কিঞ্চিৎ আহার করিয়াও লইয়াছিলেন। তাহার পর তাঁহার মনে এই প্রশ্নটির উদয় হয়—"এখন কি কর্ত্তব্য? আমি এত বৎসর ধরিয়া যে সাধন করিয়াছি ইহা সহজ ব্যাপার নহে। এ ধর্ম্ম অনায়াসলব্ধ হইতে পারে না। সাধারণ লোকের পক্ষে ইহা অতলস্পর্শ। অধিক পরিশ্রম, আয়াস, যত্ন না করিলে আমার চতুর্ব্বর্গ সত্যকে কেহ আয়ত্ত করিতে পারিবে না। অনেক ত্যাগ স্বীকার না করিলে এই অষ্টাঙ্গ মার্গ অবলম্বন করা যায় না। সুতরাং মনুষ্যেরা এ ধর্ম্ম কি প্রকারে লইবে? তাহারা যে এখনও ষড়্‌রিপুর বশীভূত, তাহারা যে এখনও পরিবর্ত্তনচক্রে ঘুরিতেছে। সে পরিবর্ত্তন নির্ব্বাণ অবস্থার ঠিক বিপরীত। এ ধর্ম্ম কঠিন। আমি যদি ইহা প্রচার করি, মনুষ্যেরা ইহা বুঝিতে পারিবে না এবং সমুদয় চেষ্টা বিফল হইবে। অতএব আমি যে কষ্ট পাইয়াছি তাহাই যথেষ্ট, দুর্ব্বল মানবদিগকে অনর্থক কষ্টে ফেলিয়া কোন লাভ নাই।" বুদ্ধ এই ভাবিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া আছেন এমন সময় ব্রহ্মা হঠাৎ তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইলেন। তিনি স্বর্গে থাকিয়া বুদ্ধের মনে কি হইতেছিল তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। বুঝিতে পারিয়াই মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইয়া বুদ্ধের সম্মুখে আগমন করিয়া তাঁহাকে এই নিবেদন করিলেন—"হে বুদ্ধ, তুমি নব ধর্ম্ম লোকদিগকে দান করিতে কুণ্ঠিত হইও না। দেখ, মানবকুল ধ্বংসপ্রাপ্তির দিকে উন্মুখ হইয়াছে। তাহাদিগের অবস্থা অতিশয় শোচ-

নীয়। তাহারা অহোরাত্র অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে। অজ্ঞানে চক্ষু উন্মীলিত করিতে পারিতেছে না। বিপন্ন হইয়া হাহাকার করিতেছে। সদ্ধর্ম্ম দিয়া তাহাদিগকে বিপদ হইতে মুক্ত কর। যাহা তুমি এত আয়াস সহকারে লাভ করিয়াছ তাহা অনর্থক হইতে দিও না। নির্ব্বাণ-মুক্তি প্রচার কর, জীবকুলের গতি হউক।” যখন ব্রহ্মার এই বচনগুলি তাঁহার কর্ণগোচর হইল, তখন তিনি আর নিরস্ত থাকিতে পারিলেন না। হঠাৎ এক অপূর্ব্ব দয়া তাঁহার হৃদয়কে অধিকার করিল। তিনি দেখিলেন যে বাস্তবিক জগত পাপে দগ্ধ হইতেছে বাস্তবিক অজ্ঞানবশতঃ লোকেরা ভ্রান্ত হইয়া পথহারা হইয়াছে। যদি তিনি দয়া না করেন, তাহা হইলে কে আর দয়া করিবে? অতএব “নিশ্চিন্ত থাকিব না, লোকদিগকে ধর্ম্ম দিব” এই বলিয়া ব্রহ্মার নিকট প্রতিশ্রুত হইলেন। ব্রহ্মা এই কথা শুনিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

এই আখ্যায়িকা হইতে আমরা একটি শিক্ষা পাইতেছি। বুদ্ধ যে নিরীশ্বর ছিলেন না, তাহা এই কথা হইতে প্রমাণিত হইতেছে। তাঁহার ধর্ম্মে ঈশ্বরের স্থান ছিল না, এ কথা সত্য। কিন্তু ঈশ্বর তাঁহাকে ছাড়েন নাই, এ কথাও সত্য। তিনি প্রত্যাদেশের দ্বারা চালিত হইতেন। বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইবার সমুদয় ইতিহাস এই কথার পরিচয় দিতেছে। এই যে তাঁহার মনে নিরাশা ও নিরুদ্যম ভাব আসিয়াছিল, এই যে তিনি মনে করিয়াছিলেন যে তাঁহার ধর্ম্ম লোকে গ্রহণ করিতে পারিবে না—এবং সেই জন্য তিনি নিশ্চেষ্ট হইয়া নিজের ধর্ম্ম নিজের কাছে রাখিতে প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন—এই যে তাঁহার মনের ভাব কি উপায়ে সহসা পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল? ব্রহ্মা আসিয়া তাঁহার প্রতিজ্ঞা ভগ্ন করিলেন, ব্রহ্মার কথা শুনিবামাত্র তাঁহার মন দয়াতে পূর্ণ হইল। বাস্তবিক এই ঘট-

নাটি ধর্ম্মের একটি আশ্চর্য্য নিয়মকে প্রমাণ করিতেছে। ধর্ম্মের নিয়ম, এই যে, মন শূন্য হইলেই তাহাতে তৎক্ষণাৎ দেব-ভাবের আবির্ভাব হয়। যখনই বুদ্ধ কামনা নির্ব্বাণ করিলেন, তখনই কি হইল? তাঁহার মন হইতে পাপচিন্তা গেল। এবং পাপ-চিন্তা গিয়া কি আসিল? দয়া। অর্থাৎ কি না একটি মন্দ গিয়া তৎপরিবর্ত্তে একটি ভাল আসিল। দয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রধান লক্ষণ। জীবে দয়া—কেবল মানবদিগের প্রতি দয়া নহে, সমুদয় জীবদিগের প্রতি দয়া—পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, যাহাদিগের জীবন আছে, তাহাদিগের প্রতি দয়া করা বৌদ্ধদিগের প্রথম কর্ত্তব্য। তাহার পর অন্য সকল পুণ্য আসিবে। আপাততঃ ইতি-হাসের কথাতে এইটি প্রমাণীকৃত হইল যে যেমন বুদ্ধের হৃদয় শূন্য হইল, তৎক্ষণাৎ তাঁহার মনে দয়া আসিল। সে দয়া তিনি কোথা হইতে পাইলেন? আপনা হইতে পান নাই। স্বর্গ হইতে সে কথা আসিয়াছিল। তিনি বলিতেছিলেন—আমি নিস্তব্ধ হইয়া থাকিব। ব্রহ্মা বলিলেন, না। বুদ্ধের পর গ্রীস-দেশীয় সক্রে-টিস্ ঠিক সেই কথা বলিয়া গিয়াছেন। তিনি বুদ্ধির দিক হইতে মন শূন্য করিয়াছিলেন। অর্থাৎ তিনি বুঝিতে পারিয়া-ছিলেন যে তাঁহার মন অজ্ঞানে পূর্ণ। অন্য সকলে বলিত—"আমি এই জানি এবং এই জানি"। তিনি জানিতেন যে তিনি কিছুই জানিতেন না। যে মুহূর্ত্তে তিনি এই সত্যটি হৃদয়ে স্পষ্ট-রূপে অনুভব করিলেন, সেই মুহূর্ত্তে তাঁহার অন্তর হইতে অহ-ঙ্কার দূর হইল এবং সেই মুহূর্ত্তে তিনি অন্তররাজ্যে দৈববাণী শুনিতে লাগিলেন। কোন একটি দৈবশক্তি বা দৈব পুরুষ তাঁহাকে সর্ব্বদা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের বিষয় আদেশ দিতেন। তিনি সেই শক্তি বা পুরুষকে Demon বলিয়া ডাকিতেন। বুদ্ধ সম্বন্ধে যে

ঠিক তাহাই ঘটিয়াছিল, এটি আমরা এখন বুঝিতে পারিতেছি। Demon না আসিয়া ব্রহ্মা আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন—"নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিও না। জীবেরা অজ্ঞানবশতঃ মৃতপ্রায় রহিয়াছে, অতএব শীঘ্র প্রচারে বাহির হও।" ইহাকেই প্রত্যাদেশ বলা যায়, এবং ইহা দৈব ভিন্ন আর কিছুই নহে।

যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে বুদ্ধের মনে দয়া আসিল কেন? অন্য কোন ভাব আসিল না কেন? প্রাকৃতিক নিয়মে দয়াই আসিবে ইহার কারণ কি? তাহার উত্তর এই যে, যতদিন মানুষ সংসারে বদ্ধ থাকে, তত দিন তাহার দয়া মমতা সকলই গৃহের চারি প্রাচীরের মধ্যে সঙ্কীর্ণভাবে অবস্থিতি করে, এবং তাহার হৃদয় প্রশস্ত হইতে পারে না। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে সে সংসার-শৃঙ্খল হইতে উন্মুক্ত হয়, যখন তাহার আর পরিবার থাকে না, আপনার বলিবার আর কিছুই থাকে না, যখন পাপ পর্য্যন্ত হৃদয়কে ছাড়িয়া চলিয়া যায়, তখন তাহার হৃদয় সঙ্কীর্ণ না থাকিয়া বিশ্বব্যাপী হয়, তখন সে কয়েক জনের না হইয়া সমগ্র মানব-জাতির হয়। তাহার স্নেহ, তাহার মায়া, তাহার দয়া সকল লোকের প্রতি প্রধাবিত হয়। আমরা এটি অনেক মহাপুরুষ-দিগের জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তাঁহারা সংসার হইতে মুক্ত হইয়াই জীবদিগের জন্য কাঁদিতে থাকেন। এটি অতি স্বাভাবিক ভাব। কেন না দয়ার অপেক্ষা প্রবল শক্তি আর কি আছে? যেমন বাষ্পের দ্বারা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শকট এবং অর্ণবযান চালিত হয়, তেমনি দয়া দ্বারা উত্তেজিত হইয়া মহাপুরুষেরা পর্ব্বতসম বিপদ, দুঃখ, কষ্ট, পরীক্ষা অতিক্রম করিয়া মনুষ্যসমাজকে নূতন ধর্ম্ম, নূতন ভাব, নূতন আচার ব্যবহারের দিকে লইয়া যান। বুদ্ধ যে এত প্রকার অদ্ভুত কাণ্ড করিতে পারিয়াছিলেন,

তাহার মূলে কোন্ শক্তি নিহিত ছিল? কেবল দয়া। তিনি জীবদিগের জন্য কেবল কাঁদিতেন। তাহাদিগের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইত। আর তিনি দয়ার বেগ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। রাজসংসার পরিত্যাগ করিয়া ক্ষিপ্তের ন্যায় দেশ বিদেশে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন, আর দুই হস্তে কেবল দীন দুঃখী পাপীদিগকে জ্ঞানরত্ন প্রদান করিতে লাগিলেন। এক দয়ার উত্তেজনায় তিনি এত লীলা খেলিতে পারিলেন। সে লীলার মধ্যে যে সকল অদ্ভুত ঘটনাবলী দেখিতে পাই, তাহা কেবল দয়ারই জন্য।

বুদ্ধের মনে এখন এই প্রশ্ন উত্থিত হইল—"কাহার নিকট এই ধর্ম্ম প্রচার করি?" তিনি ভাবিলেন—"আলাড় কনাম এবং রামপুত্র উদক এই দুই জনের নিকট রাজগৃহ পরিত্যাগ করিবার সময় আমি প্রথম শিক্ষা লাভ করি। ইহাঁদেরই নিকট যাই না কেন?" কিন্তু তাঁহাদিগের অনুসন্ধান করিতে গিয়া শুনিলেন যে তাঁহারা সম্প্রতি পরলোকগত হইয়াছেন। সে দিকে নিরাশ হইয়া তিনি মনে করিলেন—"আমার পাঁচজন শিষ্য আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কাশীধামে বাস করিতেছে। তাহাদিগেরই নিকট প্রথম ধর্ম্ম প্রচার করি না কেন?" এই ভাবিয়া তিনি বাহির হইলেন। পথিমধ্যে উপকাম নামক একজন ব্রাহ্মণের সহিত সাক্ষাৎ হইল। গৌতমের শান্তভাব এবং সুন্দর মূর্ত্তি দেখিয়া উপকাম চমৎকৃত হইয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"সৌম্য, বল দেখি কোথা হইতে তুমি এ মূর্ত্তি পাইয়াছ?" তোমার শরীর সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। তোমাকে দেখিলে ভাল না বাসিয়া থাকা যায় না। তোমার বদন শান্তিতে পূর্ণ। এমন কোন্ ধর্ম্ম আছে যাহা পাইয়া তুমি এত আনন্দ এবং শান্তি লাভ করিয়াছ? কোন্ গুরুর কৃপায়

তুমি এত গুণের অধিকারী হইয়াছ? বুদ্ধ বলিলেন—"আমি পরিবর্ত্তনশীল জগতের অতীত হইয়াছি সংসার, অবিদ্যা, পাপ এবং কামনাকে জয় করিয়াছি। আমার কোন গুরু নাই, দেবতাদিগের মধ্যে আমার সমান কেহ নাই। আমি জিন, এখন বারাণসীতে নব ধর্ম্মের ডঙ্কা বাজাইব।" উপকাম এত লম্বা লম্বা কথা শুনিয়া কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। শুনিয়া কিন্তু ভাল লাগিল না। বুদ্ধকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"তোমার পথ ঐ দিকে।" এই বলিয়া তিনি বিপরীত দিকে চলিয়া গেলেন। এইরূপ প্রবাদ আছে যে উপকাম আর এক সময়ে বুদ্ধের শিষ্য হইয়াছিলেন। ধর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়া বুদ্ধ প্রথমেই এই অভ্যর্থনা পাইলেন। কিন্তু তাহাতে তিনি কিছু মাত্র ভগ্নোদ্যম হইলেন না। ক্রমাগত চলিতে লাগিলেন। ক্রমে কর্ণপুর রোহিতবস্তু ইত্যাদি গ্রাম অতিক্রম করিয়া অবশেষে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন। এইখানে একটি অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়াছিল। বৌদ্ধ পুস্তক মাত্রেই তাহার উল্লেখ আছে। কথিত আছে যে বুদ্ধ একটি নৌকায় উঠিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় নাবিক তাঁহার নিকট হইতে পারে যাইবার ভাড়া চাহিল। বুদ্ধ বলিলেন—"আমার নিকট ত কোন মুদ্রা নাই। বিনা মুদ্রায় পার করিয়া দিতে পার ত যাইব।" নাবিক তাহাতে সম্মত না হওয়াতে বুদ্ধ নৌকায় আরোহণ করিতে পারিলেন না। ঠিক সেই সময়ে এক পাল বক গঙ্গার উপর দিয়া উড়িয়া যাইতেছিল। বুদ্ধ বলিলেন—"ইহারা ত পারে যাইবার জন্য মুদ্রা দিতেছে না। তবে আমি কেন দিব? ইহারা স্বাভাবিক বলে উড়িতে পারে, আমি আধ্যাত্মিক বলে কেন উহাদের মত উড়িতে পারিব না?" এই বলিয়া বুদ্ধ অক্লেশে উড়িতে উড়িতে ওপারে উপস্থিত হই-

লেন। "কি মন্দ কার্য্য করিলাম"—এই বলিয়া নাবিক তখন অনেক আক্ষেপ করিতে লাগিল। ঘটনাটি লোকপরম্পরায় বিম্বিসার নৃপতির কর্ণে গেল। তিনি তাহা শুনিয়া এই আদেশ দিলেন যে, সাধু সন্ন্যাসীরা নদী পার হইতে চাহিলেই তাঁহাদিগকে যেন বিনা মূল্যে পার করা হয়।

বুদ্ধ বারাণসী নগরীতে উপস্থিত হইলেন। বারাণসীর চারিদিকে তখন চারিটি প্রবেশদ্বার ছিল। বুদ্ধ পশ্চিম দ্বার দিয়া নগরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভিক্ষার্থ রাস্তার রাস্তায় পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। খাদ্য সংগ্রহ করা হইলে তিনি বরণা নদীর তীরে আহার সমাপন করিয়া মৃগদাব কাননাভিমুখে গমন করিলেন। এই কানন তখন বহুসংখ্যক ঋষির নিবাস ছিল। ইহা কাশী হইতে দেড় ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত ছিল। বৌদ্ধেরা সেই স্থানকে সারনাথ বলিত। এখন তাহার নাম ধামেক। *

মৃগদাব কাননে তিনি সেই পাঁচজন শিষ্যকে দেখিতে পাইলেন। যখন উহারা দূর হইতে বুদ্ধকে দেখিল তখন তাহারা পরস্পর এই বলাবলি করিতে লাগিল—"দেখ, দেখ, গৌতম আসিতেছেন। নিশ্চয় শিষ্য অনুসন্ধানে বা ভিক্ষা সংগ্রহার্থে নির্গত হইয়াছেন। দেখিয়াছ কেমন শরীরের কান্তি হইয়াছে? আর অনাহার সহ্য হইল না। ধৰ্ম্ম কৰ্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া এখন কেবল শরীরের পুষ্টি সাধনের জন্যই তৎপর দেখিতেছি। আমরা এ প্রকার লোককে কোন মতে অভ্যর্থনা করিব না, অগ্রসর হইয়া পথ প্রদর্শন করিয়া এখানে আনিব না, প্রণাম করিব না, পাদ প্রক্ষালনের আয়োজন করিব না এবং আসনে বসিতেও বলিব না।" এই মন্ত্রণা করিয়া তাহারা বসিয়া রহিল।

---

* সারনাথের কথা আমার অশোক-চরিত গ্রন্থে বিবৃত আছে।

কেবল তাহাদিগের মধ্যে বৃদ্ধ কৌণ্ডিল্য এই মন্ত্রণায় সম্মত হন নাই। ক্রমে বুদ্ধ নিকটতর হইলেন, তাহারাও গাত্রোত্থান করিয়া উঠিল—"আয়ুষ্মন্, নমস্কার করিতেছি।" "গৌতম, নমস্কার করিতেছি।" "গৌতম নমস্কার করি।" গৌতম এই সম্বোধন শুনিয়াই বলিতে লাগিলেন –"আমাকে আয়ুষ্মন্ বা গৌতম বলিয়া উপহাস করিওনা। তোমরা মৃত্যুর পথে রহিয়াছ। সেই পথে থাকিলে পদে পদে দুঃখ ও নিরাশা আসিবে। আমি অমৃতত্ব লাভ করিয়াছি– এখন আমি বুদ্ধ। তোমাদিগের নিকট ধর্ম্ম প্রচারার্থ আসিয়াছি। অবধান পূর্ব্বক শ্রবণ কর—আমি তোমাদিগকে নির্ব্বাণের পথে লইয়া যাইব। আমার কথা শুনিলে আর তোমাদিগকে মায়াময় সংসার-চক্রে ঘূর্ণায়মান হইতে হইবে না। সেই অভ্রান্ত নিত্য অবস্থা যেথানে পরিবর্ত্তন নাই, জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, পাপের দাহ নাই, সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া নিত্য শান্তি সম্ভোগ করিবে। কিন্তু এ অবস্থা পাইতে গেলে সংসারকামনা, সুখের প্রত্যাশা সকলই পরিত্যাগ করিতে হইবে।" বুদ্ধের কথা শুনিয়া তাহাদিগের মনে কোন প্রকার সংস্কারই হইল না। তাহারা বলিল—"তুমি বুদ্ধ কি করিয়া হইবে? যে শিষ্য অনুসন্ধানে বাহির হয়, যে অন্ন ভিক্ষার জন্য পর্য্যটন করে, সে আবার বুদ্ধ কিরূপে হইবে?" বুদ্ধ আবার তাহাদিগকে ঐকথা বলিলেন, আবার তাহারা অবিশ্বাসসূচক বাক্য প্রয়োগ করিল। আবার বুদ্ধ বলিলেন –"আমি বলিতেছি আমি বুদ্ধ হইয়াছি। চতুর্ব্বর্গ সত্য আমার ঐশ্বর্য্য, এবং নির্ব্বাণের পথ আমার সম্মুখে পরিষ্কার।" শিষ্যেরা বুদ্ধের উৎসাহ ও আগ্রহ দেখিয়া এবার অবনতমস্তক হইল। তিনি তাহাদিগকে একান্তমনে, সুগম্ভীর স্বরে ধর্ম্মের সারতত্ত্বগুলি বুঝাইতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন—"হে ভিক্ষুদল, তোমরা সংসার ত্যাগ করিয়াছ। দুইটি ব্যাপার তোমাদিগকে চির-

কালের জন্য পরিত্যাগ করিতে হইবে, যথা ইন্দ্রিয়জনিত সুখ এবং অতিরিক্ত অনর্থক শারীরিক নির্যাতন। আমি এই দুই ভ্রান্তিজনক পথ পরিত্যাগ করিয়াছি। আমার মার্গ এই দুই পথের মধ্যবর্ত্তী। ইহা অবলম্বন করিয়াই আমি এখন প্রজ্ঞা লাভ করিয়াছি। আমার চক্ষু এতদিন অন্ধ ছিল, এখন দেখিতে পাইতেছে। আমার মন অজ্ঞ ছিল, এখন জানিতে পারিতেছে। পূর্ণ শান্তি এখন আমার ভাগ্যে আসিয়াছে। আমার আধ্যাত্মিক জীবন প্রস্ফুটিত হইয়াছে, সুতরাং আমি নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছি। ভিক্ষুগণ তোমরা যদি এ অবস্থাতে আসিতে চাও, এই মধ্যবর্ত্তী পথ অবলম্বন কর। তোমাদিগের চক্ষু প্রস্ফুটিত হইবে, অন্তরে জ্ঞানালোক উদিত হইবে এবং তোমরা নির্ব্বাণের অধিকারী হইবে। সম্যক্‌দৃষ্টি, সম্যক্ সঙ্কল্প, সম্যক্‌বাক, সম্যগ্ দীপিকা, সম্যক্ কার্য্য, সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি এবং সম্যক সমাধি, এই অষ্টাঙ্গমার্গ তোমাদিগের হইবে। এ পথ অবলম্বন করিলে তোমরা জন্মমৃত্যুর শৃঙ্খল ভেদ করিবে। কর্ম্মফল হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া আর অনন্তকাল ধরিয়া পুনর্জন্মভার বহন করিতে হইবে না।

"ভিক্ষুগণ এখন চতুর্বর্গ সত্যের বিষয় বলিতেছি শ্রবণ কর। সে সত্যগুলি কি? (১) ইহাই সত্য যে জগতে কেবল দুঃখ আছে। (২) ইহাই সত্য যে জীবনে দুঃখ সঞ্চিত হইতে থাকে। (৩) ইহাই সত্য যে এই দুঃখরাশিকে বিনাশ করা যায়। (৪) ইহাই সত্য যে দুঃখ বিনাশ করিবার জন্য একটি বিশেষ পথ আছে। যে চতুবর্গ সত্যের কথা বলিলাম যদি জিজ্ঞাসা কর তাহাদিগের প্রকৃত অর্থ কি, আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর।

"দুঃখ আছে ইহার অর্থ এই যে জীবনে জন্ম মৃত্যু জরা বার্দ্ধক্যজনিত দুঃখ বিনা আর কিছুই নাই। জগতে দুঃখ সঞ্চিত হইতে

থাকে, ইহার অর্থ এই যে, তৃষ্ণায় উত্তেজিত হইয়া জীব সর্ব্বদা নব সম্ভোগ অনুসন্ধান করে এবং নব সম্ভোগ আবিষ্কার করিতে গিয়া মন সদা উদ্বিগ্ন ও চিন্তাশীল থাকে। সেই জন্য মনের কষ্টের শেষ থাকে না, ক্রমাগত সঞ্চিত হইতে থাকে। দুঃখকে বিনাশ করা যায়,ইহার অর্থ এই যে তৃষ্ণার একেবারে নির্ব্বাণ হইলে মনে ভাবনা বা চিন্তা কিছুই থাকে না। সুতরাং দুঃখের অন্তর্ধান হয় এবং অন্তরে নিত্য শান্তি বর্ত্তমান থাকে। দুঃখ বিনাশ করিবার পথ আছে, ইহার অর্থ পূর্ব্বে উল্লিখিত অষ্টাঙ্গমার্গ অবলম্বন করা।

"ভিক্ষুগণ, এই সকল কথা কেহ আমাকে শিক্ষা দেয় নাই। ইহারা স্বতঃসিদ্ধ স্বাভাবিক বলে উদ্ভূত, কাহারও সাহায্যে পাই নাই। যে অবস্থা হইতে প্রকৃত জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সে অবস্থা আমি পাইয়াছি। এখন দেখ আমার অন্তরে জ্ঞান সমুজ্জ্বল হইয়াছে। আর আমাকে ভ্রমে পতিত হইতে হইবে না, আর পরিবর্ত্তন হতবুদ্ধি করিবে না। মুক্তি আমার করতলন্যস্ত। এই আমার শেষ জন্ম, ভবিষ্যতে আর "আমি" বলিয়া আমার স্থিতি নাই।"

বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে বৃদ্ধ কৌণ্ডিল্য নিস্তব্ধ থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার চক্ষু হইতে মোহকুজ্ঝটিকা বিদূরিত হইল, মনে যে দুর্গন্ধময় পাপরূপ কর্দ্দম সঞ্চিত ছিল স্বর্গ হইতে যেন বৃষ্টি আসিয়া তাহা প্রক্ষালন করিয়া দিল। দুঃখের অতীত, স্বাধীনচিত্ত, নির্ম্মল-দৃষ্টি হইয়া তিনি সত্যসূর্য্যকে সম্মুখে অনুভব করিলেন। বুদ্ধকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া করযোড়ে নিবেদন করিলেন—ভগবন্, আপনার ধর্ম্মগ্রহণ করিলাম। আমাকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করুন। আপনার অনুগত দাস হইব এই ব্রত লইলাম।" বুদ্ধ বলিলেন—"তথাস্তু! ধর্ম্মে দীক্ষিত হও, প্রকৃত ব্রাহ্মণের মত শুদ্ধাচারী হও, দুঃখের কারণসমূহকে নির্ব্বাণ কর।" কৌণ্ডিল্য অপর চারিজনকে

ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার কথা শুনিয়া তাহারাও ভিক্ষুব্রত অবলম্বন করিল। অবশেষে বুদ্ধ তাহাদিগকে এই বলিয়া উপদেশ দিলেন—"হে ভিক্ষুগণ, আমি প্রতি জন্মে সম্যক্ স্মৃতি অভ্যাস করিয়াছিলাম এবং বিশুদ্ধ পথে চলিয়াছিলাম বলিয়া পূর্ণ মুক্তি এবং প্রত্যাদেশের অধিকারী হইতে পারিয়াছি। তোমরাও তাহাই কর। সেই পথে বিচরণ কর, তাহা হইলে তোমরাও পূর্ণ বোধির অবস্থা প্রাপ্ত হইবে।"

বৌদ্ধদিগের ভাষায় বলিতে গেলে সেই দিবস বুদ্ধ ধর্ম্ম-চক্র প্রবর্ত্তন করিলেন। এই অদ্ভুত ঘটনা দেখিয়া মর্ত্তের দেবদেবীরা, দিকপালগণ এবং স্বর্গস্থ দেবতাদল সমস্বরে উচ্চধ্বনিতে বলিয়া উঠিলেন—"আজ বারাণসীধামে, মৃগদাব আশ্রমে, ভগবত **ধর্ম্মচক্র** প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ, দেব বা দেবী, ব্রহ্মা বা মার, বিশ্বসংসারে কেহই আর সে চক্র নিরস্ত করিতে পারিবে না।" এই জয়শব্দ একমুহূর্ত্ত ব্রহ্মালোকে প্রতিধ্বনিত হইল। বিশ্ব কম্পিত হইল এবং একটি অতুল জ্যোতি আসিয়া ইহলোককে আলোকিত করিল। কথিত আছে যে সেই দিন বক্তৃতা শুনিয়া ১৮,০০০,০০০,০০০ দেবতা এবং উপদেবতা মুক্তি প্রাপ্ত হন এবং ধরাতলে সেই দিন বুদ্ধকে লইয়া ছয়জন ভিক্ষু হইলেন।

আপদ।

সন্ধ্যার দিকে ঝড় ক্রমশঃ প্রবল হইতে লাগিল। বৃষ্টির ঝাপট, বজ্রের শব্দ, এবং বিদ্যুতের ঝিক্‌মিকিতে আকাশে যেন সুরাসুরের যুদ্ধ বাধিয়া গেল। কালো কালো মেঘগুলো মহা-প্রলয়ের জয়পতাকার মত দিগ্বিদিকে উড়িতে আরম্ভ করিল,

গঙ্গার এপারে ওপারে বিদ্রোহী ঢেউগুলো কলশব্দে নৃত্য জুড়িয়া দিল, এবং বাগানের বড় বড় গাছগুলো সমস্ত শাখা ঝট্‌পট্‌ করিয়া হা হুতাশ সহকারে দক্ষিণে বামে লুটোপুটি করিতে লাগিল।

তখন চন্দননগরের বাগানবাড়িতে একটি দীপালোকিত রুদ্ধ কক্ষে খাটের সম্মুখবর্ত্তী নীচের বিছানায় বসিয়া স্ত্রীপুরুষে কথাবার্ত্তা চলিতেছিল। শরৎ বাবু বলিতেছিলেন, আর কিছু দিন থাকিলেই তোমার শরীর সম্পূর্ণ সারিয়া উঠিবে, তখন আমরা দেশে ফিরিতে পারিব। কিরণময়ী বলিতেছিলেন, আমার শরীর সম্পূর্ণ সারিয়া উঠিয়াছে, এখন দেশে ফিরিলে কোন ক্ষতি হইবে না।

বিবাহিত ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন, কথাটা যত সংক্ষেপে রিপোর্ট্‌ করিলাম তত সংক্ষেপে শেষ হয় নাই। বিষয়টি বিশেষ দুরূহ নয়, তথাপি বাদ প্রতিবাদ কিছুতেই মীমাংসার দিকে অগ্রসর হইতেছিল না; কর্ণহীন নৌকার মত ক্রমাগতই ঘুর খাইয়া মরিতেছিল; অবশেষে অশ্রুতরঙ্গে ডুবি হইবার সম্ভাবনা দেখা দিল। শরৎ কহিলেন, ডাক্তার বলিতেছে আর কিছু দিন থাকিয়া গেলে ভাল হয়। কিরণ কহিলেন, তোমার ডাক্তার ত সব জানে! শরৎ কহিলেন, জান ত, এই সময়ে দেশে নানা প্রকার ব্যামোর প্রাদুর্ভাব হয় অতএব আর মাস দুয়েক কাটাইয়া গেলেই ভাল হয়। কিরণ কহিলেন, এখানে এখন বুঝি কোথাও কাহারো কোন ব্যামো হয় না!

পূর্ব্ব ইতিহাসটা এই। কিরণকে তাহার ঘরের এবং পাড়ার সকলেই ভালবাসে, এমন কি, শাশুড়ি পর্য্যন্ত। সেই কিরণের যখন কঠিন পীড়া হইল তখন সকলেই চিন্তিত হইয়া উঠিল—এবং ডাক্তার যখন বায়ুপরিবর্ত্তনের প্রস্তাব করিল, তখন গৃহ এবং

কাজকর্ম্ম ছাড়িয়া প্রবাসে যাইতে তাহার স্বামী এবং শাশুড়ি কোন আপত্তি করিলেন না। যদিও গ্রামের বিবেচক প্রাজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই, বায়ুপরিবর্ত্তনে আরোগ্যের আশা করা এবং স্ত্রীর জন্য এতটা হুলস্থুল করিয়া তোলা নব্য স্ত্রৈণতার একটা নির্লজ্জ আতিশয্য বলিয়া স্থির করিলেন এবং প্রশ্ন করিলেন, ইতিপূর্ব্বে কি কাহারও স্ত্রীর কঠিন পীড়া হয় নাই, শরৎ যেখানে যাওয়া স্থির করিয়াছেন সেখানে কি মানুষরা অমর, এবং এমন কোন দেশ আছে কি যেখানে অদৃষ্টের লিপি সফল হয় না—তথাপি শরৎ এবং তাঁহার মা সে সকল কথায় কর্ণপাত করিলেন না; তখন গ্রামের সমস্ত সমবেত বিজ্ঞতার অপেক্ষা তাঁহাদের হৃদয়লক্ষ্মী কিরণের প্রাণটুকু তাঁহাদের নিকট গুরুতর বোধ হইল। প্রিয়ব্যক্তির বিপদে মানুষের এরূপ মোহ ঘটিয়া থাকে।

শরৎ চন্দননগরের বাগানে আসিয়া বাস করিতেছেন, এবং কিরণও রোগমুক্ত হইয়াছেন, কেবল শরীর এখনও সম্পূর্ণ সবল হয় নাই। তাঁহার মুখে চক্ষে একটি সকরুণ কৃশতা অঙ্কিত হইয়া আছে, যাহা দেখিলে হৃৎকম্প সহ মনে উদয় হয়, আহা, বড় রক্ষা পাইয়াছে!

কিন্তু কিরণের স্বভাবটা সঙ্গপ্রিয়, আমোদপ্রিয়। এখানে একলা আর ভাল লাগিতেছে না; তাহার ঘরের কাজ নাই, পাড়ার সঙ্গিনী নাই, কেবল সমস্ত দিন আপনার রুগ্ন শরীরটাকে লইয়া নাড়াচাড়া করিতে মন যায় না। ঘণ্টায় ঘণ্টায় দাগ মাপিয়া ঔষধ খাও, তাপ দাও, পথ্য পালন কর, ইহাতে বিরক্তি ধরিয়া গিয়াছে; আজ ঝড়ের সন্ধ্যাবেলায় রুদ্ধগৃহে স্বামী স্ত্রীতে তাহাই লইয়া আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। কিরণ যতক্ষণ উত্তর দিতেছিল ততক্ষণ উভয় পক্ষে সমকক্ষভাবে দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলিতেছিল,

কিন্তু অবশেষে কিরণ যখন নিরুত্তর হইয়া বিনা প্রতিবাদে শরতের দিক হইতে ঈষৎ বিমুখ হইয়া ঘাড় বাঁকাইয়া বসিল তথন দুর্ব্বল নিরুপায় পুরুষটির আর কোন অস্ত্র রহিল না। পরাভব স্বীকার করিবার উপক্রম করিতেছে এমন সময় বাহির হইতে বেহারা উচ্চৈঃস্বরে কি একটা নিবেদন করিল। শরৎ উঠিয়া দ্বার খুলিয়া শুনিলেন, নৌকা ডুবি হইয়া একটি ব্রাহ্মণ বালক সাঁতার দিয়া তাঁহাদের বাগানে আসিয়া উঠিয়াছে।

শুনিয়া কিরণের মান অভিমান দূর হইয়া গেল; তৎক্ষণাৎ আলনা হইতে শুষ্কবস্ত্র বাহির করিয়া দিলেন, এবং শীঘ্র এক বাটি দুধ গরম করিয়া ব্রাহ্মণের ছেলেকে অন্তঃপুরে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

ছেলেটির লম্বা চুল, বড় বড় চোখ, গোঁফের রেখা এখনো উঠে নাই। কিরণ তাহাকে নিজে থাকিয়া ভোজন করাইয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। শুনিলেন, সে যাত্রার দলের ছোকরা, তাহার নাম নীলকান্ত। তাহারা নিকটবর্ত্তী সিংহ বাবুদের বাড়ি যাত্রার জন্য আহূত হইয়াছিল; ইতিমধ্যে নৌকা ডুবি হইয়া তাহাদের দলের লোকের কি গতি হইল জানে; সে ভাল সাঁতার জানিত, কোন মতে প্রাণ রক্ষা করিয়াছে।

ছেলেটি এইখানেই রহিয়া গেল। আর একটু হইলেই সে মারা পড়িত এই মনে করিয়া তাহার প্রতি কিরণের অত্যন্ত দয়ার উদ্রেক হইল। শরৎ মনে করিলেন, হইল ভাল, কিরণ একটা নূতন কাজ হাতে পাইলেন এখন কিছুকাল এইভাবেই কাটিয়া যাইবে। ব্রাহ্মণ বালকের কল্যাণে পুণ্যসঞ্চয়ের প্রত্যাশায় শাশুড়িও প্রসন্নতা লাভ করিলেন। এবং অধিকারী মহাশয় ও যমরাজের হাত হইতে সহসা এই ধনী পরিবারের হাতে বদ্‌লি হইয়া নীলকান্ত বিশেষ আরাম বোধ করিল।

কিন্তু অনতিবিলম্বে শরৎ এবং তাঁহার মাতার মত পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। তাঁহারা ভাবিলেন আর আবশ্যক নাই, এখন এই ছেলেটাকে বিদায় করিতে পারিলে আপদ যায়।

নীলকান্ত গোপনে শরতের গুড়গুড়িতে ফড় ফড় শব্দে তামাক টানিতে আরম্ভ করিল। বৃষ্টির দিনে অম্লানবদনে তাঁহার সখের সিল্কের ছাতাটি মাথায় দিয়া নব বন্ধু সঞ্চয়চেষ্টায় পল্লিতে পর্য্যটন করিতে লাগিল। কোথাকার একটা মলিন গ্রাম্য কুক্কুরকে আদর দিয়া এমনি স্পর্দ্ধিত করিয়া তুলিল যে, সে অনাহুত শরতের সুসজ্জিত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নির্ম্মল জাজিমের উপর পদপল্লব চতুষ্টয়ের ধূলিরেখায় আপন শুভাগমনসংবাদ স্থায়ীভাবে মুদ্রিত করিয়া আসিতে লাগিল। নীলকান্তের চতুর্দ্দিকে দেখিতে দেখিতে একটি সুবৃহৎ ভক্তশিশুসম্প্রদায় গঠিত হইয়া উঠিল, এবং সে বৎসর গ্রামের আম্রকাননে কচি আম পাকিয়া উঠিবার অবসর পাইল না।

কিরণ এই ছেলেটিকে বড় বেশি আদর দিতেন তাহাতে সন্দেহ নাই। শরৎ এবং শরতের মা সে বিষয়ে তাঁহাকে অনেক নিষেধ করিতেন কিন্তু তিনি তাহা মানিতেন না। শরতের পুরাতন জামা মোজা এবং নূতন ধুতি চাদর জুতা পরাইয়া তিনি তাহাকে বাবু সাজাইয়া তুলিলেন। মাঝে মাঝে যখন তখন তাহাকে ডাকিয়া লইয়া তাঁহার স্নেহ এবং কৌতুক উভয়ই চরিতার্থ হইত। কিরণ সহাস্যমুখে পানের বাটা পাশে রাখিয়া খাটের উপর বসিতেন, দাসী তাঁহার ভিজে এলোচুল চিরিয়া চিরিয়া ঘষিয়া ঘষিয়া শুকাইয়া দিত এবং নীলকান্ত নীচে দাঁড়াইয়া হাত নাড়িয়া নলদময়ন্তীর পালা অভিনয় করিত— এইরূপে দীর্ঘ মধ্যাহ্ন অত্যন্ত শীঘ্র কাটিয়া যাইত। কিরণ শরৎকে তাঁহার সহিত একা-

সনে দর্শকশ্রেণীভুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেন, কিন্তু শরৎ অত্যন্ত বিরক্ত হইতেন এবং শরতের সম্মুখে নীলকান্তের প্রতিভাও সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি পাইত না। শাশুড়ি এক একদিন ঠাকুর-দেবতার নাম শুনিবার আশায় আকৃষ্ট হইয়া আসিতেন কিন্তু অবিলম্বে তাঁহার চিরাভ্যস্ত মধ্যাহ্নকালীন নিদ্রাবেশ ভক্তিকে অভিভূত এবং তাঁহাকে শয্যাশায়ী করিয়া দিত।

শরতের কাছ হইতে কানমলা চড়টা চাপড়টা নীলকান্তের অদৃষ্টে প্রায়ই জুটিত; কিন্তু তদপেক্ষা কঠিনতর শাসনপ্রণালীতে আজন্ম অভ্যস্ত থাকাতে সেটা তাহার নিকট অপমান বা বেদনা-জনক বোধ হইত না। নীলকান্তের দৃঢ় ধারণা ছিল যে, পৃথিবীর জল স্থল বিভাগের ন্যায় মানবজন্মটা আহার এবং প্রহারে বিভক্ত; প্রহারের অংশটাই অধিক।

নীলকান্তের ঠিক কত বয়স নির্ণয় করিয়া বলা কঠিন; যদি চোদ্দ পনেরো হয় তবে বয়সের অপেক্ষা মুখ অনেক পাকিয়াছে বলিতে হইবে; যদি সতেরো আঠারো হয় তবে বয়সের অনুরূপ পাক ধরে নাই। হয় সে অকাল-পক্ক, নয় সে অকাল-অপক্ক।

আসল কথা এই, সে অতি অল্প বয়সেই যাত্রার দলে ঢুকিয়া রাধিকা, দময়ন্তী, সীতা এবং বিদ্যার সখী সাজিত। অধিকারীর আবশ্যকমত বিধাতার বরে খানিকদূর পর্য্যন্ত বাড়িয়া তাহার বাড় থামিয়া গেল। তাহাকে সকলে ছোটই দেখিত, আপনাকেও সে ছোটই জ্ঞান করিত, বয়সের উপযুক্ত সম্মান সে কাহারও কাছে পাইত না। এই সকল স্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিক কারণ প্রভাবে সতেরো বৎসর বয়সের সময় তাহাকে অনতিপক্ক সতেরোর অপেক্ষা অতিপরিপক্ক চোদ্দর মত দেখাইত। গোঁফের রেখা না ওঠাতে এই ভ্রম আরো দৃঢ়মূল হইয়াছিল। তামাকের ধোঁয়া

লাগিয়াই হৌক্‌ বা বয়সানুচিত ভাষা প্রয়োগবশতই হৌক্‌, নীলকান্তের ঠোঁটের কাছটা কিছু বেশি পাকা বোধ হইত, কিন্তু তাহার বৃহৎ তারাবিশিষ্ট দুইটি চক্ষের মধ্যে একটা সারল্য এবং তারুণ্য ছিল। অনুমান করি, নীলকান্তের ভিতরটা স্বভাবতঃ কাঁচা, কিন্তু যাত্রার দলের তা' লাগিয়া উপরিভাগে পক্কতার লক্ষণ দেখা দিয়াছে।

শরৎ বাবুর আশ্রয়ে চন্দননগরের বাগানে বাস করিতে করিতে নীলকান্তের উপর স্বভাবের নিয়ম অব্যাহতভাবে আপন কাজ করিতে লাগিল। সে এতদিন যে একটা বয়ঃসন্ধিস্থলে অস্বাভাবিকভাবে দীর্ঘকাল থামিয়া ছিল, এখানে আসিয়া সেটা কখন্‌ এক সময় নিঃশব্দে পার হইয়া গেল। তাহার সতেরো আঠারো বৎসরের বয়ঃক্রম বেশ সম্পূর্ণভাবে পরিণত হইয়া উঠিল।

তাহার সে পরিবর্ত্তন বাহির হইতে কাহারও চোখে পড়িল না, কিন্তু তাহার প্রথম লক্ষণ এই, যে, যখন কিরণ নীলকান্তের প্রতি বালকযোগ্য ব্যবহার করিতেন সে মনে মনে লজ্জিত এবং ব্যথিত হইত। একদিন আমোদপ্রিয় কিরণ তাহাকে স্ত্রীবেশে সখী সাজিবার কথা বলিয়াছিলেন, সে কথাটা অকস্মাৎ তাহার বড়ই কষ্টদায়ক লাগিল অথচ তাহার উপযুক্ত কারণ খুঁজিয়া পাইল না। আজকাল তাহাকে যাত্রার অনুকরণ করিতে ডাকিলেই সে অদৃশ্য হইয়া যাইত। সে যে একটা লক্ষ্মীছাড়া যাত্রার দলের ছোকরার অপেক্ষা অধিক কিছু নয় এ কথা কিছুতে তাহার মনে লইত না।

এমন কি, সে বাড়ির সরকারের নিকট কিছু কিছু করিয়া লেখাপড়া শিখিবার সংকল্প করিল। কিন্তু বৌঠাকরুণের স্নেহভাজন বলিয়া নীলকান্তকে সরকার দুই চক্ষে দেখিতে পারিত না—এবং

মনের একাগ্রতা রক্ষা করিয়া পড়াশুনো কোন কালে অভ্যাস না থাকাতে অক্ষরগুলো তাহার চোখের সাম্‌নে দিয়া ভাসিয়া যাইত। গঙ্গার ধারে চাঁপাতলায় গাছের গুঁড়িতে ঠেসান দিয়া কোলের উপর বই খুলিয়া সে দীর্ঘকাল বসিয়া থাকিত; জল ছল্ ছল্ করিত, নৌকা ভাসিয়া যাইত, শাখার উপরে চঞ্চল অন্যমনস্ক পাখী কিচ্‌মিচ্ শব্দে স্বগত উক্তি প্রকাশ করিত, নীলকান্ত বই-য়ের পাতায় চক্ষু রাখিয়া কি ভাবিত সেই জানে অথবা সেও জানে না। একটা কথা হইতে কিছুতেই আর একটা কথায় গিয়া পৌঁছিতে পারিত না, অথচ, বই পড়িতেছি মনে করিয়া তাহার ভারি একটা আত্মগৌরব উপস্থিত হইত। সাম্‌নে দিয়া যখন একটা নৌকা যাইত তখন সে আরও অধিক আড়ম্বরের সহিত বইখানা তুলিয়া লইয়া বিড় বিড় করিয়া পড়ার ভান করিত; দর্শক চলিয়া গেলে সে আর পড়ার উৎসাহ রক্ষা করিতে পারিত না।

পূর্ব্বে সে অভ্যস্ত গানগুলো যন্ত্রের মত যথানিয়মে গাহিয়া যাইত, এখন সেই গানের সুরগুলো তাহার মনে এক অপূর্ব্ব চাঞ্চল্য সঞ্চার করে। গানের কথা অতি যৎসামান্য, তুচ্ছ অনুপ্রাসে পরিপূর্ণ, তাহার অর্থও নীলকান্তের নিকট সম্যক্ বোধগম্য নহে, কিন্তু যখন সে গাহিত—

ওরে রাজহংস, জন্মি দ্বিজবংশে, এমন নৃশংস কেন হলি রে,
বল্ কি জন্যে,এ অরণ্যে, রাজকন্যের প্রাণসংশয় করিলি রে,—

তখন সে যেন সহসা লোকান্তরে জন্মান্তরে উপনীত হই — তখন চারিদিকের অভ্যস্ত জগৎটা এবং তাহার তুচ্ছ জীবনটা গানে তর্জ্জমা হইয়া একটা নূতন চেহারা ধারণ করিত। রাজ-হংস এবং রাজকন্যার কথা হইতে তাহার মনে এক অপরূপ ছবির আভাস জাগিয়া উঠিত, সে আপনাকে কি মনে করিত স্পষ্ট করিয়া

বলা যায় না, কিন্তু যাত্রার দলের পিতৃমাতৃহীন ছোকরা বলিয়া ভুলিয়া যাইত। নিতান্ত অকিঞ্চনের ঘরের হতভাগ্য মলিন শিশু যখন সন্ধ্যাশয্যায় শুইয়া, রাজপুত্র, রাজকন্যা এবং সাত রাজার ধন মাণিকের কথা শোনে তখন সেই ক্ষীণ দীপালোকিত জীর্ণ গৃহ-কোণের অন্ধকারে তাহার মনটা সমস্ত দারিদ্র্য ও হীনতার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া এক সর্ব্বসম্ভব রূপকথার রাজ্যে একটা নূতন রূপ, উজ্জ্বল বেশ এবং অপ্রতিহত ক্ষমতা ধারণ করে; সেইরূপ গানের সুরের মধ্যে এই যাত্রার দলের ছেলেটি আপনাকে এবং আপনার জগৎটিকে একটি নবীন আকারে সৃজন করিয়া তুলিত; জলের ধ্বনি, পাতার শব্দ, পাখীর ডাক, এবং যে লক্ষ্মী এই লক্ষ্মী-ছাড়াকে আশ্রয় দিয়াছেন তাঁহার সহাস্য স্নেহমুখচ্ছবি, তাঁহার কল্যাণমণ্ডিত বলয়বেষ্টিত বাহু দুইখানি এবং দুর্লভ সুন্দর পুষ্পদল-কোমল রক্তিম চরণযুগল কি এক মায়ামন্ত্রবলে রাগিণীর মধ্যে রূপা-ন্তরিত হইয়া যাইত। আবার এক সময় এই গীতি-মরীচিকা কোথায় অপসারিত হইত, যাত্রার দলের নীলকান্ত ঝাঁকড়া চুল লইয়া প্রকাশ পাইত, আমবাগানের অধ্যক্ষ প্রতিবেশীর অভিযোগ-ক্রমে শরৎ আসিয়া তাহার গালে ঠাস্ ঠাস্ করিয়া চড় কসাইয়া দিতেন, এবং বালক ভক্তমণ্ডলীর অধিনায়ক হইয়া নীলকান্ত জলে স্থলে এবং তরুশাখাগ্রে নব নব উপদ্রব সৃজন করিতে বাহির হইত।

ইতিমধ্যে শরতের ভাই সতীশ কলিকাতা কলেজের ছুটিতে বাগানে আসিয়া আশ্রয় লইল। কিরণ ভারি খুসি হইলেন, তাঁহার হাতে আর একটি কাজ জুটিল; উপবেশনে আহারে আচ্ছাদনে সমবয়স্ক ঠাকুরপোর প্রতি পরিহাসপাশ বিস্তার করিতে লাগিলেন। কখনও হাতে সিঁদূর মাখিয়া তাহার চোখ টিপিয়া ধরেন, কখনো

তাহার জামার পিঠে বাঁদর লিখিয়া রাখেন, কখনো ঝনাৎ করিয়া বাহির হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া সুললিত উচ্চহাস্যে পলায়ন করেন। সতীশও ছাড়িবার পাত্র নহে; সে তাঁহার চাবি চুরি করিয়া, তাঁহার পানের মধ্যে লঙ্কা পূরিয়া, অলক্ষিতে খাটের খুরার সহিত তাঁহার আঁচল বাঁধিয়া প্রতিশোধ তুলিতে থাকে। এইরূপে উভয়ে সমস্ত দিন তর্জ্জন ধাবন হাস্য, এমন কি, মাঝে মাঝে কলহ, ক্রন্দন, সাধাসাধি এবং পুনরায় শান্তিস্থাপন চলিতে লাগিল।

নীলকান্তকে কি ভূতে পাইল কে জানে! সে কি উপলক্ষ্য করিয়া কাহার সহিত বিবাদ করিবে ভাবিয়া পায় না, অথচ তাহার মন তীব্র তিক্তরসে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। সে তাহার ভক্ত বালকগুলিকে অন্যায়রূপে কাঁদাইতে লাগিল, তাহার সেই পোষা দিশী কুকুরটাকে অকারণে লাথি মারিয়া কেঁই কেঁই শব্দে নভোমণ্ডল ধ্বনিত করিয়া তুলিল, এমন কি, পথে ভ্রমণের সময় সবেগে ছড়ি মারিয়া আগাছাগুলার শাখাচ্ছেদন করিয়া চলিতে লাগিল।

যাহারা ভাল খাইতে পারে তাহাদিগকে সম্মুখে বসিয়া খাওয়াইতে কিরণ অত্যন্ত ভালবাসেন। ভাল খাইবার ক্ষমতাটা নীলকান্তের ছিল, সুখাদ্য দ্রব্য পুনঃ পুনঃ খাইবার অনুরোধ তাহার নিকট কদাচ ব্যর্থ হইত না। এই জন্য কিরণ প্রায় তাহাকে ডাকিয়া লইয়া নিজে থাকিয়া খাওয়াইতেন, এবং এই ব্রাহ্মণ বালকের তৃপ্তিপূর্ব্বক আহার দেখিয়া তিনি বিশেষ সুখ অনুভব করিতেন। সতীশ আসার পরে অনবসরবশতঃ নীলকান্তের আহারস্থলে প্রায় মাঝে মাঝে কিরণকে অনুপস্থিত থাকিতে হইত;—পূর্ব্বে এরূপ ঘটনায় তাহার ভোজনের কিছুমাত্র ব্যাঘাত হইত না; সে সর্ব্বশেষে দুধের বাটি ধুইয়া তাহার জলসুদ্ধ খাইয়া তবে উঠিত,—কিন্তু আজকাল কিরণ নিজে ডাকিয়া না খাওয়াইলে

তাহার বক্ষ ব্যথিত তাহার মুখ বিস্বাদ হইয়া উঠিত, না খাইয়া উঠিয়া পড়িত, বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে দাসীকে বলিয়া যাইত, আমার ক্ষুধা নাই। মনে করিত, কিরণ সংবাদ পাইয়া এখনি অনুতপ্তচিত্তে তহোকে ডাকিয়া পাঠাইবেন, এবং খাইবার জন্য বারম্বার অনুরোধ করিবেন, সে তথাপি কিছুতেই সে অনুরোধ পালন করিবে না, বলিবে, আমার ক্ষুধা নাই। কিন্তু কিরণকে কেহ সংবাদও দেয় না, কিরণ তাহাকে ডাকিয়াও পাঠান না; খাবার যাহা থাকে দাসী খাইয়া ফেলে। তখন সে আপন শয়নগৃহের প্রদীপ নিবাইয়া দিয়া অন্ধকার বিছানার উপর পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া ফাঁপিয়া ফাঁপিয়া মুখের উপর সবলে বালিশ চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিতে থাকে; কিন্তু কি তাহার নালিশ, কাহার উপরে তাহার দাবী, কে তাহাকে সান্ত্বনা করিতে আসিবে! যখন কেহই আসে না তখন স্নেহময়ী নিদ্রা আসিয়া ধীরে ধীরে কোমল করস্পর্শে এই মাতৃহীন ব্যথিত বালকের অভিমান শান্ত করিয়া দেন।

নীলকান্তের দৃঢ় ধারণা হইল সতীশ কিরণের কাছে তাহার নামে সর্ব্বদাই লাগায়; যে দিন কিরণ কোন কারণে গম্ভীর হইয়া থাকিতেন সে দিন নীলকান্ত মনে করিত সতীশের চক্রান্তে কিরণ তাহারই উপর রাগ করিয়া আছেন।

এখন হইতে নীলকান্ত একমনে তীব্র আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সর্ব্বদাই দেবতার নিকট প্রার্থনা করে, আর জন্মে আমি যেন সতীশ হই, এবং সতীশ যেন আমি হয়। সে জানিত ব্রাহ্মণের একান্তমনের অভিশাপ কখন নিস্ফল হয় না, এই জন্য সে মনে মনে সতীশকে ব্রহ্মতেজে দগ্ধ করিতে গিয়া নিজে দগ্ধ হইতে থাকিত, এবং উপরের তলা হইতে সতীশ ও তাহার বৌঠাকুরাণীর উচ্ছ্বসিত উচ্চহাস্যমিশ্রিত পরিহাসকলরব শুনিতে পাইত।

নীলকান্ত স্পষ্টতঃ সতীশের কোনরূপ শক্রতা করিতে সাহস করিত না, কিন্তু সুযোগমত তাহার ছোটখাট অসুবিধা ঘটাইয়া প্রীতিলাভ করিত। ঘাটের সোপানে সাবান রাখিয়া সতীশ যখন গঙ্গায় নামিয়া ডুব দিতে আরম্ভ করিত, তখন নীলকান্ত ফস্ করিয়া আসিয়া সাবান চুরি করিয়া লইত—সতীশ যথাকালে সাবানের সন্ধানে আসিয়া দেখিত সাবান নাই। একদিন নাহিতে নাহিতে হঠাৎ দেখিল তাহার বিশেষ সখের চিকনের কাজ করা জামাটি গঙ্গার জলে ভাসিয়া যাইতেছে, ভাবিল হাওয়ায় উড়িয়া গেছে কিন্তু হাওয়াটা কোন্‌দিক হইতে বহিল তাহা কেহ জানে না। একদিন সতীশকে আমোদ দিবার জন্য কিরণ নীলকান্তকে ডাকিয়া তাহাকে যাত্রার গান গাহিতে বলিলেন—নীলকান্ত নিরুত্তর হইয়া রহিল। কিরণ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোর আবার কি হলরে? নীলকান্ত তাহার জবাব দিল না। কিরণ পুনশ্চ বলিলেন, সেই গানটা গা না!—সে আমি ভুলে গেছি বলিয়া নীলকান্ত চলিয়া গেল।

অবশেষে কিরণের দেশে ফিরিবার সময় হইল। সকলেই প্রস্তুত হইতে লাগিল;—সতীশও সঙ্গে যাইবে। কিন্তু নীলকান্তকে কেহ কোন কথাই বলে না। সে সঙ্গে যাইবে কি থাকিবে সে প্রশ্নমাত্র কাহারও মনে উদয় হয় না। কিরণ নীলকান্তকে সঙ্গে লইবার প্রস্তাব করিলেন তাহাতে শাশুড়ি স্বামী এবং দেবর সকলেই একবাক্যে আপত্তি করিয়া উঠিলেন, কিরণও তাঁহার সংকল্প ত্যাগ করিলেন। অবশেষে যাত্রার দুইদিন আগে ব্রাহ্মণ বালককে ডাকিয়া কিরণ তাহাকে স্নেহবাক্যে স্বদেশে যাইতে উপদেশ করিলেন। সে উপরি উপরি কয়দিন অবহেলার পর মিষ্টবাক্য শুনিতে পাইয়া আর থাকিতে পারিল না, একেবারে কাঁদিয়া

উঠিল। কিরণেরও চোখ ছল্ ছল্ করিয়া উঠিল ;—যাহাকে চির-কাল কাছে রাখা যাইবে না, তাহাকে কিছুদিন আদর দিয়া তাহার মায়া বসিতে দেওয়া ভাল হয় নাই বলিয়া কিরণের মনে বড় অনুতাপ উপস্থিত হইল। সতীশ কাছে উপস্থিত ছিল, সে অতবড় ছেলের কান্না দেখিয়া ভারি বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল—আরে মোলো! কথা নাই বার্ত্তা নাই, একেবারে কাঁদি-য়াই অস্থির!—কিরণ এই কঠোর উক্তির জন্য সতীশকে ভর্ৎসনা করিলেন ; সতীশ কহিল, তুমি বোঝনা বৌদিদি, তুমি সকলকেই বড় বেশি বিশ্বাস কর ; কোথাকার কে তাহার ঠিক নাই, এখানে আসিয়া দিব্য রাজার হালে আছে। আবার পুনর্মূষিক হইবার আশঙ্কায় আজ মায়া-কান্না জুড়িয়াছে—ও বেশ জানে যে দু ফোঁটা চখের জল ফেলিলেই তুমি গলিয়া যাইবে।

নীলকান্ত তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল ;—কিন্তু তাহার মনটা সতী-শের কাল্পনিক মূর্ত্তিকে ছুরি হইয়া কাটিতে লাগিল, ছুঁচ হইয়া বিঁধিতে লাগিল, আগুন হইয়া জ্বালাইতে লাগিল, কিন্তু প্রকৃত সতীশের গায়ে একটি চিহ্নমাত্র বসিল না, কেবল তাহারই মর্ম্মস্থল হইতে রক্তপাত হইতে লাগিল।

কলিকাতা হইতে সতীশ একটি সৌখীন দোয়াতদান কিনিয়া আনিয়াছিল, তাহাতে দুইপাশে দুই ঝিনুকের নৌকার উপর দোয়াত বসান, এবং মাঝে একটা জর্ম্মন্ রৌপ্যের হাঁস উন্মুক্ত চঞ্চু-পুটে কলম লইয়া পাখা মেলিয়া বসিয়া আছে, সেটির প্রতি সতীশের অত্যন্ত যত্ন ছিল ; প্রায় সে মাঝে মাঝে সিল্কের রুমাল দিয়া অতি সযত্নে সেটি ঝাড়পোঁচ করিত। কিরণ প্রায়ই পরিহাস করিয়া সেই রৌপ্যহংসের চঞ্চু-অগ্রভাগে অঙ্গুলির আঘাত করিয়া বলিতেন, ওরে রাজহংস, জন্মি দ্বিজবংশে এমন নৃশংস কেন হলিরে—এবং

ইহাই উপলক্ষ্য করিয়া দেবরে তাঁহাতে হাস্যকৌতুকের বাগ্যুদ্ধ চলিত!

স্বদেশযাত্রার আগের দিন সকাল-বেলায় সে জিনিষটা খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। কিরণ হাসিয়া কহিলেন, ঠাকুরপো, তোমার রাজহংস তোমার দময়ন্তীর অন্বেষণে উড়িয়াছে। কিন্তু সতীশ অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিল। নীলকান্তই যে সেটা চুরি করিয়াছে সে বিষয়ে তাহার সন্দেহমাত্র রহিল না—গতকল্য সন্ধ্যার সময় তাহাকে সতীশের ঘরের কাছে ঘুর ঘুর করিতে দেখিয়াছে এমন সাক্ষীও পাওয়া গেল। সতীশের সম্মুখে অপরাধী আনীত হইল। সেখানে কিরণও উপস্থিত ছিলেন। সতীশ একেবারেই তাহাকে বলিয়া উঠিলেন, তুই আমার দোয়াত চুরি করে' কোথায় রেখেছিস্, এনে দে!

নীলকান্ত নানা অপরাধে এবং বিনা অপরাধেও শরতের কাছে অনেক মার খাইয়াছে, এবং বরাবর প্রফুল্লচিত্তে তাহা বহন করিয়াছে। কিন্তু কিরণের সম্মুখে যখন তাহার নামে দোয়াৎ চুরির অপবাদ আসিল, তখন তাহার বড় বড় দুই চোখ আগুনের মত জ্বলিতে লাগিল; তাহার বুকের কাছটা ফুলিয়া কণ্ঠের কাছে ঠেলিয়া উঠিল; সতীশ আর একটা কথা বলিলেই সে তাহার দুই হাতের দশ নখ্ লইয়া ক্রুদ্ধ বিড়ালশাবকের মত সতীশের উপর গিয়া পড়িত। তখন কিরণ তাহাকে পাশের ঘরে ডাকিয়া লইয়া মৃদুমিষ্টস্বরে বলিলেন—নীলু, যদি সেই দোয়াৎটা নিয়ে থাকিস্ আমাকে আস্তে আস্তে দিয়ে যা, তোকে কেউ কিছু বল্‌বে না!

তখন নীলকান্তর চোখ ফাটিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল, অবশেষে সে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল। কিরণ বাহিরে আসিয়া বলিলেন, নীলকান্ত কখনই চুরি করে নি! শরৎ এবং

সতীশ উভয়েই বলিতে লাগিলেন, নিশ্চয়, নীলকান্ত ছাড়া আর কেহই চুরি করেনি। কিরণ সবলে বলিলেন, কখনই না। শরৎ নীলকান্তকে ডাকিয়া সওয়াল করিতে ইচ্ছা করিলেন, কিরণ বলিলেন, না, উহাকে এই চুরি সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিবে না। সতীশ কহিলেন, উহার ঘর এবং বাক্স খুঁজিয়া দেখা উচিত। কিরণ বলিলেন, তাহা যদি কর, তাহা হইলে তোমার সঙ্গে আমার জন্মশোধ আড়ি হইবে। নির্দোষীর প্রতি কোনরূপ সন্দেহ প্রকাশ করিতে পাইবে না। বলিতে বলিতে তাঁহার চোখের পাতা দুই ফোঁটা জলে ভিজিয়া উঠিল। তাহার পর সেই দুটি করুণ চক্ষুর অশ্রুজলের দোহাই মানিয়া নীলকান্তের প্রতি আর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা হইল না।

নিরীহ আশ্রিত বালকের প্রতি এইরূপ অত্যাচারে কিরণের মনে অত্যন্ত দয়ার সঞ্চার হইল। তিনি ভাল দুই জোড়া ফরাসডাঙ্গার ধুতি চাদর, দুইটি জামা, এক জোড়া নূতন জুতা এবং একটি দশ টাকার নোট লইয়া সন্ধ্যাবেলায় নীলকান্তের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, নীলকান্তকে না বলিয়া সেই স্নেহ-উপহারগুলি আস্তে আস্তে তাহার বাক্সর মধ্যে রাখিয়া আসিবেন। টিনের বাক্সটিও তাঁহার দত্ত। আঁচল হইতে চাবির গোচ্ছা লইয়া নিঃশব্দে সেই বাক্স খুলিলেন। কিন্তু তাঁহার উপহারগুলি ধরাইতে পারিলেন না। বাক্সর মধ্যে লাঠাই, কঞ্চি, কাঁচা আম কাটিবার জন্য ঘষা ঝিনুক, ভাঙ্গা গ্লাসের তলা প্রভৃতি নানা জাতীয় পদার্থ স্তূপাকারে রক্ষিত। কিরণ ভাবিলেন, বাক্সটি ভাল করিয়া গুছাইয়া তাহার মধ্যে সকল জিনিষ ধরাইতে পারিবেন। সেই উদ্দেশে বাক্সটি খালি করিতে লাগিলেন। প্রথমে লাঠাই লাঠিম ছুরি ছড়ি প্রভৃতি বাহির হইতে লাগিল—তাহার

পরে থানকয়েক ময়লা এবং কাচা কাপড় বাহির হইল, তাহার পরে সকলের নীচে হঠাৎ সতীশের সেই বহুযত্নের রাজহংসশোভিত দোয়াতদানটি বাহির হইয়া আসিল। কিরণ আশ্চর্য্য হইয়া আরক্তিমমুখে অনেকক্ষণ সেটি হাতে করিয়া লইয়া ভাবিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে কখন্ নীলকান্ত পশ্চাৎ হইতে ঘরে প্রবেশ করিল তিনি তাহা জানিতেও পারিলেন না। নীলকান্ত সমস্তই দেখিল; মনে করিল কিরণ স্বয়ং চোরের মত তাহার চুরি ধরিতে আসিয়াছেন, এবং তাহার চুরিও ধরা পড়িয়াছে। সে যে সামান্য চোরের মত লোভে পড়িয়া চুরি করে নাই, সে যে কেবল প্রতিহিংসা সাধনের জন্য একাজ করিয়াছে, সে যে ঐ জিনিষটা গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিবে বলিয়াই ঠিক করিয়াছিল, কেবল এক মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতাবশতঃ ফেলিয়া না দিয়া নিজের বাক্সর মধ্যে পূরিয়াছে সে সকল কথা সে কেমন করিয়া বুঝাইবে! সে চোর নয়, সে চোর নয়! তবে সে কি? কেমন করিয়া বলিবে সে কি! সে চুরি করিয়াছে কিন্তু সে চোর নহে; কিরণ যে তাহাকে চোর বলিয়া সন্দেহ করিয়াছেন এ নিষ্ঠুর অন্যায় সে কিছুতেই বুঝাইতেও পারিবে না, বহন করিতেও পারিবে না।

কিরণ একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সেই দোয়াতদানটা বাক্সর ভিতরে রাখিলেন। চোরের মত তাহার উপরে ময়লা কাপড় চাপা দিলেন, তাহার উপর বালকের লাঠাই লাঠি লাঠিম ঝিনুক কাঁচের টুক্‌রা প্রভৃতি সমস্তই রাখিলেন, এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার উপহারগুলি ও দশ টাকার নোটটি সাজাইয়া রাখিলেন।

কিন্তু পরের দিন সেই ব্রাহ্মণ বালকের কোন উদ্দেশ পাওয়া গেল না। গ্রামের লোকেরা বলিল, তাহাকে দেখে নাই; পুলিস বলিল তাহার সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না; শরৎ সপরিবারে

দেশে চলিয়া গেলেন; বাগান একদিনে শূন্য হইয়া গেল; কেবল নীলকান্তের সেই পোষা গ্রাম্য কুকুরটা আহার ত্যাগ করিয়া নদীর ধারে ধারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া খুঁজিয়া খুঁজিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়াইতে লাগিল!

ইন্দ্রপূজা।

ইন্দ্র বৈদিক দেবতা। বেদের নানাস্থানে ইন্দ্রের উদ্দেশে স্তবস্তুতি দেখিতে পাওয়া যায়। (১) অনেকের মতে বৈদিকযুগের শেষাবস্থায় ইন্দ্র পৃথক দেবতা বলিয়া পরিগণিত হইতেন না। ঋগ্বেদে লিখিত আছে, আচার্য্যেরা একমাত্র পরমেশ্বরকে ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি প্রভৃতি নানা নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। (২) ভগবান মনুও ইন্দ্রশব্দ পরমেশ্বরের নামান্তর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। (৩) পুরাণে ইন্দ্র দেবগণের রাজারূপে উল্লিখিত হইয়াছেন। যাহাই হউক—ঈশ্বরের নামান্তর বোধেই হউক, আর পৃথক দেবতাজ্ঞানেই হউক, ইন্দ্রপূজা হিন্দুজাতির মধ্যে বহুকাল হইতে প্রচলিত ছিল। কলিযুগে বৈদিক রীতির প্রায় সমস্তই অন্যথা হইয়াছে। ইন্দ্র বরুণের উদ্দেশে প্রজ্জলিত হোমাগ্নিতে আর

---

(১) "শং ন ইন্দ্রোবৃহস্পতিঃ শং নো বিষ্ণু রুরুক্রমঃ।" ইত্যাদি। কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয়োপনিষৎ।

(২) "ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথোদিব্যঃ" ইত্যাদি। ঋগ্বেদ ১। ১৬৪ ৪৬।

(৩) "এতমেকে বদন্ত্যগ্নিং মনুমন্যে প্রজাপতিম্।
ইন্দ্রমেক পরে প্রাণমপরে ব্রহ্মশাশ্বতম্॥"
মনু ১২শ অধ্যায়, ১২৩।

দেবভোগ্য পবিত্র হবিঃ নিক্ষিপ্ত হয় না। কালী দুর্গা প্রভৃতি পৌরাণিক দেবদেবী ও রামকৃষ্ণাদি অবতারগণ এখন বৈদিক দেবতাগণের স্থান অধিকার করিয়াছেন। কিন্তু সহস্রলোচন ইন্দ্রকে কেহই পরাস্ত করিতে পারেন নাই। তিনি আজিও বঙ্গীয় পুরন্ধ্রীগণের নিকট প্রতিবর্ষে যথাবিধি পূজা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

কিন্তু এ পূজা বৈদিক রীতিতে সম্পন্ন হয় না, কাল পরিবর্ত্তনে পূজা-পদ্ধতিও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সত্যযুগের সে সমিধ্ নাই, কুশ নাই, অগ্নি নাই, হোম নাই ;—আছে কেবল ঢাকঢোল নৈবেদ্য, গণ্ডমূর্খ পুরোহিত এবং তথৈবচ প্রতিমা। তবে এক বিষয়ে দেবরাজকে সমস্ত দেবতা অপেক্ষা সৌভাগ্যশালী বলা যাইতে পারে। কোমলকণ্ঠ কামিনীগণের সুমধুর সঙ্গীতনিনাদ এবং নূপুরনিক্কণসমন্বিত সুললিত নৃত্য এই পূজার সর্ব্বপ্রধান উপকরণ। বঙ্গীয় বামাগণের, বিশেষতঃ হিন্দুকুলবধূগণের সঙ্গীত ও নৃত্যের কথা শুনিয়া অনেকেই হয়ত শিহরিয়া উঠিবেন, এবং লেখককে অনৃতবাদী বলিয়া অপরাধী করিবেন। কিন্তু এই প্রবন্ধলেখক সহরবাসী "নাগরিক" নহেন, তিনি পল্লিসমাজে বাস করিয়া বাল্যকালে যাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন এবং যুবাকালে স্বকর্ণে শুনিয়াছেন, এ প্রবন্ধে তাহাই লিখিত হইতেছে, ইহাতে অতিরঞ্জনের নাম মাত্রও নাই।

এই ইন্দ্রপূজা কতদিন হইতে বঙ্গদেশে প্রচলিত আছে, তাহা অবগত হইবার কোন উপায় নাই। বীরভূম, বর্দ্ধমান ও মুরশিদাবাদ ব্যতীত বঙ্গদেশের আর কোন্ কোন্ অংশে এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশে ইহা প্রচলিত আছে কি না বলা যায় না। কবি চণ্ডিদাস তাঁহার পদাবলীর এক স্থানে বলিয়াছেন,

গোকুল নগরে ইন্দ্রপূজা করে
দেখি আইল যত নারী।
নগর ভিতর মহা কলরব
নাগর হৈল পসারি ॥

গোকুলনগরের ব্রজবালাদের কথা জানিনা কিন্তু, কবি চণ্ডিদাসের জন্মভূমি বীরভূমের জনপদবধূগণ এখনও ইন্দ্রপূজা বিস্মৃত হন নাই।

সাধনমাত্রেরই সিদ্ধি এবং উপায়মাত্রেরই উদ্দেশ্য থাকা আবশ্যক। ইন্দ্রপূজার প্রধান সাধন সঙ্গীত ও নৃত্য যেমন প্রীতিজনক, উদ্দেশ্যও সেইরূপ অতি উপাদেয়। "ইহামুত্রার্থফলভোগবিরাগ" বা "শমদমাদিষট্‌সম্পত্তি"র ন্যায় কোন উৎকট সিদ্ধিলাভ ইহার উদ্দেশ্য নহে। এই "সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা" বঙ্গভূমি যাহাতে তৃণশস্যে সুশোভিত হয়, এই জন্যই ইন্দ্রের আরাধনা। দেবমাতৃক প্রদেশে বৃষ্টি ব্যতীত শস্য উৎপন্ন হয় না, কৃষিজীবী প্রজার যথাকালে সুবৃষ্টি একমাত্র অবলম্বন। দেবরাজের অনুগ্রহ না হইলে বৃষ্টি হয় না, মেঘসকল তাঁহার অধীন, সুতরাং পৃথিবীর উৎপাদিকাশক্তি ও শস্য-সম্পত্তি ইন্দ্রের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিতেছে। বোধ হয় এই পৌরাণিক আখ্যায়িকাই ইন্দ্রপূজা-প্রবর্ত্তনের মূল কারণ। পূজার অনুষ্ঠানেও ইহার অনেকটা আভাস পাওয়া যায়।

এই ইন্দ্রপূজা বর্দ্ধমান প্রদেশে স্ত্রীসমাজে "ভাঁজো" নামে প্রসিদ্ধ। 'ভজন' শব্দের অপভ্রংশ "ভাঁজো"। পূজার পদ্ধতি এইরূপ;——

ভাদ্র মাসের শুক্লা ষষ্ঠীর নাম "মন্থনষষ্ঠী"। মন্থনষষ্ঠীর পূর্ব্বদিন পঞ্চমী তিথিতে মটর, মুগ, ছোলা, অরহর ও বিরি (মাসকলাই)

এই পাঁচ রকম শস্য একটী পাত্রে ভিজাইয়া রাখিতে হয়। পরদিন ষষ্ঠীপূজাতে উহা নৈবেদ্যস্বরূপ প্রদত্ত হয়। অনন্তর ষষ্ঠীপূজা শেষ হইলে অবশিষ্ট যে শস্য থাকে, তাহা কিঞ্চিৎ সর্ষপসহ নূতন শরাতে ইন্দুর মাটির সহিত মিশ্রিত করিয়া রাখিতে হয়। ইহাকে মেয়েলি ভাষায় "শস্পাতা," সাধু ভাষায় "শস্য পাতা" বা "শস্য রোপন" বলে। স্ত্রীলোকেরা শুদ্ধবস্ত্র পরিধান করিয়া দ্বাদশী পর্য্যন্ত প্রতিদিন ঐ শরাতে অল্প পরিমাণে জল দিতে থাকেন। ৪।৫ দিন এইরূপ জল দেওয়ার পর যদি ভালরূপ অঙ্কুরোদ্গম হয়, তাহা হইলে এবর্ষে প্রচুর শস্যোৎপন্ন হইবে বুঝিতে পারা যায়।

"মন্থনষষ্ঠীর" পরবর্ত্তী শুক্লাদ্বাদশী তিথিতে সন্ধ্যার পর ইন্দ্রপূজা হইয়া থাকে। এই জন্য এই তিথির নাম "ইন্দ্র দ্বাদশী"। কৌলিক নিয়মানুসারে গ্রামের কোন ব্রাহ্মণ-গৃহস্থের অন্তঃপুরে একটী মৃত্তিকানির্ম্মিত অনতিউচ্চ বেদি প্রস্তুত হয়। ঐ বেদিকার উপর হস্তীপৃষ্ঠে অবস্থিত দ্বিহস্ত ইন্দ্রমূর্ত্তি স্থাপিত হয়। অনন্তর সন্ধ্যা সমাগত হইলে, মন্থনষষ্ঠীর দিন নূতন শরাতে যে পঞ্চশস্য রোপন করা হইয়াছে, মহিলাগণ স্বহস্তে সেই শস্যসমেত শরাগুলি বেদিকার চারিদিকে রাখিয়া দেন। সধবা বিধবা এবং কুমারী সকলেরই ইন্দ্রপূজায় অধিকার আছে। সাধারণতঃ ৭।৮ বৎসর হইতে ২০।২৫ বৎসর বয়স্কা রমণীগণ এই পূজায় যোগদান করিয়া থাকেন। সকলে আপন আপন "শস্য" বেদির উপর স্থাপন করিলে পুরোহিত যথারীতি মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া পূজা সমাপ্ত করেন।

অনন্তর রজনী প্রহরাতীত হইলে শরজ্জ্যোৎস্নায় চারিদিক যখন আনন্দে এবং আলোকে হাস্য করিতে থাকে, সেই হাস্যময়ী জ্যোৎস্নাবতী রাত্রিতে বালিকা এবং যুবতীগণ মনোহর বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত হইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন। তখন অন্তঃ-

পুরের সমস্ত দ্বার দৃঢ়রূপে বন্ধ করা হয়। এ সময়ে কোন পুরুষ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে পারেন না। কেবল বাদ্যকর বেদি হইতে কিঞ্চিৎ দূরে পর্দ্দার অন্তরালে বসিয়া বাদ্য বাজাইতে থাকে। কখন কখন ৬।৭ বৎসরের বালকগণও এই উৎসবে প্রবেশাধিকার পাইয়া থাকেন। প্রবন্ধলেখক সৌভাগ্যবশতঃ ৮ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় একবার এই অধিকার লাভ করিয়াছিলেন।

অতঃপর সমবেত মহিলারা পরস্পর হস্তধারণ করিয়া ইন্দ্রপ্রতিমাকে বেষ্টনপূর্ব্বক বেদির চারিদিকে মণ্ডলাকারে দণ্ডায়মান হ'ন, এবং সকলে এক সঙ্গে সুরসংযোগে

"ভাঁজো লো কল্‌কলানি মাটির লো শরা।
ভাঁজোর গলায় দেব আমরা পঞ্চ ফুলের মালা।"

এই ছড়া আবৃত্তি করিয়া ইন্দ্রের গলায় পঞ্চপুষ্পের মালা প্রদান করেন। পরে বাদ্যের তালে তালে সকলে পূর্ব্ববৎ হস্তধারণ করিয়া বেদি প্রদক্ষিণপূর্ব্বক নৃত্য করিতে করিতে বলেন,

"এক কলসী গঙ্গাজল এক কলসী ঘি।
বৎসরান্তর একবার ভাঁজো! নাচবো না তো কি॥"

ইহার পর মহিলারা দুই দলে বিভক্ত হইয়া নৃত্য ও অনেক ছড়াকাটাকাটি করেন। এই সকল ছড়া প্রায়ই মুখে মুখে রচিত হইয়া থাকে, কিন্তু ইহার মধ্যে শ্লীল অশ্লীলের বড় বিচার থাকে না। যাঁহারা দিবাভাগে অবগুণ্ঠনাবৃতা হইয়া লজ্জাবতী লতার ন্যায় বিচরণ করেন, তাঁহাদের মুখে অশ্লীল সঙ্গীত; যাঁহাদিগকে অন্তঃপুরপ্রাঙ্গণে নিঃশব্দে ভ্রমণ করিতে হয়, তাঁহাদের পুরুষোচিত তাণ্ডবলীলা; ইহা অতি বিচিত্র রহস্য! কিন্তু রহস্যের মর্ম্মভেদ করা কঠিন নয়। স্বর্গে সুরপুরে দেবরাজ পুরন্দরের সভায় দেবগণের সন্তোষবিধানার্থ অপ্সরাগণ নৃত্য ও সঙ্গীত করেন, পুরাণ-

বর্ণিত এ সকল বৃত্তান্ত হিন্দুসমাজের সর্ব্বত্রই সুপরিচিত। বোধ হয় এই "স্বর্গীয়" প্রথার অনুকরণে শস্য ও বৃষ্টি কামনায় ইন্দ্র-পূজার বিধি প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকিবে। শুনিতে পাওয়া যায়, সুরসভায় নৃত্যের সময় কোন প্রকার ব্যতিক্রম লক্ষিত হইলে নৃত্যকারিণীকে সমুচিত দণ্ড গ্রহণ করিতে হইত। কিন্তু মর্ত্ত্যের ইন্দ্রসভায় অশ্লীলতা প্রবেশ করিল কিরূপে? শিক্ষা ও শাসনের অভাবই ইহার প্রধান কারণ বলিয়া মনে হয়। আর একটী প্রধান কারণ স্ত্রী ও পুরুষসমাজের অতিমাত্র পার্থক্য। রমণী যাহা পুরুষের সমক্ষে করিতে পারেন না, এবং পুরুষ যাহা রমণীর সমক্ষে করিতে পারেন না, ধর্ম্মানুষ্ঠান হউক আর আমোদপ্রমোদ হউক—তাহা ক্রমশঃ দূষিত হইবারই বিশেষ সম্ভাবনা। পরস্পরের প্রতি সম্ভ্রম-বশতঃ যে আত্মসম্ভ্রম ও আত্মসংযমের উদয় হয়, তাহাই সকল অবস্থার মধ্যে পুরুষ ও নারীকে নীতি ও ধর্ম্মের দিকে ধারণ করিয়া থাকে। আমাদের বোধ হয় যদি ইন্দ্রপূজায় পুরুষের সমক্ষে নৃত্যের প্রথা প্রবর্ত্তিত হইত, তাহা হইলে ইহার ভিতর কোন-প্রকার অভদ্রতা ও অশ্লীলতা প্রবেশ করিতে পারিত না।

ইন্দ্রপূজার বিবরণ এখনও সমাপ্ত হয় নাই, তৎসম্বন্ধে আরও দুই চারিটী কথা বলা আবশ্যক। পূর্ব্বকথিত ছড়া বা গানগুলির অধিকাংশই ব্যক্তিগত উক্তি প্রত্যুক্তি মাত্র। ২।৪টী সাধারণভাবের ছড়াও আছে। আমরা অনেক চেষ্টায় তাহার দুইটীমাত্র সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। ছড়া দুইটী এই—

১। "পূর্ণিমার চাঁদ দেখে তেঁতুল হল বঙ্ক।
গড়ের গুগ্‌লি বলেন, আমি হব শঙ্খ॥"

২। "ওগো ভাঁজো! তুমি কিসের গরব কর?
আইবুড়ো বেটাছেলের বিয়ে দিতে নার॥"

আমাদের কোন আত্মীয়া আরও ভাল ভাল ছড়া সংগ্রহ করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। অতএব আশা করি আমরা সাধনার পাঠকগণকে তাহা উপহার দিতে সক্ষম হইব।

এইরূপে ছড়াকাটাকাটি, সঙ্গীত ও নৃত্যোৎসবে প্রায় সমস্ত রজনী অতিবাহিত হইলে পরদিন প্রাতঃকালে সকলে আপন আপন শস্যপূর্ণ শরা মাথায় করিয়া পুষ্করিণীতে বিসর্জ্জন করেন। বিসর্জ্জনের মন্ত্র এই—

"ভাঁজো! এই পথে যেও।
বেণাগাছে কড়ি আছে
দুধ কিনে খেও॥"

আবশ্যক অতীত হইয়া গেলে মানুষ উপকারী সুহৃদ্‌কে এইরূপ মিথ্যা প্রবঞ্চনায় ভুলাইয়া দিবার করিবার জন্য ব্যস্ত হয়। বেণাগাছে কড়ি নাই, তাহাতে দুধও মিলিবে না—কিন্তু ওটা বোধ করি ভদ্র করিয়া বলা, যে, এখন তুমি নিজের পথ নিজে দেখ, এবং দুধ খাইবার আবশ্যক বোধ কর ত কড়ির সন্ধান করগে।

ইন্দ্রপূজা উপলক্ষে হিন্দুকুলমহিলাগণের নৃত্যগীতপ্রসঙ্গে আরও কিছু বলা আবশ্যক। মহিলাগণের নৃত্য ও সঙ্গীতপ্রথা খাঁটি য়ুরোপীয় প্রথা বলিয়াই অনেকের ধারণা। কিন্তু নৃত্যগীতকলাভিজ্ঞা পতিব্রতা বেহুলার কথা বাঙ্গালার সর্ব্বত্র সুপরিচিত। কি মূল অবলম্বন করিয়া কবি কেতকাদাস ও ক্ষেমানন্দ "মনসার ভাসান" রচনা করিয়াছেন বলা যায় না, তবে এই গ্রন্থে সমস্ত উপকরণই খাঁটি বাঙ্গালি বলিয়া বোধ হয়। বঙ্গীয় সমাজের কোন বিরুদ্ধ কথা বেহুলার উপাখ্যানে স্থান পাইবার সম্ভাবনা নাই। বেহুলার বাল্য-ইতিহাস এইরূপ—

"চন্দ্রমুখী খঞ্জননয়নী কলাবতী।
অধর অরুণ জিনি বিদ্যুতের দ্যুতি॥
শ্রবণে কুণ্ডল তার খোঁপায় বকুল।
বেহুলার রূপেতে মোহিত অলিকুল॥
... ...
শিশুকাল হইতে রামা শিখে নৃত্য গীত।
সাধুসুতে জীয়াইবে দৈবের লিখিত॥
মা বাপের বাটীতে বেহুলা নাচে গায়।
বেহুলার গানেতে অমলা মোহ যায়॥"

স্ত্রীলোকের নৃত্যগীত সমাজবিগর্হিত একান্ত নিন্দনীয় প্রথা হইলে "সায়বেণে" কখনও স্বীয় দুহিতাকে তাহা শিক্ষা দিতে পারিতেন না; অথবা কবি একথা উল্লেখ করিতে নিশ্চয়ই কোন প্রকার সঙ্কোচ বোধ করিতেন। কিন্তু বেহুলা ভালরূপ নৃত্য করিতে পারিতেন বলিয়া কবি তাঁহাকে "বেহুলানাচনী" বলিয়া গ্রন্থের নানাস্থানে গৌরব সহকারে পরিচিত করিয়াছেন। ফলতঃ অদ্যাপি পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিমাঞ্চলে বিবাহাদি উৎসবের সময় কুলনারীগণ মঙ্গলসঙ্গীত গান করিয়া থাকেন। আমাদের দেশের "জলসওয়ার" কথা অনেকেই অবগত আছেন। আর সুসভ্য বঙ্গদেশের কোন কোন পল্লীতে আজও ইন্দ্রপূজা উপলক্ষে কুলকামিনীরা নৃত্যসুখ অনুভব করিয়া থাকেন। বরং ইংরাজি সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই সকল প্রথা ক্রমশঃ উঠিয়া যাইতেছে। বোধ হয় আর ৫০ বৎসরের মধ্যে ইন্দ্রপূজার অস্তিত্ব এদেশে একবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।

কৃষ্ণচরিত্র।

আমরা গত সংখ্যাক সাধনায় বঙ্কিমের কৃষ্ণচরিত্রের ঐতিহাসিকতা আলোচনা করিয়াছিলাম। বঙ্কিম প্রধানতঃ কৃষ্ণচরিত্রকেই উপলক্ষ্য করিয়া কেবল প্রসঙ্গক্রমে মহাভারতের ঐতিহাসিকতা বিচার করিয়াছেন; কিন্তু প্রথমে প্রমাণ ও বিচার প্রয়োগপূর্ব্বক প্রধানতঃ সমস্ত মহাভারতের ইতিহাস-অংশ বাহির করিলে পর, তবে কৃষ্ণচরিত্রের ঐতিহাসিকতা সন্তোষজনক রূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

উদাহরণস্বরূপে বলিতে পারি, দ্রৌপদীর পঞ্চপতিগ্রহণ প্রামাণিক সত্য কি না, সে বিষয়ে বঙ্কিম সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন; অতএব দেখা আবশ্যক, বঙ্কিম যাহাকে মূল মহাভারত বলিতেছেন তাহার সর্ব্বত্র হইতেই দ্রৌপদীর পঞ্চপতিগ্রহণ বর্জ্জন করা যায় কি না, এবং বঙ্কিম মহাভারতের যে যে অংশ হইতে কৃষ্ণচরিত্রের ইতিহাস সংকলন করিয়াছেন, সেই সেই অংশে দ্রৌপদীর পঞ্চপতিচর্য্যা অবিচ্ছেদ্য-ভাবে জড়িত নাই কি না। বঙ্কিম মহাভারতবর্ণিত যে সকল ঘটনাকে অনৈতিহাসিক মনে করেন সে সমস্ত যদি তিনি তাঁহার কল্পিত মূল মহাভারত হইতে প্রমাণ সহকারে দূর করিয়া দিতে পারেন, তবে আমরা তাঁহার নির্ব্বাচিত অংশকে বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাসরূপে গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে পারি। (কিন্তু মহাভারতের ঠিক কতটুকু মূল ঐতিহাসিক অংশ তাহা বঙ্কিম সুস্পষ্টরূপে নির্দ্দিষ্ট করেন নাই, তিনি কেবলমাত্র কৃষ্ণচরিত্রের ধারাটি অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন।) তিনি একস্থানে বলিয়াছেন—"আমিও বিশ্বাস করি না, যে, যজ্ঞের অগ্নি

হইতে দ্রুপদ কন্যা পাইয়াছিলেন, অথবা সেই কন্যার পাঁচটি স্বামী ছিল। তবে দ্রুপদের ঔরসকন্যা থাকা অসম্ভব নহে, এবং তাঁহার স্বয়ংবর বিবাহ হইয়াছিল, এবং সেই স্বয়ংবরে অর্জ্জুন লক্ষবেধ করিয়াছিলেন, ইহা অবিশ্বাস করিবারও কারণ নাই। তার পর, তাঁহার পাঁচস্বামী হইয়াছিল, কি এক স্বামী হইয়াছিল, সে কথার মীমাংসায় আমাদের কোন প্রয়োজন নাই।"

প্রয়োজন যথেষ্ট আছে। কারণ, বঙ্কিম মহাভারতকে ইতিহাস বলিয়া জ্ঞান করেন এবং সেই জন্যই মহাভারতবর্ণিত কৃষ্ণ-চরিত্রকে তিনি ঐতিহাসিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামীবিবাহ ব্যাপারটি তুচ্ছ নহে; কিন্তু, এত বড় ঘটনাটি যদি মিথ্যা হয়, এবং সেই মিথ্যা যদি বঙ্কিমের নির্ব্বাচিত মহা-ভারতেও স্থান পাইয়া থাকে তবে তদ্দ্বারা সেই মহাভারতের প্রামাণিকতা হ্রাস ও সেই মহাভারতবর্ণিত কৃষ্ণচরিত্রের ঐতি-হাসিকতা খর্ব্ব হইয়া আসে। সাক্ষী যখন একমাত্র, তখন তাহার সাক্ষ্যের কোন এক বিশেষ অংশ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে গেলে সাক্ষ্যের অপরাংশে মিথ্যাসংস্রব না থাকা আবশ্যক।

কিন্তু এত আয়োজন করিয়া অগ্রসর হইতে গেলে সম্ভবতঃ কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থখানি বাঙ্গালী পাঠকের অদৃষ্টে জুটিত না। সমুচিত পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া সমস্ত মহাভারতের সমূলক অংশ উদ্ধার করা এক জন লোকের জীবিতকালে সম্ভব কি না সন্দেহ। অত-এব, মহাভারতের বিস্তীর্ণ গহন অরণ্যের মধ্যে বঙ্কিম যে এক সঙ্কীর্ণ পথের সূচনা করিয়া দিয়াছেন তাহা আমাদের পক্ষে পরম সৌভাগ্যের কথা,—এবং অল্প বিস্ময়ের বিষয় নহে। আমাদের কেবল বক্তব্য এই, যে, তাঁহার কার্য্য পরিসমাপ্ত হয় নাই। বঙ্কি-মের প্রতিভা আমাদিগকে যেখানে উপনীত করিয়াছেন সেই-

খানেই যে আমাদিগকে সন্তুষ্টচিত্তে বসিয়া থাকিতে হইবে, তাহা নহে। তিনি আমাদিগকে অসন্তোষের উদাহরণ দেখাইয়া গিয়াছেন তাহাই আমাদিগকে অনুসরণ করিতে হইবে; সচেষ্টভাবে সত্যের রাজ্য বিস্তার করিতে হইবে। তিনি আমাদের হাতে মুক্তাটি দিয়া যান নাই, দৃষ্টান্ত সহকারে এই শিক্ষা দিয়াছেন যে, যদি মুক্তা চাও ত সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে হইবে। খুব সম্ভবতঃ আমরা নমস্কার করিয়া বলিব, আমাদের মুক্তায় কাজ নাই, আমরা সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে পারিব না।

বঙ্কিম, মেকলে কার্লাইল্ লামার্টিন্ থুকিদিদীস্ প্রভৃতি উদাহরণ দেখাইয়া মহাভারতকে কবিত্বময় ইতিহাস বলিতে চাহেন; আমরা মহাভারতকে ঐতিহাসিক কাব্য বলিয়া গণ্য করি। কিন্তু কৃষ্ণচরিত্রের আদর্শ আমরা ইতিহাস হইতে পাই, অথবা কাব্য হইতে পাই, অথবা কাব্য ইতিহাসের মিশ্রণ হইতে পাই তাহা লইয়া অধিক তর্ক করিতে চাহি না। ফলতঃ ইতিহাস যে বেদবাক্য তাহা নহে; সকলেই জানেন একটা উপস্থিত ঘটনাস্থলেও প্রকৃত বৃত্তান্ত প্রকৃতরূপে গ্রহণ করিতে এবং প্রকৃতরূপে বর্ণনা করিতে অতি অল্প লোকই পারে। খণ্ড খণ্ড বৃত্তান্ত হইতে একটি সমগ্র মানবচরিত্র ও ইতিহাস রচনা করা আরও অল্প লোকের সাধ্যায়ত্ত। সকলেই জানেন, আত্মীয় সম্বন্ধেও আত্মীয়ের ভ্রম হয় এবং বন্ধুকেও বন্ধু অনেক বিষয়ে বিপরীতভাবে বুঝিয়া থাকেন। অসাধারণ লোককে প্রকৃতভাবে জানা আরও কঠিন;—দূর হইতে এবং অতীত বৃত্তান্ত হইতে তাঁহার যথার্থ প্রতিকৃতি নির্ম্মাণ বহুল পরিমাণে কাল্পনিক তাহার আর সন্দেহ নাই। প্রমাণে এবং অনুমানে মিশ্রিত করিয়া একই লোকের এত বিভিন্ন প্রকার মূর্ত্তি গড়িয়া তোলা যায় যে তাহার মধ্যে কোন্‌টা মূলের অনুরূপ তাহা

প্রকৃতিভেদে ভিন্ন লোকে ভিন্ন ভাবে বিশ্বাস করেন। ইতিহাস-মাত্রই যে বহুল পরিমাণে লেখকের অনুমান ও পাঠকের বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে তাহাতে সন্দেহ নাই। এরূপ স্থলে কবির অনুমান ঐতিহাসিকের অনুমানের অপেক্ষা প্রকৃত ইতিহাসের অনেক কাছাকাছি যাওয়া কিছুই অসম্ভব নহে। ফষ্টার সাহেব ষ্ট্র্যাফোর্ডের যে জীবনী প্রকাশ করিয়াছেন, জনশ্রুতি এই যে, তাহা কবি ব্রাউনিংয়ের স্বরচিত বলিলেই হয়, কিন্তু উক্ত কবি অনতিকাল পরে ষ্ট্র্যাফোর্ড্ নামক যে নাটক লিখিয়াছেন, তাহা তাঁহার ইতিহাসের অপেক্ষা অধিকতর সত্য বলিয়া পরে প্রমাণিত হইয়াছে। সেইরূপ, পুরাকালে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধবৃত্তান্ত সম্বন্ধে যে সকল কিম্বদন্তি বিক্ষিপ্তভাবে প্রচলিত ছিল, মহাভারতের কবি কল্পনাবলে তাহাদের অসম্পূর্ণতা পূরণ করিয়া তাহাদিগকে যে একটি সমগ্র চিত্রে প্রতিফলিত করিয়া তুলিয়াছেন তাহা যে ঐতিহাসিকের ইতিহাস অপেক্ষা অল্প সত্য হইবেই এমন কোন কথা নাই।

তথ্য, যাহাকে ইংরাজিতে fact কহে, সত্য তদপেক্ষা অনেক ব্যাপক। এই তথ্যস্তূপ হইতে যুক্তি এবং কল্পনাবলে সত্যকে উদ্ধার করিয়া লইতে হয়। অনেক সময় ইতিহাসে শুষ্ক ইন্ধনের ন্যায় রাশীকৃত তথ্য পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু সত্য, কবির প্রতিভাবলে কাব্যেই উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। অতএব এত দীর্ঘকাল পরে মহাভারতের কবিবর্ণিত কৃষ্ণচরিত্রের ঐতিহাসিক প্রমাণ লইতে বসা আমরা দুঃসাধ্য এবং উদ্দেশ্যসিদ্ধির পক্ষে বাহুল্য বোধ করি।—সুবিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিৎ ফ্রুড্ সাহেব বলিয়াছেন—যথার্থ মহৎ ব্যক্তির অকৃত্রিম এবং স্বাভাবিক মহত্ত্ব গদ্যের আয়ত্তের বাহিরে; তাহা কেবলমাত্র কবির লেখনী দ্বারাই বর্ণনসাধ্য। ইহার কারণ. যাহাই হোক্, ফলতঃ ইহা সত্য। কবিতার এই

সঞ্জীবনীশক্তি আছে এবং গদ্যের তাহা নাই; এবং সেই কারণেই কবিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক।—

আমরা ফ্রুডের উপরিউক্ত কথার এই অর্থ বুঝি যে, মহৎ ব্যক্তির কার্য্যবিবরণ কেবল তথ্য মাত্র, তাঁহার মহত্ত্বটাই সত্য; সেই সত্যটি পাঠকের মনে উদিত করিয়া দিতে ঐতিহাসিকের গবেষণা অপেক্ষা কবি-প্রতিভার আবশ্যকতা অধিক।

সে হিসাবে দেখিতে গেলে মহাভারতের কবিবর্ণিত কৃষ্ণচরিত্রের প্রত্যেক তথ্যটি প্রকৃত না হইতে পারে; কৃষ্ণের মুখে যত কথা বসান হইয়াছে এবং তাঁহার প্রতি যত কার্য্যকলাপের আরোপ হইয়াছে তাহার প্রত্যেক ক্ষুদ্র বৃত্তান্তটি প্রামাণিক না হইতে পারে কিন্তু কৃষ্ণের যে মাহাত্ম্য তিনি পাঠকদের মনে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা মহামূল্য সত্য। কৃষ্ণের যদি ইতিহাস থাকিত তবে সম্ভবতঃ তাহাতে এমন সহস্র ঘটনা উল্লেখ থাকিত যাহা কৃষ্ণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত হইলেও তাহার কোন স্থায়ী মূল্য নাই অর্থাৎ সে সকল কাজ কৃষ্ণের কৃষ্ণত্ব প্রকাশ করে না—এমন কি, শেষ পর্য্যন্ত সকল কথা জানা সম্ভব নহে বলিয়া তাহার অনেকগুলি কৃষ্ণের যথার্থ স্বভাবের বিরোধী বলিয়াও মনে হইতে পারিত। প্রত্যেক মানুষে অনেক কাজে নিজের যথার্থ প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করিয়াও থাকে। মহাভারতের কৃষ্ণচরিত্রে নিশ্চয়ই সেই সকল অনাবশ্যক এবং আকস্মিক তথ্যগুলি বর্জ্জিত হইয়া কেবল প্রকৃত স্বরূপগত সত্যগুলি নির্ব্বাচিত হইয়াছে—এমন কি, কৃষ্ণ যে কথা বলেন নাই কিন্তু যে কথা কেবল কৃষ্ণই বলিতে পারিতেন, সেই কথা কৃষ্ণকে বলাইয়া, কৃষ্ণ যে কাজ করেন নাই কিন্তু যে কাজ কেবল কৃষ্ণই করিতে পারিতেন সেই কাজ কৃষ্ণকে করাইয়া কবি বাস্তবিক কৃষ্ণ অপেক্ষা তাঁহার কৃষ্ণকে অধিকতর সত্য করিয়া

তুলিয়াছেন। অর্থাৎ, বাস্তব-কৃষ্ণে স্বভাবতই অকৃষ্ণ যাহা ছিল তাহা দূরে রাখিয়া এবং বাস্তবকৃষ্ণ নিজের চরিত্রগুণে কবির মনে যে আদর্শের উদয় করিয়া দিয়াছেন পরন্তু নানা বাহ্য কারণে যাহা কার্য্যে সর্ব্বত্র ধারাবাহিক পরিস্ফুটভাবে ও নির্ব্বিরোধে প্রকাশ হইতে পারে নাই, সেই আদর্শকে সর্ব্বত্র পরিপূর্ণভাবে প্রস্ফুট করিয়া কবি বাস্তবিক ইতিহাস হইতে সত্যতম নিত্যতম কৃষ্ণকে উদ্ধার করিয়া লইয়াছেন।

অতএব, বঙ্কিম যখন কৃষ্ণচরিত্রের মাহাত্ম্য বাঙ্গালী পাঠকদিগের মনে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন তখন কবির কাব্য হইতে তাহা উদ্ধৃত করিয়া লওয়াই তাঁহার উপযুক্ত কার্য্য হইয়াছে। দুর্ভাগ্যক্রমে মহাভারত নানা কালের নানা লোকের রচনার মধ্যে চাপা পড়িয়াছে;—কবির মূল আদর্শটি বাহির করা সহজ ব্যাপার নহে। সমস্ত জঞ্জাল দূর করিতে পারিলে, কেবল কৃষ্ণ নহে, ভীষ্ম কর্ণ অর্জ্জুন দ্রৌপদী প্রভৃতি সকলেই উজ্জ্বলতর সম্পূর্ণতর আকারে আমাদের নিকট প্রকাশিত হইবেন। মহাভারতের আদি কবির মূল রচনাটি উদ্ধার করা হইলে মানবজাতির একটি পরমতম লাভ হইবে।

কিন্তু, মহাভারতের আদি কবির আদর্শ কৃষ্ণচরিত্র কিরূপ ছিল বঙ্কিম নিজের আদর্শ অনুসারে তাহা আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন কিনা তাহা নিঃসংশয়ে বলিবার পূর্ব্বে অষ্টাদশ পর্ব্ব পারাবার হইতে মূল মহাভারতটিকে মন্থন করিয়া লওয়া আবশ্যক। আপাততঃ কেবল একটি বিষয়ে পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি।

বঙ্কিম যাঁহাকে মহাভারতের প্রথম স্তরের কবি বলেন তিনি কৃষ্ণের ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস করিতেন না এ কথা বঙ্কিম স্বীকার করি-

য়াছেন; এমন কি, এই তথ্যটি তাঁহার মতে প্রথম স্তর নির্ণয় করিবার একটি প্রধান উপায়।

কিন্তু বঙ্কিম কৃষ্ণের ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস করিতেন। এই মহৎ প্রভেদবশতঃ মহাভারতগত প্রথম স্তরের কবির আদর্শ কৃষ্ণচরিত্র তাঁহার পক্ষে নির্ব্বাচন করিয়া লওয়া সহজ ছিল না। তিনি যে কৃষ্ণের অন্বেষণে নিযুক্ত ছিলেন সে কৃষ্ণ তাঁহার নিজের মনের আকাঙ্ক্ষাজাত। (সমস্ত চিত্তবৃত্তির সম্যক্ অনুশীলনে সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত একটি আদর্শ তিনি ব্যাকুল চিত্তে সন্ধান করিতেছিলেন,—তাঁহার ধর্ম্মতত্ত্বে যাহাকে তত্ত্বভাবে পাইয়াছিলেন ইতিহাসে তাহাকেই সজীব সশরীরীভাবে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য নিঃসন্দেহ তাঁহার নিরতিশয় আগ্রহ ছিল।) মনের সে অবস্থায় অন্য কোন কবির আদর্শকে অবিকলভাবে উদ্ধার করা মনুষ্যের পক্ষে সহজ নহে।

উত্তরে কেহ বলিতে পারেন, যে, বঙ্কিম যদিও কৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করিতেন তথাপি তিনি বারম্বার বলিয়াছেন, যে, ঈশ্বর যখন অবতাররূপে নরলোকে অবতীর্ণ হন তখন তিনি সম্পূর্ণ মানুষ ভাবেই প্রকাশ পাইতে থাকেন, কোন প্রকার অলৌকিক কাণ্ড দ্বারা আপনাকে দেবতা বলিয়া প্রচার করেন না। অতএব, বঙ্কিম, দেবতা কৃষ্ণকে নহে, মানুষ কৃষ্ণকেই মহাভারত হইতে আবিষ্কার করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন।

কিন্তু যে মানুষকে বঙ্কিম খুঁজিতেছিলেন তাহার কোথাও কোন অসম্পূর্ণতা নাই, তাহার সমস্ত চিত্তবৃত্তি সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপ্রাপ্ত। অর্থাৎ সে একটি মূর্ত্তিমান থিওরি। কিন্তু সম্ভবতঃ মহাভারতকারের কৃষ্ণ দেবতা নহেন, অনুশীলনপ্রাপ্ত চিত্তবৃত্তি নহেন, তিনি কৃষ্ণ।

মহাভারতকার এমন একটি মানুষের সৃষ্টি করেন নাই, যিনি মনুষ্য-আকারধারী তত্বকথা বা নীতিসূত্র মাত্র। সেই তাঁহার অত্যুচ্চ কবিপ্রতিভার পরিচায়ক। তিনি তাঁহার বড় বড় বীরদিগকেও অনেক সময় এমন সকল অযোগ্য কাজে প্রবৃত্ত করাইয়াছেন যাহা ছোট কবিদের সাহসে কুলাইত না। ছোট কবিদের সৃজনশক্তি নাই, নির্ম্মাণ শক্তি আছে; তাহারা যাহা গড়ে তাহা আদ্যোপান্ত নিয়ম অনুসারে গড়ে—কোথাও তাহার মধ্যে ব্যতিক্রম বা আত্মবিরোধ রাখিতে পারে না। প্রকৃত বড় জিনিষের অসম্পূর্ণতাও তাহার বড়ত্ব সূচনা করে;—প্রকৃতি একটা পর্ব্বতকে নিখুঁৎ মণ্ডলাকার করিবার আবশ্যক বোধ করে না—তাহার সমস্ত ভাঙ্গাচোরা তাহার সমস্ত অযত্ন অবহেলা লইয়াও সে অভ্রভেদী রাজগৌরবগর্ব্বিত। সে আপন অপূর্ণতাগুলি এমন অনায়াসে বহন করিতে পারে, যে, তাহার অপূর্ণতার দ্বারা তাহার প্রকাণ্ড সম্পূর্ণতার পরিমাপ হইয়া থাকে। ক্ষুদ্র বস্তুতে সামান্য অপূর্ণতা মারাত্মক—তাহার প্রতি দৃষ্টি এবং শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে হইলে তাহাকে নিখুঁৎ করাই আবশ্যক হইয়া পড়ে।

মহাভারতকার কবি যে একটি বীরসমাজ সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে একটি সুমহৎ সামঞ্জস্য আছে কিন্তু ক্ষুদ্র সুসঙ্গতি নাই। খুব সম্ভব, আধুনিক খ্যাত অখ্যাত অনেক আর্য্য বাঙ্গালী লেখকই সরলা বিমলা দামিনী যামিনী নামধেয়া এমন সকল সতীচরিত্রের সৃষ্টি করিতে পারেন যাঁহারা আদ্যোপান্ত সুসঙ্গত অপূর্ব্ব নৈতিকগুণে দ্রৌপদীকে পদে পদে পরাভূত করিতে পারেন, কিন্তু তথাপি, মহাভারতের দ্রৌপদী তাঁহার সমস্ত অপূর্ণতা অসঙ্কোচে বক্ষে বহন করিয়া এই সমস্ত নব্য বল্মীকরচিত ক্ষুদ্র

নীতিস্তূপগুলির বহু ঊর্দ্ধে উদার আদিম অপর্য্যাপ্ত প্রবল মাহাত্ম্যে নিত্যকাল বিরাজ করিতে থাকিবেন। মহাভারতের কর্ণ সভা-পর্ব্বে পাণ্ডবদের প্রতি যে সকল হীনতাচরণ করিয়াছেন আমাদের নাটক নভেলের দীনেশ রমেশ গণেশ ধনেশবর্গ কখনই তাহা করেন না, তাঁহারা সময়ে অসময়ে স্থানে অস্থানে অনায়াসেই আত্ম-বিসর্জ্জন করিয়া থাকেন, তথাপি মহাভারতের কবি বিনা চেষ্টায় কর্ণকে যে অমরলোকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছেন এই দীনেশ রমেশ গণেশ ধনেশবর্গ সমালোচকপ্রদত্ত সমস্ত ফার্ষ্টক্লাশ টিকিট এবং নৈতিক পাথেয় লইয়াও তাহার নিম্নতম সোপান পর্য্যন্ত পৌছিতে পারে কি না সন্দেহ।

সেই কারণেই বলিতেছিলাম, প্রথম স্তরের মহাভারতকার কবি যদি কৃষ্ণকে দেবতা বলিয়া মানিতেন না ইহা সত্য হয় তবে তিনি যে তাঁহাকে নীতিশিক্ষার অখণ্ড উদাহরণস্বরূপ গড়িয়াছিলেন ইহা আমাদের নিকট সম্ভবপর বোধ হয় না। বঙ্কিম মহাভারতের প্রথমস্তররচয়িতাকে শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া স্থির করিয়াছেন, এবং অনেক স্থলে সেই শ্রেষ্ঠত্বের দোহাই দিয়া তিনি কৃষ্ণ-চরিত্র হইতে সমস্ত অসঙ্গতি অসম্পূর্ণতা বাদ দিয়াছেন। কিন্তু আমরা বলিতেছি সেই শ্রেষ্ঠতার লক্ষণ যে সঙ্গতি তাহা নহে। এ পর্য্যন্ত হ্যাম্‌লেট্ চরিত্রের সঙ্গতি কেহ সন্তোষজনকরূপে আবিষ্কার করিতে পারে নাই, কিন্তু কাব্যজগতের মধ্যে হ্যাম্‌লেট্ যে একটি পরম স্বাভাবিক সৃষ্টি সে বিষয়ে কেহ সন্দেহ প্রকাশ করে নাই।

অতএব, বঙ্কিম মহাভারতের কৃষ্ণচরিত্র হইতে সমস্ত মন্দ অংশ বাদ দিয়া যে আদিম মহাভারতকারের আদর্শ কৃষ্ণকেই আবিষ্কার করিয়াছেন, সে বিষয়ে আমাদের সম্পূর্ণ সন্দেহ আছে।

এক্ষণে, কথা এই যে, মহাভারতকারের আদর্শ নাই হইল, বঙ্কিমের আদর্শ যদি যথার্থ মহৎ হয় তবে সেও বঙ্গীয় পাঠকদের পক্ষে পরম লাভ বলিতে হইবে।

বঙ্কিমের আদর্শ যে মহৎ এবং কৃষ্ণচরিত্র যে বঙ্গসাহিত্যের পরম লাভ সে বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নাই।

কিন্তু সেই জন্যই কৃষ্ণচরিত্র পাঠ করিতে সর্ব্বদাই মনে এই খেদ উপস্থিত হয়, যে, সাহিত্যে যে প্রণালীতে আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিতে হয় বঙ্কিম সে প্রণালী অবলম্বন করেন নাই।

ফ্রুড্ যে বলিয়াছেন, মহৎ লোকের মাহাত্ম্য ইতিহাস যথার্থরূপে প্রকাশ করিতে পারে না, কাব্য পারে, সে কথা সত্য। কারণ, মাহাত্ম্য পদার্থটি পাঠকের মনে অখণ্ডভাবে সজীবভাবে সঞ্চার করিয়া দিবার জিনিষ। তাহা তর্কদ্বারা যুক্তিদ্বারা ক্রমশঃ খণ্ড খণ্ড আকারে মনের মধ্যে কিয়দংশে প্রমাণিত হইতে পারে, কিন্তু তর্ক যুক্তি তাহাকে হৃদয়ের মধ্যে সর্ব্বাংশে সঞ্চারিত করিয়া দিতে পারে না।

বঙ্কিম, গ্রন্থের প্রারম্ভ হইতেই তরবারী হস্তে সংগ্রাম করিতে করিতে অগ্রসর হইয়াছেন;—কোথাও শান্তভাবে তাঁহার কৃষ্ণের সমগ্র মূর্ত্তি আমাদের সম্মুখে একত্র ধরিবার অবসর পান নাই।

সে জন্য তাঁহাকে দোষ দেওয়াও যায় না। কারণ, ভক্তসম্প্রদায়ের বাহিরে, এমন কি, ভিতরেও, কৃষ্ণচরিত্র যেরূপ কৃষ্ণবর্ণে চিত্রিত ছিল তাহাতে প্রথমতঃ সেই পূর্ব্বসংস্কার ঘুচাইবার জন্য তাঁহাকে বিপুল প্রয়াস পাইতে হইয়াছে। যেখানে তাঁহার দেবপ্রতিমা প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে সেখানকার জঙ্গল সাফ করিবার জন্য তাঁহাকে কুঠার ধারণ করিতে হইয়াছিল। কৃষ্ণসম্বন্ধে আমাদের সংস্কার এবং বিশ্বাসযোগ্য প্রকৃত কৃষ্ণ যে অনেক

বিভিন্ন, বঙ্কিমের কৃষ্ণচরিত্র হইতে তাহা আমরা শিক্ষা লাভ করিয়াছি।

কিন্তু বঙ্কিম এই গ্রন্থে অনাবশ্যক যে সকল কলহের অবতারণা করিয়াছেন আমাদের নিকট তাহা অত্যন্ত পীড়াজনক বোধ হইয়াছে। কারণ, যে আদর্শ হৃদয়ে স্থির রাখিয়া বঙ্কিম এই গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন, সেই আদর্শের দ্বারাই সমস্ত ভাষা এবং ভাব অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিলে তবেই সে আদর্শের মর্য্যাদা রক্ষা হয়। বঙ্কিম যদি তুচ্ছ বিরোধ এবং অনুদার সমালোচনার অবতারণা পূর্ব্বক চাঞ্চল্য প্রকাশ করেন তবে সেই চাঞ্চল্যে তাঁহার আদর্শের নিত্য নির্ব্বিকারতা দূর করিয়া ফেলে। অনেক ঝগড়া আছে যাহা সাপ্তাহিক পত্রের বাদ প্রতিবাদেই শোভা পায় যাহা কোন চিরস্মরণীয় বিষয়সম্বন্ধীয় চিরস্থায়ী গ্রন্থে স্থান পাইবার একেবারে অযোগ্য।

"পাশ্চাত্য মূর্খ" অর্থাৎ য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের প্রতি লেখক অজস্র অবজ্ঞা বর্ষণ করিয়াছেন। প্রথমতঃ সে কাজটাই গর্হিত, দ্বিতীয়তঃ এমন গ্রন্থে সেটা অত্যন্ত অশোভন হইয়াছে। মান্যজনের সমক্ষে অন্য কাহারও প্রতি অযথা দুর্ব্যবহার কেবল দুর্ব্যবহার মাত্র নহে তাহা মান্য ব্যক্তির প্রতিও অশিষ্টতা; বঙ্কিম যাঁহাকে মানবশ্রেষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান করেন, যিনি একাধারে ক্ষমা ও শৌর্য্যের আধার; যিনি সক্ষম হইয়াও অকারণে, এমন কি, সকারণে অস্ত্র ধারণ করিতে অনেক সময়েই বিরত হইয়াছেন; তাঁহারই চরিত্র প্রতিষ্ঠাস্থলে তাঁহারই আদর্শের সম্মুখে উপবিষ্ট হইয়া মতভেদ-উপলক্ষ্যে চপলতা প্রকাশ করা আদর্শের অবমাননা। কেবল য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের প্রতি নহে, সাধারণতঃ য়ুরোপীয় জাতির প্রতিই লেখক স্থানে অস্থানে

তীব্র বৈরিতা প্রকাশ করিয়াছেন। দুই একটা দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করি।—

শিশুপালের গালি "শুনিয়া ক্ষমাগুণের পরমাধার, পরম যোগী আদর্শ পুরুষ কোন উত্তর কবিলেন না। কৃষ্ণের এমন শক্তি ছিল, যে, তদ্দণ্ডেই তিনি শিশুপালকে বিনষ্ট করিতে সক্ষম—পরবর্ত্তী ঘটনায় পাঠক তাহা জানিবেন। কৃষ্ণও কথন যে এরূপ পরুষবচনে তিরস্কৃত হইয়াছিলেন এমন দেখা যায় না। তথাপি তিনি এ তিরস্কারে ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। ইউরোপীয়দের মত ডাকিয়া বলিলেন না, 'শিশুপাল! ক্ষমা বড় ধর্ম্ম, আমি তোমায় ক্ষমা করিলাম'। নীরবে শক্রকে ক্ষমা করিলেন।"—

শ্রীকৃষ্ণের ক্ষমাগুণের বর্ণনাস্থলে অকারণে য়ুরোপীয়দের প্রতি একটা অন্যায় খোঁচা দেওয়া যে কেবল অনাবশ্যক হইয়াছে তাহা নহে; ইহাতে মূল উদ্দেশ্যটি পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়াছে। পাঠকদের চিত্তকে যেরূপ ভাবে প্রস্তুত করিয়া তুলিলে তাহারা কৃষ্ণের ক্ষমা-শক্তির মাহাত্ম্য হৃদয়ে গ্রহণ করিতে পারিত তাহা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে। কৃষ্ণচরিত্রের ন্যায় গ্রন্থ কেবল আধুনিক হিন্দুদের জন্য লিখিত হওয়া উচিত নহে, তাহা সর্ব্বকালের সর্ব্বজাতির জন্যই রচিত হওয়া কর্ত্তব্য। পাঠকেরা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন এই অংশ পাঠকালে একজন য়ুরোপীয় পাঠকের মনে কিরূপ বিদ্রোহী ভাবের উদয় হওয়া সম্ভব। বিশেষতঃ, ক্ষমা করিবার সময় ক্ষমা-ধর্ম্মের মহিমাকীর্ত্তন, যে, য়ুরোপীয়দের জাতীয় প্রকৃতি এরূপ সাধারণ কথা লেখক কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন বলা কঠিন। আমাদের শাস্ত্রে এরূপ উদাহরণ ভূরি ভূরি আছে;—যখন বিশ্বা-মিত্র বসিষ্ঠের গাভী বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিলেন এবং নন্দিনী অতিশয় তাড়িত হইয়া আর্ত্তরবে বসিষ্ঠের সম্মুখে

উপস্থিত হইলেন তখন বসিষ্ঠ কহিলেন—"হে ভদ্রে নন্দিনি, তুমি পুনঃ পুনঃ রব করিতেছ, তাহা আমি শুনিতেছি; কিন্তু হে ভদ্রে, যখন রাজা বিশ্বামিত্র তোমাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিতেছেন তখন আমি কি করিব! যেহেতু আমি ক্ষমাশীল ব্রাহ্মণ!" পুনশ্চ নন্দিনী তাঁহার নিকট কাতরতা প্রকাশ করিলে তিনি কহিলেন "ক্ষত্রিয়ের বল তেজ এবং ব্রাহ্মণের বল ক্ষমা; অতএব আমি ক্ষমা-গুণে আকৃষ্ট হইতেছি।"

"ইন্দ্রিয়সুখাভিলাষী ব্যক্তিগণ মধ্যাবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকে; কিন্তু উহা দুঃখের আকর; রাজ্যলাভ বা বনবাস সুখের নিদান।"

শ্রীকৃষ্ণের এই মহদুক্তি উদ্ধৃত করিয়া বঙ্কিম বলিতেছেন "হিন্দু পুরাণেতিহাসে এমন কথা থাকিতে আমরা কি না, মেম সাহেব-দের লেখা নবেল পড়িয়া দিন কাটাই, না হয় সভা করিয়া পাঁচজনে জুটিয়া পাখির মত কিচিরমিচির করি।"

ক্ষণে ক্ষণে লেখকের এরূপ ধৈর্য্যচ্যুতি কৃষ্ণচরিত্রের ন্যায় গ্রন্থে অতিশয় অযোগ্য হইয়াছে। গ্রন্থের ভাষার ভাবে ও ভঙ্গীতে সর্ব্বত্রই একটি গাম্ভীর্য্য, সৌন্দর্য্য ও ঔদার্য্য রক্ষা না করাতে বর্ণনীয় আদর্শচরিত্রের উজ্জ্বলতা নষ্ট হইয়াছে।

বঙ্কিম সামান্য উপলক্ষ্যমাত্রেই য়ুরোপীয়দের সহিত, পাঠকদের সহিত এবং ভাগ্যহীন ভিন্নমতাবলম্বীদের সহিত কলহ করিয়াছেন। সেই কলহের ভাবটাই এ গ্রন্থে অসঙ্গত হইয়াছে; তাহা ছাড়া প্রসঙ্গক্রমে তিনি বিস্তর অবান্তর তর্কের উত্থাপন করিয়া পাঠকের মনকে অনর্থক বিক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছেন। প্রথমতঃ, যখন তিনি কৃষ্ণকে মনুষ্যশ্রেষ্ঠ বলিয়া দাঁড় করাইয়াছেন, তখন ঈশ্বরের অবতারত্ব সম্ভব কি না এ প্রশ্নের উত্থাপন করিয়া কেবল পাঠকের মনে একটা তর্ক উঠাইয়াছেন অথচ তাহার ভালরূপ

মীমাংসা করেন নাই। নিরাকার ঈশ্বর আকার ধারণ করিবেন কি করিয়া, এরূপ আপত্তি যাঁহারা করেন বঙ্কিম তাঁহাদিগকে এই উত্তর দিয়াছেন যে, যিনি সর্ব্বশক্তিমান তিনি আকার গ্রহণ করিতে পারেন না ইহা অসম্ভব।—যাঁহারা আপত্তি করেন যে, যিনি সর্ব্বশক্তিমান তাঁহার দেহ ধারণ করিবার প্রয়োজন কি? তিনি ত ইচ্ছামাত্রেই রাবণ কুম্ভকর্ণ অথবা কংস শিশুপাল বধ করিতে পারেন; তাঁহাদের কথার উত্তরে বঙ্কিম বলেন যে, রাবণ অথবা শিশুপাল বধ করিবার জন্যই, যে, ঈশ্বর দেহ ধারণ করেন তাহা নহে, মনুষ্যের নিকট মনুষ্যত্বের আদর্শ স্থাপন করাই তাঁহার অবতার হইবার উদ্দেশ্য। তিনি দেবতার ভাবে যদি দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন করেন তবে তাহাতে মানুষের কোন শিক্ষা হয় না—পরন্তু তিনি যদি মনুষ্য হইয়া দেখাইয়া দেন মনুষ্যের দ্বারা কতদূর সম্ভব তবেই তাহা আমাদের স্থায়ী কল্যাণের কারণ হয়।—এক্ষণে, তৃতীয় আপত্তি এই উঠিতে পারে যে, ঈশ্বর যদি সর্ব্বশক্তিমান হন্, এবং মনুষ্যের নিকট মনুষ্যত্বের আদর্শ স্থাপন করাই যদি তাঁহার অভিপ্রায় হয় তবে তিনি কি আদর্শ মনুষ্যকে অভিব্যক্ত করিয়া তুলিতে পারেন না—তাঁহার কি নিজেই মনুষ্য হইয়া আসা ছাড়া গত্যন্তর নাই? এইখানেই কি তাঁহার শক্তির সীমা?—বঙ্কিম এই আপত্তি উত্থাপনও করেন নাই, এই আপত্তির উত্তরও দেন নাই।

পরন্তু, সমস্ত গ্রন্থের উদ্দেশ্যের সহিত এই তর্কের কিঞ্চিৎ যোগ আছে। বঙ্কিম নানা স্থলেই স্বীকার করিয়াছেন, যে, মানুষের আদর্শ যেমন কার্য্যকারী এমন দেবতার আদর্শ নহে। কারণ, সর্ব্বশক্তিমানের অনুকরণে আমাদের সহজেই উৎসাহ না হইতে পারে। যাহা মানুষে সাধন করিয়াছে তাহা আমরাও সাধন

করিতে পারি এই বিশ্বাস এবং আশা অপেক্ষাকৃত সুলভ এবং স্বাভাবিক। অতএব কৃষ্ণকে দেবতা প্রমাণ করিতে গিয়া বঙ্কিম তাঁহার মানব আদর্শের মূল্য হ্রাস করিয়া দিতেছেন। কারণ, ঈশ্বরের পক্ষে সকলই যখন অনায়াসে সম্ভব তখন কৃষ্ণ-চরিত্রে বিশেষরূপে বিস্ময় অনুভব করিবার কোন কারণ দেখা যায় না।

বঙ্কিম এই গ্রন্থের অনেক স্থলেই যে সকল সামাজিক তর্ক উত্থাপন করিয়াছেন তাহাতে গ্রন্থের বিষয়টি বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে মাত্র, আর কোন ফল হয় নাই। "কৃষ্ণের বহুবিবাহ" শীর্ষক অধ্যায়ে, রুক্মিণী ব্যতীত কৃষ্ণের অন্য স্ত্রী ছিল না ইহাই প্রমাণ করিয়া লেখক সর্ব্বশেষে তর্ক তুলিয়াছেন যে, পুরুষের বহুবিবাহ সকল অবস্থাতেই অধর্ম্ম একথা ঠিক নহে। তিনি বলিয়াছেন "সচরাচর অকারণে পুরুষের একাধিক বিবাহ অধর্ম্ম। কিন্তু সকল অবস্থাতে নহে। যাহার পত্নী কুষ্ঠগ্রস্ত বা এরূপ রুগ্ন যে সে কোন মতেই সংসারধর্ম্মের সহায়তা করিতে পারে না, তাহার যে দারান্তর পরিগ্রহ পাপ, এমন কথা আমি বুঝিতে পারি না। যাহার স্ত্রী ধর্ম্মভ্রষ্টা কুলকলঙ্কিনী, সে যে কেন আদালতে না গিয়া দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিতে পারিবে না তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আসে না। * * যাহার উত্তরাধিকারীর প্রয়োজন, কিন্তু স্ত্রী বন্ধ্যা, সে যে কেন দারান্তর গ্রহণ করিবে না, তাহা বুঝিতে পারি না। * * যদি ইউরোপের এ কুশিক্ষা না হইত, তাহা হইলে, বোনাপার্টিকে জসেফাইনের বর্জ্জনরূপ অতি ঘোর নারকীপাতকে পতিত হইতে হইত না; অষ্টম হেন্‌রিকে কথায় কথায় পত্নীহত্যা করিতে হইত না। ইউরোপে আজি কালি সভ্যতার উজ্জ্বলালোকে এই কারণে অনেক পত্নীহত্যা, পতিহত্যা হইতেছে। আমাদের শিক্ষিত

সম্প্রদায়ের বিশ্বাস, যাহাই বিলাতী, তাহাই চমৎকার, পবিত্র, দোষশূন্য, ঊর্দ্ধাধঃ চতুর্দ্দশ পুরুষের উদ্ধারের কারণ। আমার বিশ্বাস, আমরা যেমন বিলাতের কাছে অনেক শিখিতে পারি, বিলাতও আমাদের কাছে অনেক শিখিতে পারে। তাহার মধ্যে এই বিবাহতত্ত্ব একটা কথা।"

কৃষ্ণ যখন একাধিক বিবাহ করেন নাই তখন বিবাহ সম্বন্ধীয় এই তর্ক নিতান্তই অনাবশ্যক; তাহা ছাড়া তর্কটারই বা কি মীমাংসা হইল? প্রথম স্থির হইল যাহার স্ত্রী রুগ্ন, অথবা ভ্রষ্টা অথবা বন্ধ্যা সে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে পারে; - কিন্তু য়ুরোপে রুগ্না, ভ্রষ্টা এবং বন্ধ্যার স্বামী সহজে দারান্তর পরিগ্রহ করিতে পারে না বলিয়াই যে, সেখানকার সভ্যতার উজ্জ্বলালোকে এত পত্নীহত্যা হইতেছে তাহা নহে; অনেক সময় পত্নীর প্রতি বিরাগ ও অন্যার প্রতি অনুরাগবশতঃ হত্যা-ঘটনা অধিকতর সম্ভবপর। (যদি সে হত্যা নিবারণ করিতে হয় তবে অন্য স্ত্রীর প্রতি অনুরাগ সঞ্চারকেও দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণের ধর্ম্মসঙ্গত বিধান বলিয়া স্থির করিতে হয়।) তাহা হইলে "সচরাচর অকারণে পুরুষের একাধিক বিবাহ অধর্ম্ম" এ কথাটার এই তাৎপর্য্য দাঁড়ায় যে, যখন দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করিতে যাইবে তখন যেন একটা কোন কারণ থাকে; কাজটা যেন অকারণে না হয়। অর্থাৎ যদি তোমার স্ত্রী রুগ্ন অক্ষম হয় তবে তুমি বিবাহ করিতে পার, অথবা যদি অন্য স্ত্রী বিবাহ করিতে তোমার ইচ্ছা বোধ হয় তাহা হইলেও তুমি বিবাহ করিতে পার; কারণ, সেইরূপ ইচ্ছার বাধা পাইয়া ইংলণ্ডের অষ্টম হেন্‌রি পত্নীহত্যা করিয়াছিলেন। কিন্তু কোন কারণ না থাকিলে বিবাহ করিয়ো না। জিজ্ঞাস্য এই যে, স্বামীকে যে যুক্তি অনু-সারে যে সকল স্বাধীন ক্ষমতার অধিকারী করা হইল, ঠিক সেই

যুক্তি অনুসারে অনুরূপ স্থলে স্ত্রীর প্রতি অনুরূপ ক্ষমতা অর্পণ করা যায় কি না? এবং আমাদের সমাজে স্ত্রীর সেই সকল স্বাধীন ক্ষমতা না থাকাতে অনেক স্ত্রী "অতি ঘোর নারকী পাতকে পতিত" হয় কি না?

ইহার অনতিপরেই সুভদ্রাহরণ কার্য্যটা যে বিশেষ দোষের হয় নাই ইহাই প্রতিপন্ন করিতে গিয়া লেখক, "মালাবারী" নামক এক পার্সী—সম্ভবতঃ যাঁহার খ্যাতিপুষ্প বর্ত্তমান কালের গুটি-কয়েক সংবাদপত্রপুটের মধ্যেই কাটের দ্বারা জীর্ণ হইতে থাকিবে—তাঁহার প্রতি একটা খোঁচা দিয়া আর একটা সামাজিক তর্ক তুলিয়াছেন। সে তর্কটারও মীমাংসা কিছুমাত্র সন্তোষজনক হয় নাই, অথচ লেখক অধীর ভাবে অসহিষ্ণু ভাষায় অনেকের সঙ্গে অনর্থক একটা কলহ করিয়াছেন।

বঙ্কিম যদি কৃষ্ণকে দেবতা না মনে করিতেন এবং কৃষ্ণের সমস্ত চিত্তবৃত্তির সর্ব্বাঙ্গীন উৎকর্ষ সম্বন্ধে তাঁহার কোনরূপ থিওরি না থাকিত তাহা হইলে এ সমস্ত তর্কবিতর্কের কোন প্রয়োজন থাকিত না, এবং তিনি সর্ব্বত্র সংযম রক্ষা করিয়া চলিতে পারিতেন। তাহা হইলে তিনি নিরপেক্ষ নির্ব্বিকারচিত্তে মহাভারত-কার কবির আদর্শ কৃষ্ণকে অবিকলভাবে উদ্ধার করিয়া পাঠকদের সম্মুখে উপনীত করিতেন—এবং পাছে কোন অবিশ্বাসী সংশয়ী পাঠক তাঁহার কৃষ্ণচরিত্রের কোন অংশে তিলমাত্র অসম্পূর্ণতা দেখিতে পায় এ জন্য আগেভাগে তাহাদের প্রতি রোষ প্রকাশ করিয়া তাঁহার গ্রন্থ হইতে উচ্চ সাহিত্যের লক্ষণগত অচঞ্চল শান্তি দূর করিয়া দিতেন না।

যেমন প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চের উপরে নেপথ্যবিধান করিতে আরম্ভ করিলে অভিনয়ের রসভঙ্গ হয়, কাব্যসৌন্দর্য্য সমগ্রভাবে শ্রোতৃ-

বর্গের মনের মধ্যে মুদ্রিত হয় না, সেইরূপ বঙ্কিমের কৃষ্ণচরিত্রে পদে পদে তর্ক যুক্তি বিচার উপস্থিত হইয়া আসল কৃষ্ণচরিত্রটিকে পাঠকের হৃদয়ে অখণ্ডভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে বাধা দিয়াছে। কিন্তু বঙ্কিম বলিতে পারেন, কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থটি ষ্টেজ্ নহে; উহা নেপথ্য; ষ্টেজ্ম্যানেজর আমি নানা বাধা বিঘ্নের সহিত সংগ্রাম করিয়া, নানা স্থান হইতে নানা সাজসজ্জা আনয়নপূর্ব্বক কৃষ্ণকে নরোত্তমবেশে সাজাইয়া দিলাম—এখন কোন কবি আসিয়া যবনিকা উত্তোলন করিয়া দিন; অভিনয় আরম্ভ করুন; সর্ব্বসাধারণের মনোহরণ করিতে থাকুন; তাঁহাকে শ্রমসাধ্য চিন্তাসাধ্য বিচারসাধ্য কাজ কিছুই করিতে হইবে না।

দেবোত্তর বিষয়ে পূর্ব্বের আলোচনা।

গবর্ণমেণ্ট আমাদের দেবোত্তর বিষয়ে সম্প্রতি কোন নূতন বিধি ব্যবস্থা করিতে যে অসম্মত হইয়াছেন, তাহার যথেষ্ট কারণ আছে। ঐ বিষয়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব-ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে সেই কারণ জানিতে পারা যায়।

যখন মোহান্ত মহারাজদিগের দুর্ব্ব্যবহারে হিন্দুমণ্ডলী প্রপীড়িত, তখন মুসলমানদিগের সমাজেও নানা দুর্দ্দশার লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছিল। কলিকাতার সেণ্ট্রল নেশনল মেহমেডন এসোসিয়েসন নামক সভা ১৮৮২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সেই সকল দুরবস্থা বিমোচনার্থ গবর্ণমেণ্টের নিকট এই আবেদন করেন যে, তাঁহাদের যে ওকফ্ অর্থাৎ ধর্ম্মসংক্রান্ত সম্পত্তি আছে, তাহা দ্বারা মুসলমানদিগের সুশিক্ষার বিধান করা হয়। তখন এমন ভাব ব্যক্ত

হইয়াছিল যে, ইংরাজী ভাষাতেই শিক্ষা প্রদত্ত হইবে। তাহা কর্ত্তব্য কি না, এই বিষয়ের তথ্য অবধারণ নিমিত্ত ১৮৮৫ সালের ১৫ জুলাই ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট এক প্রস্তাব করেন যে, মুসলমানদিগের মধ্যে যাঁহারা ধর্ম্মজ্ঞ, আইনজ্ঞ ও মর্য্যাদাবান্, এমন কতকগুলিন লোকের দ্বারা এক কমিটি গঠিত হউক। যথাকালে এই কমিটির কার্য্য আরম্ভ হইলে সমুদায় মুসলমানমণ্ডলী একপ্রকার ক্ষেপিয়া উঠে। কমিটি কেবল বঙ্গদেশে স্থাপিত হইয়াছিল। উত্তরপশ্চিম ও পঞ্জাব অঞ্চলের মহম্মদীয় লোকেরা তাঁহাদের কোন কথা শুনিতে চাহেন নাই; তাঁহাদের কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে সম্মত হন নাই। ক্রমে গোলযোগ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তাহাতে গবর্ণর জেনেরল লর্ড ডফরিণ বাহাদুর সাধারণের নিকট জবাবদিহিতে পড়িয়াছিলেন। তদবধি বিজ্ঞাপিত হইল যে, ১৮৬৩ সালের ২০ আইনে গবর্ণমেণ্ট যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা আর নড়াচড়া করা হইবে না। এই কথা প্রচারিত হইলে সে গোলযোগ মিটিয়া যায়।

এমন অবস্থায় পুনরায় সেই বিষয়ে নূতন আইনের প্রার্থনা করিলে, তাহা যে বিফল হইবে, তাহা নিশ্চিত কথা। বর্ত্তমান প্রস্তাবনায় গবর্ণমেণ্ট লর্ড ডফরিণের সেই সময়কার বাক্যাবলী স্মরণ করিয়া বলিয়াছেন, ক্ষান্ত হও, আর কেন? ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, দেবোত্তর সম্পত্তি সম্বন্ধে ১৮৬৩ সালের আইন চূড়ান্ত আইন।

তথাপি যখন অভাবের পূরণ হয় নাই, তখন গোলযোগের নিবৃত্তি হইবার নহে। পূর্ব্ব-কথিত অভিনয়ের সময়ে মুসলমান কুল-তিলক সুপ্রসিদ্ধ অনরেবল সর্ সৈয়দ্ আহমদ্ খাঁ বাহাদুর কে সি এস্ আই, এল্ এল্ ডি, মহোদয় রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া সকল পক্ষকে সমুচিতরূপে প্রবোধিত করিয়াছিলেন। তিনি দেখাইয়া-

ছিলেন যে, ওক্‌ফ্‌ সম্পত্তি কেবল ধর্ম্মসাধনের উদ্দেশে ব্যয়িত হয় বটে; কিন্তু কোন কোন স্থানে ঐ সম্পত্তি দুইটী নির্দ্দিষ্ট বিভাগে নিয়োজিত হইয়া থাকে। এক মস্‌জিদের কার্য্যবিভাগ; দ্বিতীয়, শিক্ষাবিভাগ। খাঁ বাহাদুর বুঝাইয়া দিলেন যে, সম্প্রতি যদি উক্ত ওক্‌ফ্‌ সম্পত্তি অধিক পরিমাণে শিক্ষা বিধানার্থ ব্যয়িত হয়, তাহা এমন ভাবে হউক, যাহাতে সেই শিক্ষা ধর্ম্মসাধনের অঙ্গীভূত হয়, সেই ব্যবস্থা করিলেই আর কোন ক্ষোভের কারণ থাকে না। অর্থাৎ ওকৃফ সম্পত্তি দ্বারা যে শিক্ষা প্রদত্ত হইবে, তাহা ইংরাজী বাঙ্গালা বা তাদৃশ কোন দেশীয় ভাষায় হইবে না; তদ্দ্বারা নিরীশ্বর শিক্ষাবিধানও হইবে না; হদিস্‌ (মহাজন বাক্য) কেফা (নমাজাদির মন্ত্র) এবং তপ্‌সির (ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যা) প্রভৃতি যে সকল গ্রন্থের অধ্যয়নে ধর্ম্মের শিক্ষা হয়, তাহাই অধীত হইবে।

অনরেবল খাঁ বাহাদুর উক্ত প্রকারে মুসলমানদিগের হিত বুঝাইয়া দিয়া সকল লোককে যাহা করিতে বলিয়াছিলেন, গত পৌষমাসের সাধনায় আমরা হিন্দুদিগকে তাহারই অনুষ্ঠান করিতে বলিয়াছিলাম।

উক্ত বাহাদুর সপ্রেম অন্তঃকরণে অতি হৃদয়গ্রাহী ভাষায় সকল মতওল্লীদিগকে (দেবোদ্দিষ্ট বিষয়ের ট্রষ্টী বা দেবোত্তরধারী) এবং সাধারণতঃ সকল ব্যক্তিকে বলিয়াছিলেন, ওকৃফ্‌ সম্পত্তি কি প্রকার অবস্থায় আছে এবং তদ্দ্বারা কিরূপ কার্য্য হইতেছে, তত্তাবৎ বিষয় প্রকাশ করিয়া বলুন; এজন্য সমুদায় মুসলমানমণ্ডলী সহরে ও মফঃস্বলে এক যোগে কার্য্য করিতে থাকুন; কোন শঙ্কা নাই; কোন অনিষ্ট হইবে না; যখন মহম্মদীয় লোকদিগের দুরবস্থা বিমোচনার্থ এই চেষ্টা হইতেছে, তখন কোন অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা নাই, প্রত্যুত প্রভূত মঙ্গল লাভের আশা আছে।

আমরা মহম্মদীয়দিগের সামাজিক বিবরণ বিশেষ অবগত নহি। পূর্ব্ববারে সাধনাতে দেবোত্তর বিষয়ে যাহা লিখিত হইয়াছিল, তাহার ফলস্বরূপ উপরোক্ত কয়েকটী তথ্য জানিতে পারিলাম। অতঃপর আরো জানিতে পারিব। আশা করা যায়, এই বিষয়টী সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিলে হিন্দুসমাজেরও প্রচ্ছন্ন গ্লানি প্রকাশিত হইয়া তাহা তৎক্ষণাৎ বা কিছু বিলম্বে বিদূরিত হইতে পারে।

উপরি উপরি দেখিলে হিন্দু ও মুসলমান সমাজে আপাততঃ অত্যন্ত প্রভেদ লক্ষিত হয়। কিন্তু বস্তুতঃ তাহাদের মধ্যে ঐক্য-স্থলও অনেক আছে। মূলে উভয় সম্প্রদায়ই একেশ্বরবাদী। এক-মেবাদ্বিতীয়ং উভয়েরই মূলমন্ত্র। ক্রিয়াকলাপের পদ্ধতিতে বহুল ভিন্ন ভাব দাঁড়াইয়াছে বটে, কিন্তু তন্মধ্যে একতা নাই, এমনও বলা যায় না।

দেবোদ্দিষ্ট সম্পত্তি সম্বন্ধে হিন্দু মুসলমানের একদশা উপস্থিত। এক আইনে উভয়েরই শাসন হইতেছে ও হইবে। অতএব উভয় সম্প্রদায়ের দেবসেবার ভাব ও অভাব একত্র পর্য্যালোচনা করা যাইতে পারে। তাহাতে যথেষ্ট ফলও আছে।

জমিদারী কাগজে হিন্দুদিগের দেবোত্তর ও মুসলমানদিগের পীরোত্তর এক পর্য্যায়ভুক্ত। উক্ত লক্ষণাক্রান্ত সম্পত্তিকে মুসলমান শাস্ত্রে ওকৃফ্ বলে। (তাহা বহুবচনে ওয়াকফ্ হয়। উচ্চারণের সুবিধার নিমিত্ত আমরা শেষোক্ত বহুবচনান্তপদ ব্যবহার করিব।)

হিন্দুদিগের দেবতা ও মুসলমানদিগের পীর পয়গম্বরাদি দৈব পুরুষ প্রায় তুল্যমূল্য। * হিন্দু দেবমন্দিরে এবং মুসলমান মসজিদে প্রভেদ এই যে, হিন্দুগণ দেবতার প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া নানা

---

* মুসলমান ভ্রাতারা ক্ষমা করিবেন,—আমরা তাঁহাদের ধর্ম্ম সম্পর্কে যে দেব শব্দ প্রয়োগ করি, তাহা তাঁহাদের পীর ও পয়গম্বর বাচক।

উপচারে তাহার অবলম্বনে ঈশ্বরের পূজা করেন; মুসলমানেরা নিরবলম্ব হইয়া নিরাকার ঈশ্বরের আরাধনা করেন। এতদ্ব্যতীত সাধু-সজ্জনগণের এবং দীনান্ধবধিরাদি লোকের ভক্ষ্য পেয়াদি বিতরণ ব্যাপার প্রায় সমান। হিন্দুর বিরাগী ও সন্ন্যাসী এবং মুসলমানদিগের ফকীর ও দরবেশ প্রায় একইভাবে গৃহস্থের সেবা প্রাপ্ত হয়েন। মুসলমানদিগের ব্যয়াতিরিক্ত ধন থাকিলে দীনদরিদ্রের প্রতি জাকাথ্ দিবার নিয়ম আছে। হিন্দুদিগকেও বলা আছে, ইহজন্মে দান না করিলে পরজন্মে কেহ কিছু পাইবেন না। হিন্দুদিগের দান-ধর্ম্মের নানা প্রকার শাস্ত্রীয় বিধান থাকাতে গৃহে গৃহে, পল্লীতে পল্লীতে, গ্রামে গ্রামে বাস্তু-দেবতার ও গ্রাম্য দেবতার এক বা অধিক দেবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বৃহত্তর তীর্থের দেবমন্দির অগণ্য। এই সকল মন্দিরে প্রতিদিন দুই হইতে দুই শত বা ততোধিক অভ্যাগত সাধু সজ্জন ও দুঃখী লোক ভোজ্যান্ন প্রাপ্ত হয়েন। বড় বড় তীর্থ-দেবতার প্রসাদ-প্রার্থীর সংখ্যা থাকে না। উৎসবকালে তাহা আরো অধিক হয়। এ স্থলে হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের ধর্ম্মকর্ম্মের ঐক্য আছে। মুসলমানদিগের মসজিদেও উক্ত রূপে সাধু ও অতিথির সেবা হয়। রোজাবসানে প্রতিদিন শত শত লোক এক এক মসজিদে এফ্‌তার (পারণা) পাইয়া থাকে। হিন্দু মন্দিরের ন্যায় মুসলমান মসজিদেও সন্ধ্যাকালে দীপদান ও বাদ্যোদ্যম হয়। উভয় স্থলেই সন্ধ্যাকালে ঈশ্বরারাধনা হয়। মহম্মদীয় এক বিশেষ বিধান, সন্ধ্যা ও প্রাতঃকালের আজান। এই সকল দৈব কর্ম্মে অর্থের প্রয়োজন থাকে।

উক্তরূপ দৈব কর্ম্মের নির্ব্বাহ পক্ষে মহম্মদীয় সম্রাট্ সুলতানের দায়ীত্ব আছে। তজ্জন্য সুলতান্‌কে আমীরল্ মমীন (ধর্ম্মপাল) কহা যায়। কিন্তু ফলে, এদেশে সাধারণের ধর্ম্ম কর্ম্ম সাধারণেই নির্ব্বাহ

করিয়া থাকে। লোকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া দান দেয়। জ্যকাথের নিয়মে কিছু অর্থ ধনীলোকদিগকে বাধ্য হইয়া দিতে হয়। উত্তরাধিকারীবিহীন হইলে ধনবান লোকের সম্পত্তি "বৈতুল মাল" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া রাজকোষে যায়। তাহাও আবার উক্ত দৈব কর্ম্মার্থে ফিরিয়া আইসে। এবম্প্রকারে ওয়াকফ্ ভাণ্ডার পরিপুষ্ট হইয়া থাকে।

এই ওকৃফ্ বা ওয়াকফ্ সম্পত্তি যাহার হস্তে থাকে, তাহাকে মতওল্লী কহা যায়। তিনি উক্ত সম্পত্তির ট্রষ্টী স্বরূপ। ব্যবস্থা মতে তিনি কেবল উক্ত দানভাণ্ডারের ভাণ্ডারী অর্থাৎ কর্ম্ম নির্ব্বাহের মালিক। কিন্তু ফলে তিনি সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া থাকেন। তেমন অধিকার না পাইলেও নয়। যিনি সৎ ও সাধু উদ্দেশে, ধর্ম্মের জন্ম, সম্পত্তি রক্ষা ও তত্ত্বাবধান কর্ম্মের কষ্ট স্বীকার করিবেন, তিনি শত শত লোকের ধর্ম্মতঃ সেবাকারী হইলেও নিতান্ত পরাধীন হইয়া চলিতে পারিবেন কেন?

পরন্তু কালক্রমে এই সকল মতওল্লী, আমাদের দেবোত্তরধারী ব্যক্তিগণের ন্যায় নিরঙ্কুশ হইয়া কার্য্য করিতে করিতে নানা গোলযোগ বাধাইয়া বসেন। যে ধনের সম্বন্ধে বিধি-নিষেধ-বিচারকারী কেহ নাই, এমন ধন পাইলে তাহার অধিপতি কেনই বা যথেচ্ছাচারী না হইবেন? তাহাতেই আমাদের দেবোত্তর সম্পত্তির ন্যায় মুসলমানদিগের পীরোত্তরাদি সম্পত্তিও জমিদারী-কাগজ-নির্দ্দিষ্ট ব্যবহারের নানাবিধ ব্যভিচার দৃশ্যমান হইয়া পড়িতেছে। তাহাতে উক্ত ধর্ম্মার্থ-দানের বিতরণকর্ত্তা ও গৃহীতা উভয়েই সমাজকে কলুষিত করিয়া ফেলিতেছেন।

পূর্ব্বোক্ত আলোচনার পর কয়েক বৎসর গত হইয়াছে। যাহাতে মুসলমান মতওল্লীগণ লোভ ও স্বার্থপরতাদি দোষে জড়িত হইয়া

ধর্ম্মার্থ-দান-সম্পত্তি অপব্যবহার করিতে না পারেন,—অতঃপর যাহাতে তাহার যথোপযুক্ত সার্থকতা সাধন হয়, তজ্জন্য মুসলমান সমাজ এখন আর কি চেষ্টা করিতেছেন, তাহা আমরা ঠিক বলিতে পারি না।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, মুসলমান সমাজের গতি ও ক্রিয়া আমরা অল্পই অবগত আছি। উপরে যাহা বলিলাম, তাহাতে বিস্তর ত্রুটি রহিল। কোন কোন স্থলে অনুচিত আখ্যানজনিত অপরাধ থাকিতেও পারে। কিন্তু সাহস হয়, মহম্মদীয় ভ্রাতৃগণ যদি হিন্দুদিগের সহিত সখ্য বন্ধন করেন, তাহা হইলে পরস্পরের অবস্থা ও অভাব পরস্পরের বিদিত হইলে অধিকতর শ্রেয়োলাভের সম্ভাবনা হয়। এক রাজার প্রজা—একই আইনে যাহাদের শাসন হয়—তাহাদের একতাই সর্ব্বোপরি ফলপ্রদ।

মহামান্য সর্ব্বগুণালঙ্কৃত অতি প্রবীণ সর্ সৈয়দ বাহাদুর যাহা মুসলমানদিগের প্রতি বলিয়াছেন, সেই উক্তি আমাদের প্রতিও বর্ত্তায়। ভ্রাতৃগণ! পরস্পরের কাছে আপনাদের অবস্থা ও অভাবের কথা খুলিয়া বল; পরস্পর সাহায্য করিতে উদ্যুক্ত হও; সদ্ভাবে কার্য্য কর; সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলের পথ প্রাপ্ত হইবে।

কৌতুকহাস্যের মাত্রা।

সেদিনকার ডায়ারিতে কৌতুকহাস্য সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা পাঠ করিয়া শ্রীমতী দীপ্তি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, -"একদিন প্রাতঃকালে স্রোতস্বিনীতে আমাতে মিলিয়া হাসিয়াছিলাম। ধন্য সেই প্রাতঃকাল এবং ধন্য দুই সখীর হাস্য! জগৎ সৃষ্টি অবধি

এমন চাপল্য অনেক রমণীই প্রকাশ করিয়াছে—এবং ইতিহাসে তাহার ফলাফল ভালমন্দ নানা আকারে স্থায়ী হইয়াছে। নারীর হাসি অকারণ হইতে পারে কিন্তু তাহা অনেক মন্দাক্রান্তা উপেন্দ্রবজ্রা, এমন কি, শার্দ্দূলবিক্রীড়িতচ্ছন্দ, অনেক ত্রিপদী, চতুষ্পদী এবং চতুর্দ্দশপদীর আদিকারণ হইয়াছে, এইরূপ শুনা যায়। রমণী তরল স্বভাব বশতঃ অনর্থক হাসে, মাঝের হইতে তাহা দেখিয়া অনেক পুরুষ অনর্থক কাঁদে, অনেক পুরুষ ছন্দ মিলাইতে বসে, অনেক পুরুষ গলায় দড়ি দিয়া মরে -আবার এইবার দেখিলাম নারীর হাস্যে প্রবীণ ফিলজফরের মাথায় নবীন ফিলজফি বিকশিত হইয়া উঠে! কিন্তু সত্য কথা বলিতেছি, তত্ত্ব নির্ণয় অপেক্ষা পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকারের অবস্থাটা আমরা পছন্দ করি।"

এই বলিয়া সেদিন আমরা হাস্য সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলাম শ্রীমতী দীপ্তি তাহাকে যুক্তিহীন অপ্রামাণ্য বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন।

আমার প্রথম কথা এই যে, আমাদের সেদিনকার তত্ত্বের মধ্যে, যে, যুক্তির প্রাবল্য ছিল না সে জন্য শ্রীমতী দীপ্তির রাগ করা উচিত হয় না। কারণ নারীহাস্যে পৃথিবীতে যত প্রকার অনর্থপাত করে তাহার মধ্যে বুদ্ধিমানের বুদ্ধিভ্রংশও একটি। যে অবস্থায় আমাদের ফিলজফি প্রলাপ হইয়া উঠিয়াছিল সে অবস্থায় নিশ্চয়ই মনে করিলেই কবিতা লিখিতেও পারিতাম, এবং গলায় দড়ি দেওয়াও অসম্ভব হইত না।

দ্বিতীয় কথা এই যে, তাঁহাদের হাস্য হইতে আমরা তত্ত্ব বাহির করিব এ কথা তাঁহারা যেমন কল্পনা করেন নাই, আমাদের তত্ত্ব হইতে তাঁহারা যে যুক্তি বাহির করিতে বসিবেন তাহাও আমরা কল্পনা করি নাই।

নিউটন আজন্ম সত্যান্বেষণের পর বলিয়াছেন আমি জ্ঞানসমুদ্রের কূলে কেবল নুড়ি কুড়াইয়াছি; আমরা চার বুদ্ধিমানে ক্ষণকালের কথোপকথনে নুড়ি কুড়াইবার ভরসাও রাখি না— আমরা বালির ঘর বাঁধি মাত্র। ঐ খেলাটার উপলক্ষ্য করিয়া জ্ঞানসমুদ্র হইতে খানিকটা সমুদ্রের হাওয়া খাইয়া আসা আমাদের উদ্দেশ্য। রত্ন লইয়া আসি না, খানিকটা স্বাস্থ্য লইয়া আসি, তাহার পর সে বালির ঘর ভাঙ্গে কি থাকে তাহাতে কাহারও কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই।

রত্ন অপেক্ষা স্বাস্থ্য যে কম বহুমূল্য আমি তাহা মনে করি না। রত্ন অনেক সময় ঝুঁটা প্রমাণ হয়, কিন্তু স্বাস্থ্যকে স্বাস্থ্য ছাড়া আর কিছু বলিবার যো নাই। আমরা পাঞ্চভৌতিক সভার পাঁচ ভূতে মিলিয়া এপর্য্যন্ত একটা কানাকড়ি দামের সিদ্ধান্তও সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি কি না সন্দেহ, কিন্তু, তবু যতবার আমাদের সভা বসিয়াছে আমরা শূন্য হস্তে ফিরিয়া আসিলেও আমাদের সমস্ত মনের মধ্যে যে সবেগে রক্ত সঞ্চালন হইয়াছে, এবং সে জন্য আনন্দ এবং আরোগ্য লাভ করিয়াছি তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

গড়ের মাঠে এক ছটাক শস্য জন্মে না, তবু অতটা জমি অনাবশ্যক নহে। আমাদের পাঞ্চভৌতিক সভাও আমাদের পাঁচজনের গড়ের মাঠ, এখানে সত্যের শস্যলাভ করিতে আসি না, সত্যের আনন্দলাভ করিতে মিলি।

সেইজন্য এ সভায় কোন কথার পুরা মীমাংসা না হইলেও ক্ষতি নাই, সত্যের কিয়দংশ পাইলেও আমাদের চলে। এমন কি, সত্যক্ষেত্র গভীররূপে কর্ষণ না করিয়া তাহার উপর দিয়া লঘু পদে চলিয়া যাওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য।

আর একদিক্ হইতে আর এক রকমের তুলনা দিলে কথাটা

পরিষ্কার হইতে পারে। রোগের সময় ডাক্তারের ঔষধ পরম উপকারী কিন্তু আত্মীয়ের সেবাটা বড় আরামের। জর্ম্মান্ পণ্ডিতের কেতাবে তত্ত্বজ্ঞানের যে সকল চরম সিদ্ধান্ত আছে তাহাকে ঔষধের বটিকা বলিতে পার কিন্তু মানসিক শুশ্রূষা তাহার মধ্যে নাই। পাঞ্চভৌতিক সভায় আমরা যে ভাবে সত্যালোচনা করিয়া থাকি তাহাকে রোগের চিকিৎসা বলা না যাক্, তাহাকে রোগীর শুশ্রূষা বলা যাইতে পারে।

আর অধিক তুলনা প্রয়োগ করিব না। মোট কথা এই, সেদিন আমরা চার বুদ্ধিমানে মিলিয়া হাসি সম্বন্ধে যে সকল কথা তুলিয়াছিলাম তাহার কোনটাই শেষ কথা নহে। যদি শেষ কথার দিকে যাইবার চেষ্টা করিতাম তাহা হইলে কথোপকথনসভার প্রধান নিয়ম লঙ্ঘন করা হইত।

কথোপকথনসভার একটি প্রধান নিয়ম—সহজে এবং দ্রুতবেগে অগ্রসর হওয়া। অর্থাৎ মানসিক পায়চারি করা। আমাদের যদি পদতল না থাকিত, দুই পা যদি দুটো তীক্ষ্ণাগ্র শলাকার মত হইত, তাহা হইলে মাটির ভিতর দিকে সুগভীর ভাবে প্রবেশ করার সুবিধা হইত কিন্তু এক পা অগ্রসর হওয়া সহজ হইত না। কথোপকথন সমাজে আমরা যদি প্রত্যেক কথার প্রত্যেক অংশকে শেষপর্য্যন্ত তলাইবার চেষ্টা করিতাম, তাহা হইলে একটা জায়গাতেই এমন নিরুপায় ভাবে বিদ্ধ হইয়া পড়া যাইত, যে, আর চলাফেরার উপায় থাকিত না। এক একবার এমন অবস্থা হয়, চলিতে চলিতে হঠাৎ কাদার মধ্যে গিয়া পড়ি; সেখানে যেখানেই পা ফেলি হাঁটু পর্য্যন্ত বসিয়া যায়, চলা দায় হইয়া উঠে। এমন সকল বিষয় আছে যাহাতে প্রতি পদে গভীরতার দিকে তলাইয়া যাইতে হয়; কথোপকথনকালে সেই সকল অনিশ্চিত, সন্দেহতরল বিষয়ে পদা-

র্পণ না করাই ভাল। সে সব জমি বায়ুসেবী পর্য্যটনকারীদের উপযোগী নহে, কৃষী যাহাদের ব্যবসায় তাহাদের পক্ষেই ভাল।

যাহা হউক্, সে দিন মোটের উপরে আমরা প্রশ্নটা এই তুলিয়াছিলাম, যে, যেমন দুঃখের কান্না, তেমনি সুখের হাসি আছে—কিন্তু মাঝে হইতে কৌতুকের হাসিটা কোথা হইতে আসিল? কৌতুক জিনিষটা কিছু রহস্যময়। জন্তুরাও সুখ দুঃখ অনুভব করে কিন্তু কৌতুক অনুভব করে না। অলঙ্কারশাস্ত্রে যে ক'টা রসের উল্লেখ আছে সব রসই জন্তুদের অপরিণত অপরিস্ফুট সাহিত্যের মধ্যে আছে কেবল হাস্যরসটা নাই। হয় ত বানরের প্রকৃতির মধ্যে এই রসের কথঞ্চিৎ আভাস দেখা যায়, কিন্তু বানরের সহিত মানুষের আরও অনেক বিষয়েই সাদৃশ্য আছে।

যাহা অসঙ্গত তাহাতে মানুষের দুঃখ পাওয়া উচিত ছিল, হাসি পাইবার কোন অর্থই নাই। পশ্চাতে যখন চৌকি নাই তখন চৌকিতে বসিতেছি মনে করিয়া কেহ যদি মাটিতে পড়িয়া যায় তবে তাহাতে দর্শকবৃন্দের সুখানুভব করিবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখা যায় না। এমন একটা উদাহরণ কেন, কৌতুকমাত্রেরই মধ্যে এমন একটা পদার্থ আছে যাহাতে মানুষের সুখ না হইয়া দুঃখ হওয়া উচিত।

আমরা কথায় কথায় সেদিন ইহার একটা কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছিলাম। আমরা বলিয়াছিলাম, কৌতুকের হাসি এবং আমোদের হাসি একজাতীয়—উভয় হাস্যের মধ্যেই একটা প্রবলতা আছে। তাই আমাদের সন্দেহ হইয়াছিল, যে, হয় ত আমোদ এবং কৌতুকের মধ্যে একটা প্রকৃতিগত সাদৃশ্য আছে; সেইটে বাহির করিতে পারিলেই কৌতুকহাস্যের রহস্য ভেদ হইতে পারে।

সাধারণভাবের সুখের সহিত আমোদের একটা প্রভেদ আছে। প্রতিদিন যথাসময়ে যথাস্থানে স্বচ্ছন্দপূর্ব্বক অন্নপান করিয়া আমরা সুখে থাকি, একদিন নিয়মভঙ্গ করিয়া অসময়ে নূতন স্থানে কষ্ট স্বীকারপূর্ব্বক চড়িভাতি করিয়া আমরা আমোদ পাই। নিয়মভঙ্গে যে একটু পীড়া আছে সেই পীড়াটুকু না থাকিলে আমোদ হইতে পারে না। আমোদ জিনিষটা নিত্যনৈমিত্তিক সহজ নিয়মসঙ্গত নহে; তাহা মাঝে মাঝে এক একদিনের; তাহাতে বিপুল প্রয়াসের আবশ্যক। সেই পীড়ন এবং প্রয়াসের সংঘর্ষে মনের যে একটা উত্তেজনা হয় সেই উত্তেজনাই আমোদের প্রধান উপকরণ।

আমরা বলিয়াছিলাম কৌতুকের মধ্যেও নিয়মভঙ্গজনিত একটা পীড়া আছে; সেই পীড়াটা অনতিঅধিকমাত্রায় না গেলে আমাদের মনে যে একটা সুখকর উত্তেজনার উদ্রেক করে, সেই আকস্মিক উত্তেজনার আঘাতে আমরা হাসিয়া উঠি। যাহা সুসঙ্গত তাহা চিরদিনের নিয়মসম্মত, যাহা অসঙ্গত তাহা ক্ষণকালের নিয়মভঙ্গ। যেখানে যাহা হওয়া উচিত সেখানে তাহা হইলে তাহাতে আমাদের মনের কোন উত্তেজনা নাই, হঠাৎ, না হইলে কিম্বা আর একরূপ হইলে সেই আকস্মিক অনতিপ্রবল উৎপীড়নে মনটা একটা বিশেষ চেতনা অনুভব করিয়া সুখ পায় এবং আমরা হাসিয়া উঠি।

সেদিন আমরা এই পর্য্যন্ত গিয়াছিলাম—আর বেশি দূর যাই নাই। কিন্তু তাই বলিয়া আর যে যাওয়া যায় না তাহা নহে। আরও বলিবার কথা আছে।

শ্রীমতী দীপ্তি প্রশ্ন করিয়াছেন, যে, আমাদের চার পণ্ডিতের সিদ্ধান্ত যদি সত্য হয় তবে চলিতে চলিতে হঠাৎ অল্প হুঁচট্ খাইলে

কিম্বা রাস্তায় যাইতে অকস্মাৎ অল্পমাত্রায় দুর্গন্ধ নাকে আসিলে আমাদের হাসি পাওয়া, অন্ততঃ, উত্তেজনাজনিত সুখ অনুভব করা উচিত।

এ প্রশ্নের দ্বারা আমাদের মীমাংসা খণ্ডিত হইতেছে না, সীমাবদ্ধ হইতেছে মাত্র। ইহাতে কেবল এইটুকু দেখা যাইতেছে যে পীড়নমাত্রেই কৌতুকজনক উত্তেজনা জন্মায় না; অতএব, এক্ষণে দেখা আবশ্যক, কৌতুক-পীড়নের বিশেষ উপকরণটা কি।

জড় প্রকৃতির মধ্যে করুণরসও নাই, হাস্যরসও নাই। একটা বড় পাথর ছোট পাথরকে গুঁড়াইয়া ফেলিলেও আমাদের চোখে জল আসে না, এবং সমতলক্ষেত্রের মধ্যে চলিতে চলিতে হঠাৎ একটা খাপছাড়া গিরিশৃঙ্গ দেখিতে পাইলে তাহাতে আমাদের হাসি পায় না। নদী নির্ঝর পর্ব্বত সমুদ্রের মধ্যে মাঝে মাঝে আকস্মিক অসামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়,—তাহা বাধাজনক, বিরক্তিজনক, পীড়াজনক হইতে পারে, কিন্তু কোন স্থানেই কৌতুক জনক হয় না। সচেতন পদার্থসম্বন্ধায় খাপছাড়া ব্যাপার ব্যতীত শুদ্ধ জড়পদার্থে আমাদের হাসি আনিতে পারে না।

কেন, তাহা ঠিক করিয়া বলা শক্ত কিন্তু আলোচনা করিয়া দেখিতে দোষ নাই।

আমাদের ভাষায় কৌতুক এবং কৌতূহল শব্দের অর্থের যোগ আছে। সংস্কৃত সাহিত্যে অনেক স্থলে একই অর্থে বিকল্পে উভয় শব্দেরই প্রয়োগ হইয়া থাকে। ইহা হইতে অনুমান করি, কৌতূহল বৃত্তির সহিত কৌতুকের বিশেষ সম্বন্ধ আছে।

কৌতূহলের একটা প্রধান অঙ্গ নূতনত্বের লালসা—কৌতুকেরও একটা প্রধান উপাদান নূতনত্ব। অসঙ্গতের মধ্যে যেমন নিছক বিশুদ্ধ নূতনত্ব আছে সঙ্গতের মধ্যে তেমন নাই।

কিন্তু প্রকৃত অসঙ্গতি ইচ্ছাশক্তির সহিত জড়িত, তাহা জড় পদার্থের মধ্যে নাই। আমি যদি পরিষ্কার পথে চলিতে চলিতে হঠাৎ দুর্গন্ধ পাই তবে আমি নিশ্চয় জানি, নিকটে কোথাও এক জায়গায় দুর্গন্ধ বস্তু আছে তাই এইরূপ ঘটিল; ইহাতে কোনরূপ নিয়মের ব্যতিক্রম নাই, ইহা অবশ্যম্ভাবী। জড়প্রকৃতিতে যে কারণে যাহা হইতেছে তাহা ছাড়া আর কিছু হইবার যো নাই, ইহা নিশ্চয়।

কিন্তু পথে চলিতে চলিতে যদি হঠাৎ দেখি একজন মান্য বৃদ্ধ ব্যক্তি খেম্‌টা নাচ নাচিতেছে, তবে সেটা প্রকৃতই অসঙ্গত ঠেকে; কারণ, তাহা অনিবার্য্য নিয়মসঙ্গত নহে। আমরা বৃদ্ধের নিকট কিছুতেই এরূপ আচরণ প্রত্যাশা করি না, কারণ, সে ইচ্ছাশক্তি-সম্পন্ন লোক; সে ইচ্ছা করিয়া নাচিতেছে; ইচ্ছা করিলে না নাচিতে পারিত। জড়ের নাকি নিজের ইচ্ছামত কিছু হয় না এই জন্য জড়ের পক্ষে কিছুই অসঙ্গত কৌতুকাবহ হইতে পারে না। এই জন্য অনপেক্ষিত হুঁচট বা দুর্গন্ধ হাস্যজনক নহে। চায়ের চামচ যদি দৈবাৎ চায়ের পেয়ালা হইতে চ্যুত হইয়া দোয়াতের কালির মধ্যে পড়িয়া যায় তবে সেটা চামচের পক্ষে হাস্যকর নহে—ভারা-কর্ষণের নিয়ম তাহার লঙ্ঘন করিবার যো নাই; কিন্তু অন্যমনস্ক লেখক যদি তাঁহার চায়ের চামচ দোয়াতের মধ্যে ডুবাইয়া চা খাই-বার চেষ্টা করেন তবে সেটা কৌতুকের বিষয় বটে। নীতি যেমন জড়ে নাই, অসঙ্গতিও সেইরূপ জড়ে নাই। মনঃপদার্থ প্রবেশ করিয়া যেখানে দ্বিধা জন্মাইয়া দিয়াছে সেইখানেই উচিত এবং অনুচিত, সঙ্গত এবং অদ্ভুত।

কৌতূহল জিনিষটা অনেক স্থলে নিষ্ঠুর; কৌতুকের মধ্যেও নিষ্ঠুরতা আছে। সিরাজ্‌উদ্দৌলা দুইজনের দাড়িতে দাড়িতে

বাঁধিয়া উভয়ের নাকে নস্ত পুরিয়া দিতেন এইরূপ প্রবাদ শুনা যায়—উভয়ে যখন হাঁচিতে আরম্ভ করিত তখন সিরাজউদ্দৌলা আমোদ অনুভব করিতেন। ইহার মধ্যে অসঙ্গতি কোন্‌খানে? নাকে নস্ত দিলে ত হাঁচি আসিবারই কথা। কিন্তু এখানেও ইচ্ছার সহিত কার্য্যের অসঙ্গতি। যাহাদের নাকে নস্ত দেওয়া হইতেছে তাহাদের ইচ্ছা নয় যে তাহারা হাঁচে, কারণ, হাঁচিলেই তাহাদের দাড়িতে অকস্মাৎ টান পড়িবে কিন্তু তথাপি তাহাদিগকে হাঁচিতেই হইতেছে।

এইরূপ ইচ্ছার সহিত অবস্থার অসঙ্গতি, উদ্দেশ্যের সহিত উপায়ের অসঙ্গতি, কথার সহিত কার্য্যের অসঙ্গতি এগুলোর মধ্যে নিষ্ঠুরতা আছে। অনেক সময় আমরা যাহাকে লইয়া হাসি সে নিজের অবস্থাকে হাস্যের বিষয় জ্ঞান করে না। এই জন্যই পাঞ্চভৌতিক সভায় ব্যোম বলিয়াছিলেন, যে, কমেডি এবং ট্র্যাজেডি কেবল পীড়নের মাত্রাভেদ মাত্র। কমেডিতে যতটুকু নিষ্ঠুরতা প্রকাশ হয় তাহাতে আমাদের হাসি পায় এবং ট্র্যাজেডিতে যতদূর পর্য্যন্ত যায় তাহাতে আমাদের চোখে জল আসে। গর্দ্দভের মুখস্‌পরা বটম্‌কে দেখিয়া টাইটানিয়া যখন প্রেমমোহে মুগ্ধ হইতেছেন তখন তাহা আমাদের হাস্তের বিষয়; কিন্তু সংসারে অনেক গর্দ্দভের নিকট অনেক টাইটানিয়া অপূর্ব্ব মোহবশতঃ যে আত্মবিসর্জ্জন করিয়া থাকে তাহা মাত্রাভেদে এবং পাত্রভেদে মর্ম্মভেদী শোকের কারণ হইয়া উঠে।

অসঙ্গতি কমেডিরও বিষয়, অসঙ্গতি ট্র্যাজেডিরও বিষয়। কমেডিতেও ইচ্ছার সহিত অবস্থার অসঙ্গতি প্রকাশ পায়। ফল্‌ষ্টাফ্ উয়িণ্ডসরবাসিনী রঙ্গিনীর প্রেমলালসায় বিশ্বস্তচিত্তে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু দুর্গতির একশেষ লাভ করিয়া বাহির হইয়া আসিলেন;—

রামচন্দ্র যখন রাবণ বধ করিয়া, বনবাস প্রতিজ্ঞাপূরণ করিয়া, রাজ্যে ফিরিয়া আসিয়া দাম্পত্য সুখের চরমশিখরে আরোহণ করিয়াছেন এমন সময় অকস্মাৎ বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হইল, গর্ভবতী সীতাকে অরণ্যে নির্ব্বাসিত করিতে বাধ্য হইলেন। উভয় স্থলেই আশার সহিত ফলের, ইচ্ছার সহিত অবস্থার অসঙ্গতি প্রকাশ পাইতেছে। অতএব স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, অসঙ্গতি দুই শ্রেণীর আছে; একটা হাস্যজনক, আর একটা দুঃখজনক। বিরক্তিজনক, বিস্ময়জনক, রোষজনককেও আমার শেষ শ্রেণীতে ফেলিতেছি।

যে লোককে অত্যন্ত পরিশ্রমী বলিয়া জানি তাহাকে একদিন আলস্য করিতে দেখিলে সেইটুকু অসঙ্গতিতে আমাদের মনে কেবল মাত্র ঈষৎ বিস্ময় সঞ্চার হয়—এবং তখনি ইহার মধ্যে একটা সঙ্গত নিয়মের আবিষ্কার করি; বলি, যে, শারীরিক ক্ষমতার সীমা বশতঃ অশ্রান্ত পরিশ্রমী লোকদিগকেও এক এক দিন আলস্য আক্রমণ করিয়া থাকে। যাহার বাপকে এককালে লক্ষপতি বলিয়া জানিতাম তাহাকে হঠাৎ কৌপীন পরিয়া ভিক্ষা করিতে দেখিলে সেই অসঙ্গতিতে মনে দুঃখ বোধ হয়, এবং তাহা হইতে এই একটি সাধারণ নিয়ম বাহির করি, যে, আর্থিক অবস্থা চিরকাল কাহারও সমান যায় না। যাহাকে ধার্ম্মিক বলিয়া ধারণা ছিল হঠাৎ তাহাকে অধর্ম্মাচরণ করিতে দেখিলে লোকবিশেষের নিকট তাহা কৌতুকাবহ মনে হইতেও পারে, না হইতেও পারে; যাহার ভক্তিতে অধিক আঘাত লাগে, বা ভণ্ডামি যাহার কাছে অত্যন্ত কদর্য্য বা পীড়াজনক তাহার কৌতুক বোধ হয় না—; কিন্তু বিশেষ অবস্থা এবং প্রকৃতিবশতঃ এই অসঙ্গতি যাহাকে গভীরভাবে আঘাত না করে তাহার নিকট ইহা বিশেষ কৌতুকের মনে হইতে পারে।

অর্থাৎ অসঙ্গতি যখন আমাদের মনের অনতিগভীর স্তরে আঘাত

করে তখনই আমাদের কৌতুক বোধ হয়, গভীরতর স্তরে আঘাত করিলে আমাদের দুঃখ বোধ হয়। শিকারী যখন অনেকক্ষণ অনেক তাক করিয়া হংসভ্রমে একটা দূরস্থ শ্বেত পদার্থের প্রতি গুলি বর্ষণ করে এবং ছুটিয়া কাছে গিয়া দেখে সেটা একটা ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড, তখন তাহার সেই নৈরাশ্যে আমাদের হাসি পায়; কিন্তু কোন লোক যাহাকে আপন জীবনের পরম পদার্থ মনে করিয়া একাগ্রচিত্তে একান্ত চেষ্টায় আজন্মকাল তাহার অনুসরণ করিয়াছে এবং অবশেষে সিদ্ধকাম হইয়া তাহাকে হাতে লইয়া দেখিয়াছে সে তুচ্ছ প্রবঞ্চনামাত্র, তখন তাহার সেই নৈরাশ্যে অন্তঃকরণ ব্যথিত হয়। দুর্ভিক্ষে যখন দলে দলে মানুষ মরিতেছে তখন সেটাকে প্রহসনের বিষয় বলিয়া কাহারও মনে হয় না;—কিন্তু আমরা অনায়াসে কল্পনা করিতে পারি, একটা রসিক সয়তানের নিকট ইহা পরম কৌতুকাবহ দৃশ্য; সে তখন এই সকল অমর-আত্মাধারী জীর্ণকলেবরগুলির প্রতি সহাস্য কটাক্ষপাত করিয়া বলিতে পারে ঐ ত তোমাদের ষড়্‌দর্শন, তোমাদের কালিদাসের কাব্য, তোমাদের তেত্রিশ কোটি দেবতা পড়িয়া আছে; নাই শুধু দুইমুষ্টি তুচ্ছ তণ্ডুল-কণা, অমনি তোমাদের অমর আত্মা তোমাদের জগদ্বিজয়ী মনুষ্যত্ব একেবারে কণ্ঠের কাছটিতে আসিয়া ধুক্‌ধুক্ করিতেছে!

স্থূল কথাটা এই যে, অসঙ্গতির তার অল্পে অল্পে চড়াইতে চড়াইতে বিস্ময় ক্রমে হাস্যে এবং হাস্য ক্রমে অশ্রুজলে পরিণত হইতে থাকে।

শ্রীসমীরণ।

ব্রাহ্মণ।

(ছান্দোগ্যোপনিষৎ। ৪ প্রপাঠক। ৪ অধ্যায়)

অন্ধকার বনচ্ছায়ে সরস্বতীতীরে
অস্ত গেছে সন্ধ্যাসূর্য্য; আসিয়াছে ফিরে
নিস্তব্ধ আশ্রমমাঝে ঋষিপুত্রগণ
মস্তকে সমিধ্‌ভার করি আহরণ
বনান্তর হতে; ফিরায়ে এনেছে ডাকি
তপোবন-গোষ্ঠগৃহে স্নিগ্ধশান্ত-আঁখি
শ্রান্ত হোমধেনুগণে; করি' সমাপন
সন্ধ্যাস্নান, সবে মিলি লয়েছে আসন
গুরু গৌতমেরে ঘিরি কুটীর-প্রাঙ্গণে
হোমাগ্নি আলোকে। শূন্যে অনন্ত গগনে
ধ্যানমগ্ন মহাশান্তি; নক্ষত্রমণ্ডলী
সারি সারি বসিয়াছে স্তব্ধ কুতূহলী
নিঃশব্দ শিষ্যের মত। নিভৃত আশ্রম
উঠিল চকিত হয়ে,—মহর্ষি গৌতম
কহিলেন—বৎসগণ, ব্রহ্মবিদ্যা কহি,
কর অবধান!

হেনকালে অর্ঘ্য বহি'
করপুট ভরি, পশিলা প্রাঙ্গণতলে
তরুণ বালক; বন্দি ফলফুলদলে
ঋষির চরণ-পদ্ম, নমি' ভক্তিভরে
কহিলা কোকিলকণ্ঠে সুধাস্নিগ্ধস্বরে,—

ভগবন্, ব্রহ্মবিদ্যাশিক্ষা-অভিলাষী
আসিয়াছি দীক্ষা তরে কুশক্ষেত্রবাসী
সত্যকাম নাম মোর!
শুনি স্মিতহাসে
ব্রহ্মর্ষি কহিলা তারে স্নেহশান্ত ভাষে—
কুশল হউক্ সৌম্য! গোত্র কি তোমার?
বৎস, শুধু ব্রাহ্মণের আছে অধিকার
ব্রহ্মবিদ্যালাভে।—
বালক কহিলা ধীরে,—
ভগবন্, গোত্র নাহি জানি। জননীরে
শুধায়ে আসিব কল্য কর অনুমতি!—
এত কহি ঋষিপদে করিয়া প্রণতি
গেলা চলি সত্যকাম, ঘন-অন্ধকার
বন-বীথি দিয়া,—পদব্রজে হয়ে পার
ক্ষীণ স্বচ্ছ শান্ত সরস্বতী, বালুতীরে
সুপ্তিমৌন গ্রামপ্রান্তে জননী-কুটীরে
করিলা প্রবেশ।
ঘরে সন্ধ্যাদীপ জ্বালা';
দাঁড়ায়ে দুয়ার ধরি জননী জবালা
পুত্রপথ চাহি; হেরি তারে বক্ষে টানি'
আঘ্রাণ করিয়া শির কহিলেন বাণী
কল্যাণ কুশল। শুধাইলা সত্যকাম—
কহ গো জননী মোর পিতার কি নাম,
কি বংশে জনম? গিয়াছিনু দীক্ষাতরে
গৌতমের কাছে;—গুরু কহিলেন মোরে,—

বৎস, শুধু ব্রাহ্মণের আছে অধিকার
ব্রহ্মবিদ্যালাভে।—মাতঃ, কি গোত্র আমার?

শুনি কথা, মৃদুকণ্ঠে অবনতমুখে
কহিলা জননী,—যৌবনে দারিদ্র্যদুখে
বহু-পরিচর্য্যা করি পেয়েছিনু তোরে,—
জন্মেছিস্ ভর্ত্তৃহীনা জবালার ক্রোড়ে,
গোত্র তব নাহি জানি, তাত!

পরদিন
তপোবন-তরুশিরে প্রসন্ন নবীন
জাগিল প্রভাত। যত তাপস বালক,
শিশির-সুস্নিগ্ধ যেন তরুণ আলোক,
ভক্তি-অশ্রু-ধৌত যেন নব পুণ্যচ্ছটা,—
প্রাতঃস্নাত স্নিগ্ধচ্ছবি আর্দ্রসিক্ত জটা,
শুচিশোভা সৌম্যমূর্ত্তি সমুজ্জ্বলকায়
বসেছে বেষ্টন করি বৃদ্ধ বটচ্ছায়
গুরু গৌতমেরে। বিহঙ্গকাকলীগান,
মধুপ-গুঞ্জনগীতি, জলকলতান,
তারি সাথে উঠিতেছে গম্ভীর মধুর
বিচিত্র তরুণ কণ্ঠে সম্মিলিত সুর
শান্ত সামগীতি।

হেন কালে সত্যকাম
কাছে আসি ঋষিপদে করিলা প্রণাম,—

মেলিয়া উদার আঁখি রহিলা নীরবে।
আচার্য্য আশীষ করি শুধাইলা তবে,—
কি গোত্র তোমার, সৌম্য, প্রিয়-দরশন ?—
তুলি শির কহিলা বালক,—ভগবন্,
নাহি জানি কি গোত্র আমার। পুছিলাম
জননীরে ;—কহিলেন তিনি,—সত্যকাম,
বহু-পরিচর্য্যা করি পেয়েছিনু তোরে,
জন্মেছিস্ ভর্ত্তৃহীনা জবালার ক্রোড়ে—
গোত্র তব নাহি জানি।
শুনি সে বারতা
ছাত্রগণ মৃদুস্বরে আরম্ভিল কথা,—
মধুচক্রে লোষ্ট্রপাতে বিক্ষিপ্ত চঞ্চল
পতঙ্গের মত—সবে বিস্ময়-বিকল,
কেহ বা হাসিল, কেহ করিল ধিক্কার
লজ্জাহীন অনার্য্যের হেরি অহঙ্কার।

উঠিলা গৌতম ঋষি ছাড়িয়া আসন
বাহু মেলি,—বালকেরে করি আলিঙ্গন
কহিলেন—অব্রাহ্মণ নহ তুমি, তাত !
তুমি দ্বিজোত্তম, তুমি সত্যকুলজাত !
৭ ফাল্গুন
১৩০১।

আলোচনা।

পলিটিক্স্।

আমাদের জাতীয় প্রজাসমিতি বা ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কন্‌গ্রেসের দশম বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি মিঃ ওয়েব এবং হিন্দুহিতৈষিণী শ্রীমতী অ্যানি বেসেণ্ট্ স্বস্ব বক্তৃতাস্থলে পলিটিক্সের উপযোগিতা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

বিবি বেসেণ্টের মতে পলিটিক্স্ ভারতবর্ষের ধাতুর সহিত ঠিক মিশ খায় না। চিন্তা করা, শিক্ষাদান করা এবং কার্য্যসাধন করা এই তিনের মধ্যে প্রথম দুইটি মহত্তর কার্য্যই ভারতবর্ষকে শোভা পায়, শেষোক্ত কার্য্যটা পলিটিক্সের অঙ্গ এবং তাহা ভারতবর্ষীয়ের জীবনের আদর্শ হওয়া উচিত হয় না।

এসম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, অট্টালিকাকে আকাশের দিকে উচ্চ করিয়া তুলিতে হইলে তাহাকে মাটির মধ্যে গভীর করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়। যদি কেহ মনে করেন অট্টালিকার যতটুকু মাটির মধ্যে প্রোথিত হইল সেটা অপব্যয় হইল, সেটাকে উচ্চে যোগ করিয়া দিলে অট্টালিকা আরো উচ্চতর হইতে পারিত তবে তাঁহাকে উন্নতির স্থায়িত্ব-তত্ত্বে অনভিজ্ঞ বলিতে হইবে!

শক্তিপরম্পরার মধ্যে একটা নিবিড় যোগ আছে। যে জাতি কেবল চিন্তা করে কার্য্য করে না তাহার চিন্তাশক্তি ক্রমশঃ বিকৃত হইয়া যায়; যে জাতি কেবল কার্য্য করে চিন্তা করে না তাহার কার্য্যকারিতা নিষ্ফল হইতে থাকে। একটা জাত কেবল চিন্তা করিবে এবং আর একটা জাত কেবল কার্য্য করিবে এমন বিভাগের নিয়ম টিঁকিতে পারে না; কারণ যে যেখানে অসম্পূর্ণতা পোষণ করে সেইখানে আঘাত লাগিয়াই সে বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

কোন প্রাণীকে প্রচুর বাঁধা খোরাক দিয়া কেবলমাত্র মেদবৃদ্ধি করিলে তাহার মাংস অন্যের পক্ষে বড় উপাদেয় হয় কিন্তু তাহাতে তাহার নিজের সুবিধা দেখি না; আমরা ঘরে বসিয়া কেবলি চিন্তার খোরাকে পরিপুষ্ট হইয়াছি, তাহাতে অন্যান্য মাংসাশী জাতির বিশেষ উপকার হইয়াছে; এখন বুঝিতেছি শিং নাড়িয়া গুঁতা দিবার শিক্ষাটা আমাদের নিজের পক্ষে বিশেষ কার্য্যকরী।

কিন্তু কেবল আত্মরক্ষার শিক্ষাই পলিটিক্‌স্‌ নহে। চিন্তালব্ধ উচ্চতর নীতিগুলিকে মনুষ্যসমাজে কার্য্যে পরিণত করিবার উপায়-সাধনও পলিটিক্সের অঙ্গ। এ সম্বন্ধে মিঃওয়েব যাহা বলিয়াছেন তাহা সারগর্ভ। তিনি বলেন—Politics are amongst the most comprehensive spheres of human activity and none should eventually be excluded from their exercise. There is much that is ludicrous much that is sad, much that is deplorable about them: yet they remain, and ever will remain the most effective field upon which to work for the good of our fellows.

মিঃ ওয়েব বলেন, রাজনীতির নির্ম্মল ক্ষেত্র নীচ স্বার্থপরতা, অর্থলালসা ও আত্ম-পিপাসার পূতিগন্ধময় পঙ্কে কলুষিত হইতে দেওয়া কিছুতেই কর্ত্তব্য নহে। পরার্থপরতায় ও সর্ব্বসাধারণের হিতার্থে আত্মোৎসর্গেরই নাম "পাবলিক লাইফ" বা রাজনীতিকের জীবন। সে জীবন সর্ব্বথা সংস্কৃত, সংযত ও সমুন্নত থাকা প্রয়োজন। যতই ক্ষুদ্র, যতই নিম্ন ও অবনত, অবমানিত ও ঘৃণিত হউক, জাতি বর্ণ শ্রেণী ও সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে মনুষ্য মাত্রেরই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কার্য্যাধিকার আছে; ফলতঃ অবনতকে উন্নত ও পদদলিতকে মনুষ্যত্বের স্বত্ব ও দায়িত্বাধিকার প্রদান করাই উচ্চ রাজনীতি।

ইহা আধুনিক য়ুরোপীয় প্রজাতান্ত্রিক রাজনীতি বা ডেমো-ক্রেসীর অনাবিল অংশ। ইহাই "উচ্চতর পলিটিক্স"। এবারকার কঙ্গ্রেস সভাপতি অত্যল্প মাত্র মাত্রায় আমাদিগকে ইহারই আভাস দিয়াছিলেন।

পরন্তু বিবি বেসেণ্ট বলেন পুরাতন সমাজের বনিয়াদ প্রথমতঃ এবং প্রধানতঃ মনুষ্যের কর্ত্তব্যজ্ঞান ও কর্ত্তব্য পরিচালনের উপ-করণেই গঠিত হইয়াছিল; তাহার পর মনুষ্যের স্বত্বাধিকার (rights of man) বলিয়া একটী সামগ্রী তাহাতে আসিয়া সংযুক্ত হইয়াছে। তাঁহার বিবেচনায় মনুষ্যের কর্ত্তব্যপরায়ণতারই সমাজ সংরক্ষণার্থে প্রচুর; উহার সহিত মানুষের স্বাভাবিক স্বত্বাধিকার রক্ষণচেষ্টার সংযোগ শুভদায়ক নহে। অতএব পলিটিক্স কেবল কর্ত্তব্যাবধারণ, পরিচালন ও শাসনেই পর্য্যবসিত হওয়া উচিত; স্বত্বাধিকার বলিয়া যে সামগ্রীটী উপরপড়া হইয়া আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, উহা মনুষ্যসমাজের সীমানার মধ্যেই না থাকা ভাল। বলা বাহুল্য বিবির এই মর্ম্মের উক্তি এবং ইঙ্গিত, তাঁহার প্রতি আমাদের সবি-শেষ শ্রদ্ধা সত্বেও, আমরা আদৌ অঙ্গীকার বা অনুমোদন করিতে প্রস্তুত নই। তিনি নিজেই অনতিকালপূর্ব্বে, মনুষ্য জাতির স্বাভা-বিক স্বত্বাধিকারের সমূহ পক্ষপাতিনী এবং অগ্রগণ্যা পরিচালিকা ও প্রচারিকা ছিলেন। ভারতবর্ষে আসিয়া আমাদের ভাগ্যদোষেই, বোধ হয়, তিনি তাঁহার পূর্ব্বপ্রচারিত পবিত্র মত প্রত্যাহার করিতেছেন। কর্ত্তব্যজ্ঞান ও কর্ত্তব্যপালনের মাহাত্ম্য অবিসম্বা-দিত। উহা সমাজের, মানুষের মনুষ্যত্বের মূল ভিত্তি, আদি উপা-দান; তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু, কর্ত্তব্যানুভব করিয়া কর্ত্তব্যপালন, বোধ হয়, কেবল মানবধর্ম্ম-যুক্ত জীব মানুষেই করে; পশু, পতঙ্গ, কীটানুকীটে মনুষ্যোচিত উচ্চতর কর্ত্তব্যপালন

করে না ; তাহাদের মধ্যে কর্ত্তব্যজ্ঞানের স্ফূর্ত্তি হওয়াই সম্ভবে না। মনুষ্য জানে সে মানুষ ; মনুষ্যত্বের স্বাভাবিক স্বত্বাধিকার সুতরাং কর্ত্তব্যপালনের দায়িত্ব তাহার আছে। স্মরণ রাখা আবশ্যক স্বত্বাধিকারের সঙ্গেই দায়িত্ব সংযুক্ত। মনুষ্য যে সকল স্থলে পশু অপেক্ষাও অধম বলিয়া পরিগণিত, তথায় তাহার কর্ত্তব্যজ্ঞান পশু অপেক্ষা অধিক হওয়ার আশা করা যায় না। ফলতঃ মনুষ্যের স্বাভাবিক স্বত্বাধিকারজনিত দায়িত্ব হইতেই প্রধানতঃ তাহার কর্ত্তব্যজ্ঞান উদ্ভূত হয়। যেস্থানে সে দায়িত্বের অভাব, সেস্থলে কর্ত্তব্যজ্ঞানের অনটন অবশ্যম্ভব। পরন্তু, মনুষ্যত্বের স্বত্বাধিকারে বঞ্চিত হইলে তাহার উদ্ধার সাধনে তৎপর হওয়া নিজেই মানবধর্ম্মের একটী প্রধান কর্ত্তব্য।

যে ব্রাহ্মণ প্রাচীন ভারতে চিন্তা করিত এবং শিক্ষাদান করিত তাহার কি কেবল কর্ত্তব্যজ্ঞানই ছিল স্বত্বাধিকার ছিল না? রাজ্যের মধ্যে তাহার কি একটা বিশেষ স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল না? অপর সাধারণের নিকট তাহার কি কোন প্রকার দাবী ছিল না? প্রাচীন ইতিহাসে এমন আভাসও কি পাওয়া যায় না যে, এক সময়ে ব্রাহ্মণের স্বত্বাধিকার লইয়া ক্ষত্রিয়ের সহিত তাহার রীতিমত বিরোধ বাধিয়াছিল? ব্রাহ্মণ যদি আত্মসম্মান, আপনার স্বত্বাধিকার রক্ষা করিতে না পারিত তবে সে কি চিন্তা করিতে এবং শিক্ষা দান করিতে সক্ষম হইত? পরন্তু তখন রাজা এবং গুরু, ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণ আপন স্বত্ব এতদুর পর্য্যন্ত বিস্তার করিয়াছিলেন যে, অপর সাধারণের মনুষ্যোচিত অধিকার অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিয়াছিল—তাহাদের চিন্তার স্বাধীনতা তাহাদের মনুষ্যত্বের পূর্ণবিকাশে তাঁহারা হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন—ভারতবর্ষের পতনের সেই একটা প্রধান কারণ। এখনকার পলিটিক্সের

গতি অনুসারে সর্ব্বসাধারণেই আপনার স্বাভাবিক স্বত্ব পূর্ণমাত্রায় লাভ করিবার অধিকারী। সকলেই আপন মনুষ্যগৌরব অনুভব করিয়া মনুষ্যত্বের কর্ত্তব্য সাধনে উৎসাহী হইবে। যাহার হাতে ক্ষমতা আছে সে আপন খেয়াল অনুসারে অক্ষম ব্যক্তিকে উৎপীড়ন করিবে না, যাহার হাতে শাস্ত্র আছে সে কেবলমাত্র অনুশাসন দ্বারা অন্যের চিন্তা এবং কার্য্যকে শৃঙ্খলবদ্ধ করিবে না। রাজমন্ত্রীরাও ন্যায়মতে (অর্থাৎ দীনতম ব্যক্তিরও ন্যায্য স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করিয়া) আইন করিবেন, রাজপুরুষেরাও আইনমতে শাসন করিবেন, গুরুও যুক্তির দ্বারা আপন মত প্রচার করিবেন। এইরূপে প্রত্যেকে আপন স্বত্বাধিকার রক্ষা করিতে পারিলে তবেই আপন সাধ্যমত আপনার উন্নতি এবং সেই সঙ্গে জগতের উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হইবে। স্বত্বাধিকার ব্যতীত কর্ত্তব্য অনুভব করা এবং কর্ত্তব্য পালন করা সম্ভব নহে। স্বত্বাধিকার সংক্ষেপ হইলে কর্ত্তব্যের পরিধিও সংক্ষিপ্ত হইয়া আসে।

ইংলণ্ড, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার বৈভববিলাসের বিপন্নতা ও বীভৎস ব্যাপার দেখাইয়া বিবি বেসেণ্ট্ আমাদিগকে পাশ্চাত্য জড়বাদের আপাতমনোহর এবং অত্যন্ত মোহকর আদর্শ পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক ভারতীয় প্রাচীনকালপ্রবর্ত্তিত অধ্যাত্মপথ অনুসরণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। সদুপদেশ সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারতবর্ষের ন্যায় পুণ্য দেশেও একেবারে পঞ্চবিংশতি কোটি মহামুনির উদ্ভব সম্ভবপর নহে। যথাসম্ভব লোক আধ্যাত্মিক হইয়াও যথেষ্ট পরিমাণে পার্থিব লোক বাকি থাকিবে। তাহারা যাহাতে আত্মসম্ভ্রম, উন্নতি এবং মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে সে জন্য চেষ্টা করা আবশ্যক; যাঁহারা না আধ্যাত্মিক না পার্থিব তাঁহাদের মত শোচনীয় জীব জগতে আর নাই।

পাশ্চাত্যের পাপাদর্শ অতি সাবধানেই পরিবর্জ্জনীয়। কিন্তু, পুণ্যাদর্শও যদি সেখানে পাই, তাহা পরিত্যাগ করিব কেন? মিঃ ওয়েব আইরিশম্যান। আইয়িশে ইংরেজে স্বার্থ ও রাজনৈতিক সত্ত্বাধিকারের সম্বন্ধটা যে খুব সুমিষ্ট তাহা নহে। সকলেই জানেন সে সম্বন্ধ তীব্র তিক্তরসমিশ্রিত। এতাদৃশ অবস্থায় মিঃ ওয়েব আইরিশ "হোমরুলার" হইয়াও, ইংরাজের একটী অতি মহৎ স্বরূপের আদর্শ আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছিলেন। তাঁহার উক্তি এই ;—

"ইংরাজেরা অন্যান্য জাতি অপেক্ষা স্বভাবতঃ অধিকতর সাহসীও নয়, সৎ ও শক্তিশালীও নয়। তাহাদের আত্ম-নির্ভরতা ও কর্ত্তব্যজ্ঞানের উচ্চতা হইতেই, তাহাদের বিজয়কীর্ত্তি ও কার্য্যসফলতা অংশতঃ উদ্ভূত। তাহারা যাহা সঙ্কল্প করে, নিশ্চয়ই তাহা সিদ্ধ করে। অন্যান্য লোকের ন্যায়, তাহারাও স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়; কিন্তু, রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই হউক কিম্বা রাজ্য-শাসন ব্যাপারেই হউক; যখন তাহারা সাধারণের হিতসাধন সংকল্প করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল, তখন তাহারা কোন ক্রমেই ব্যক্তিগত স্বার্থের বশবর্ত্তী হইয়া সে সংকল্প সাধনে বিরত হইবে না; সে কার্য্য সম্পাদনে কিছুতেই শৈথিল্য করিবে না; ইহা নিশ্চয়। এবং ইহাও নিশ্চয় যে, তাহারা পরস্পরে পরস্পরকে বিশ্বাস করিতে জানে। অতএব এই সকল বিষয়ে ইংরাজ গুণের আদর্শ আমাদের গ্রহণীয়।"

এ দেশীয়দিগের বিশেষতঃ এ দেশে অধুনা যাঁহারা রাজনৈতিক ব্যাপারে সংলিপ্ত, ও রাজ-প্রদত্ত আংশিক আত্ম-শাসনাধিকার ব্যপদেশে সাধারণ জনসাধারণের কার্য্য সম্পাদনে নিযুক্ত তাঁহাদের আপাততঃ যত কিছু শিক্ষণীয় আছে তাহার মধ্যে উপরোক্ত

শিক্ষা সর্ব্বপ্রধান স্থানীয়। জনসাধারণের কার্য্যে অক্ষুণ্ণ ও আন্তরিক মনঃসংযোগ, শ্রম এবং অনুরাগ এবং তাহা সম্পাদনকালে আত্ম-স্বার্থের বা আত্মীয় স্বজনের ব্যক্তিগত বিরোধী স্বার্থের বশবর্ত্তী হইয়া সর্ব্বসাধারণের স্বার্থ বিনষ্ট না করা, উপস্থিত ক্ষেত্রে আমাদের এই দুইটী শিক্ষা অতিশয় আবশ্যক হইয়াছে। কাউন্সিলের মেম্বর, মিউনিসিপাল কমিশনর, ডিষ্ট্রীক্ট ও লোকালবোর্ডের সদস্য হইতে গ্রাম্য চৌকিদারি সমিতির পঞ্চায়েতদিগের পর্য্যন্ত অল্পাধিক পরিমাণে ঐ দুই শিক্ষার প্রয়োজন। পরন্তু নগরবাসী ও গ্রাম্য লোকদিগেরও এ শিক্ষা সম্বন্ধে উদাসীন থাকা উচিত নয়। ইহাই স্বায়ত্তশাসনাধিকারের অস্থিমজ্জা প্রাণ। এই শিক্ষার অভাবে, বলিতে লজ্জার ও ঘৃণার উদ্রেক হয়, আমরা যে এক বিন্দু আত্মশাসনাধিকার পাইয়াছি অনেকস্থলেই তাহার কেবল অপব্যবহার হইতেছে। ফলতঃ সাধারণের কার্য্য সম্পাদন সম্বন্ধে এই শিক্ষায় সুশিক্ষিত না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা অতিরিক্ত পরিমাণে আত্মশাসনাধিকার পাইবার উপযুক্ত হইব, এ কথা বলিতে অন্ততঃ আমরা সাহসী নহি। আমাদের মধ্যে আত্ম-গরিমা প্রকাশের ইদানীং ইয়ত্তা নাই। অতএব এস্থলে আমরা সেটা না করিয়া, সংগোপনে যদি দুই একটী আত্মকথা এবং আসল কথার আলোচনা করিয়া থাকি, তাহাতে ইষ্ট বই অনিষ্ট হইবে না। সংবাদপত্রের আস্ফালন ও অফিসিয়াল রিপোর্টের আবরণ ক্ষণকালের জন্য দূরে রাখিয়া, উপস্থিত ক্ষেত্রে, আমাদের আত্মশাসনব্যাপারের অপক্ষপাত সমালোচনা করিয়া অকপট চিত্তে বলুন দেখি সে বিষয়ে আমাদের উপযুক্ততা কিরূপ জন্মিয়াছে?

কিন্তু, আমরা চিরকালই অনুপযুক্ত থাকিব এমনও কেহ মনে করিবেন না। কোনও কার্য্যের প্রথমে ও প্রারম্ভে পরিপক্কতা

স্বভাবতই সম্ভবে না। কেবল সেই পরিপক্কতার কপট পরিচয় দেওয়াই মহাভ্রম। পক্ষান্তরে, গবর্ণমেণ্টের অযথা কঠোরতা এবং অশেষ ত্রুটী সত্ত্বেও, উহা মূলতঃ প্রজাতান্ত্রিক প্রণালী। ভারতীয় ইংরাজের অসীম প্রভুত্ব-স্পৃহার অভ্যন্তরেও শাসনপ্রণালীর প্রজা-তান্ত্রিক আসক্তি অলক্ষে বিদ্যমান। য়ুরোপীয় ডেমক্রেসীকে একে-বারে অতিক্রম করিয়া য়ুরোপীয়দিগের শাসনযন্ত্র কোথায়ও চলিতে পারে না। কোন না কোনও প্রকারে তাহার সঙ্গে সংশ্রব রাখিতে বাধ্য হয়। সুতরাং সাধারণ মত ও জনসাধারণের স্বত্বাধিকারকে উহা একেবারেই উপেক্ষা করিতে পারে না। ইহাই অবশ্য আমা-দিগের আশা এবং এ আশা একান্ত বৃথা আশাও নহে। ইংরাজ শাসনের যেরূপ গতি প্রকৃতি তাহাতে এমন দিন অবশ্যই এক সময়ে আসিতে পারে, যখন এদেশীয়েরা শ্রেণী ও সম্প্রদায়নির্বিশেষে বৃটিশ প্রজার প্রাপ্য স্বত্বাধিকারের সম্যক বা আংশিক অংশ পাইলেও পাইতে পারে। কিন্তু, তাহার উপযুক্ত ও তাহার জন্য প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন। প্রজানীতি, প্রকৃত প্রস্তাবে প্রতিষ্ঠিত ও সমগ্রদেশে পরিব্যাপ্ত হওয়ার পূর্ব্বে, বৃটিশ রাজ-নীতি, বৃটিশ প্রজার স্বত্বাধিকার এ দেশীয়দিগকে দিবেন না, ইহা নিশ্চয়; পরন্তু আমাদের অনুপ-যুক্ততা ও অপ্রস্তুত অবস্থায় তাহা দেওয়াও নিষ্ফল। উষরক্ষেত্রে বীজ বপন বৃথা। আমাদের আশঙ্কা, ক্ষেত্র অদ্যাপি প্রস্তুত হয় নাই; প্রকৃত প্রজানৈতিক পলিটিক্সের এখনও আমাদের মধ্যে অত্যন্ত অভাব। পলিটিক্স এখনও আমাদের মধ্যে একটী পোষাকী জিনি-ষের বেশী আর কিছুই নয়। উহা এখনও আমাদের রক্ত মাংসে মেধ মজ্জায় মিশে নাই। উহা অদ্যাপি আমাদের প্রাত্যহিক জীবন ধারণের আহার্য্য স্বরূপ হয় নাই। তাহা না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের দাসত্ব ঘুচিয়া প্রকৃত ও পুষ্টিকর প্রজাত্ব জন্মিবে না।

আমরা বোধ হয় আমাদের রাজনৈতিক প্রবণতা কি প্রকৃতির তাহা উপরি উক্ত আলোচনায় কিয়ৎ পরিমাণে বিবৃত করিয়াছি। এক্ষণে, সাম্রাজ্যের রাশিচক্র কৌন্সিলগৃহের উচ্চাকাশে কিরূপে আবর্ত্তিত হইতেছে তাহা খণ্ড খণ্ড ভাবে দেখা আবশ্যক।

কন্‌গ্রেসে বিদ্রোহ।

কিন্তু তৎপূর্ব্বে প্রসঙ্গক্রমে সংক্ষেপে একটা কথা বলিতে ইচ্ছা করি। কন্‌গ্রেসের গত অধিবেশনে নর্টন সাহেবের প্রতি কোন বিশেষ বক্তৃতার ভার ছিল বলিয়া কোন কোন সভ্য বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিলেন। চরিত্র-দোষজন্য কন্‌গ্রেসের সহিত নর্টনের ঘনিষ্ঠতা তাঁহারা প্রার্থনীয় মনে করেন না।

নর্টন্ যদি সমাজে পতিত হইয়া থাকেন তবে সমাজে তাঁহার নিমন্ত্রণ বন্ধ হইতে পারে—কিন্তু কন্‌গ্রেসসভায় অকৃত্রিম ভারত-হিতৈষী মাত্রেরই অধিকার আছে। হাবড়ার ব্রিজ্ যদি কোন মাতাল এঞ্জিনিয়ারের দ্বারা নির্ম্মিত হইত তবে টেম্পারেন্স সভার সভ্যগণ কি সাঁতার দিয়া নদী পার হইতেন ?

ভারত কৌন্সিলের স্বাধীনতা।

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার "সেসন"ই এ শীতে, সতেজ, সর গরম। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক বৈঠক বরং কিছু বিমর্ষ। কটন আইন ও ক্যাণ্টনমেণ্ট বিলের আলোচনায় এক বিরাট সমস্যা উপস্থিত; পুলিশ রেগুলেসন বিলে বিস্তৃত আন্দোলনতরঙ্গ উত্তোলন করিয়াছে। আমাদের সুপ্রিম কৌন্সিল (বা বড় ব্যবস্থাপক সভা) সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন অথবা ষ্টেট সেক্রেটারির সারথ্যে বৃটিশ পার্লামেণ্টের কিঞ্চিৎ অধীন এই প্রশ্ন কটন বা কাপড় সূতার আইন যখন বিল ছিল তখনি অঙ্কুরিত হইয়া ক্যাণ্টনমেণ্ট বিলের

অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় একটা কণ্টকবৃক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। বৃক্ষটার অনেকগুলা শাখা প্রশাখা ও কাঁটা-খোঁচা বাহির হইয়াছে। কটনএক্ট সম্বন্ধে সেক্রেটারী অব্ ষ্টেটের আদেশ বা "ম্যাণ্ডেট্" অথবা ব্যবস্থাপক সভাপতি এলগিন কর্তৃক তাহার উল্লেখ এই আকস্মিক উৎকণ্ঠা উৎপাদন ও বিপদপাতের অব্যবহিত কারণ। "ম্যাণ্ডেট" উক্তিটীই যেন বোধ হয়, অনর্থ ঘটাইয়াছে। ব্যবস্থাপকগণ, বিশেষতঃ 'আনঅফিশিয়াল' এঙ্গলো-ইণ্ডিয়ান মেম্বরেরা মহা বিরক্ত হইয়াছেন। সুতরাং এ ব্যাপারে ব্যাপস্থাপক সভার বিশাল হিমাচলবৎ গাম্ভীর্য্যের এক বিন্দু ব্যতিক্রম হইয়াছে।

সকলেই জানেন যে ব্যবস্থাপক সভার অসীম স্বাধীনতা সংরক্ষণের চেষ্টায় শ্রীমান স্যর গ্রিফিথ ইভান্স এবং মাননীয় মিঃ প্লেফেয়ার এই দুই রথী অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। ইহাঁদের উভয়েরই বিবেচনায় এখানকার এই আইন-সভার স্বাধীনতা অসীম হওয়া উচিত; অসীমই ছিল; কিছু কাল হইতে ষ্টেটসেক্রেটারী সংকল্প করিয়া সসীম করিতে বসিয়াছেন। ইহা, বে-আইনি, বে-নজিরি এবং বিষম বিপত্তিজনক। ইহাতে করিয়া ব্যবস্থাপক সভার বে-ইজ্জত, সে সভার সভাপতি স্বয়ং রাজপ্রতিনিধির সম্ভ্রমের হানি এবং ব্যবস্থাপকদিগের বিধি ব্যবস্থা বিদ্রূপকর হইবে; পরন্তু, তদ্দ্বারা ভারতরাজ্য শাসন সম্বন্ধেও ভয়ানক বিভীবিকা উপস্থিত হইবে। কেবল তাহাই নহে, বৃটিশ ডেমক্রেসী আদৌ সাম্রাজ্য শাসনে সমর্থ কিনা, সে বিষয়েই (শুনিতেছি) ঘোর সন্দেহ, উপস্থিত হইবে! কেবল সন্দেহ নহে; সে অসমর্থতা সম্পূর্ণরূপে সাব্যস্তই হইবে। The question whether a democracy can govern an Empire will have to be answered in the negative.। পরন্তু, এরূপ, অত্যাচার হইলে, ব্যবস্থাপক

সভায় সুযোগ্য সভ্যই জুটিবে না। সিবিল সার্বিসেও সম্ভবতঃ সমর্থ লোক মিলা ভার হইবে। কেহই আর সাম্রাজ্যের শাসনযন্ত্র ছুঁইতে চাহিবে না; সংহিতাকার ও শাসয়িতাভাবে শাসন-রশ্মি শিথিল হইয়া সাম্রাজ্য ধ্বংস হইবে না, তাহাই বা কে বলিবে! গবর্ণমেণ্টের প্রতি প্রজাসাধারণের বিশ্বাস থাকিবে না, সম্ভ্রম ও শঙ্কা টলিবে; কাজেই শক্তির হ্রাস হইবে; সুতরাং তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল,—ধ্বংসই বটে!

এক দিকে বৃটিশ পার্লামেণ্ট; অপর দিকে ভারত গবর্ণমেণ্ট; মধ্যস্থলে ষ্টেট সেক্রেটারী। এই সেক্রেটারীই হইয়াছেন, এক্ষেত্রে, যত সর্ব্বনাশের মূল। কিন্তু, এই সেক্রেটারী যথার্থই কি আমাদের সংহিতাকারদিগের স্বাধীনতাপহরণে প্রবৃত্ত? যতদূর দেখা যাইতেছে, তাহাতে কোনও প্রকারেই ত তাঁহার সেরূপ অসদভিসন্ধির লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয় না।

ভারতে রাজ-শক্তি শতসহস্র স্রোতে, শাখা এবং প্রশাখায় প্রবাহিত। সে শক্তির মূল প্রস্রবণ আদি কেন্দ্রস্থলে ব্যক্তিবিশেষ নহেন, বিরাট বৃটিশ পার্লামেণ্ট, অন্ততঃ ইহাই আমরা অবগত আছি। বিধি ব্যবস্থা ব্যবহারও ইহার বিরোধী নয়। অতএব রাজ-শক্তির আদিকেন্দ্রস্থল বৃটিশ পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃক, সে শক্তির সঞ্চালন, সংযম বা সম্প্রসারণ অন্যায় ও অসঙ্গত বলিতে পারি না। ষ্টেট সেক্রেটারী বৃটিশ পার্লামেণ্টের আদেশ, ইচ্ছা ও অবলম্বিত নীতি অনুধাবন করিয়া ভারতশাসন সম্বন্ধে, প্রধান প্রধান বিষয়ে রাজপ্রতিনিধির সমীপে পরামর্শ প্রেরণ করেন। অন্ততঃ লর্ড এলগিন নিজেই, একথা বলিয়াছেন; এবং তাঁহার কথা সমূলক নহে, এমন অনুমান করার কিছুমাত্র কারণও নাই। অতএব ষ্টেটসেক্রেটারীর উপর দোষারোপ করা অনর্থক। তিনি পার্লামেণ্টেরই শক্তি সঞ্চালন করেন; নিজে কোনও

অভিনব নীতি সংগঠন করিয়া পাঠান না; পুরাতন নীতিরও পরিবর্ত্তন করেন না। অতএব অপক্ষপাত বিচার করিলে, এ বিষয়ে তাঁহাকে "বেকসুর" খালাসই দিতে হয়। তিনি তফাৎ হইলে অবশিষ্ট থাকে বৃটিশ পার্লামেণ্ট ও আমাদের ব্যবস্থাপক সভা। সভা কি সত্য সত্যই পার্লামেণ্টকেও প্রত্যাখ্যান করিতে প্রস্তুত? স্যর গ্রিফিথ্ ও মিঃ প্লেফেয়ারের প্রস্তাবে তাহাই বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু, পার্লমেণ্টকে উল্লঙ্ঘন করার এ অভিলাষ বা আবদার এ দেশীয় লোকেরা কখনই অনুমোদন করিতে পারে না। শাসনশক্তির শত শত তীক্ষ্ণ অঙ্কুশ বিদ্ধ হইয়া তাহাদের আর্ত্তনাদের একমাত্র আশ্রয়স্থল বৃটিশ পার্লামেণ্ট ও বৃটিশ প্রজা। অতএব শাসকই হউন আর ব্যবস্থাপকই হউন, পার্লামেণ্টের প্রভাব হইতে পৃথক হইয়া, ভারতশাসন ও ভারতীয় বিধি ব্যবস্থা প্রস্তুত করুন, এরূপ প্রস্তাবে এদেশীয়েরা কিছুতেই সায় দিতে পারে না। এ সম্বন্ধে মিঃ মেহতা ব্যবস্থাপক সভায় যাহা বলিয়াছেন, তাহাই এদেশীয় সমীচীন ব্যক্তি মাত্রের মত। হইতে পারে, অনেক সময়ে পার্লামেণ্ট হইতে অবিচার ও এ দেশীয় ব্যবস্থাপক সভা ও ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকটে সুবিচারের সম্ভাবনা আছে; কিন্তু তাহা সত্বেও পার্লা-মেণ্টের উপর, শেষ বিচারের জন্য, নির্ভর করা ভিন্ন উপায় নাই। পালিয়ামেণ্টীয় শাসন ও এঙ্গলোইণ্ডিয়ানের শাসন দুয়ের কোনও-টাই অবশ্য সম্যকরূপে নিরাপদ নহে; কেননা সময়ে সময়ে প্রবল স্বার্থ সংঘাতে সমূহ অমঙ্গলেরই সম্ভাবনা; পক্ষান্তরে এদেশীয়দিগের নিজের শাসনও এখন আকাশকুসুম অপেক্ষাও অসম্ভব; এরূপ হলে এঙ্গলোইণ্ডিয়ানের শাসন অপেক্ষা পার্লিমেণ্টের শাসনই আমাদের পক্ষে শ্রেয়; যেহেতু পার্লিমেণ্টের ও বৃটিশ প্রজা সাধা-রণের ন্যায়পরতা ও মতত্ত সাধারণতঃ অধিকতর বিশ্বসনীয়।

পুলিস্‌রেগুলেশন বিল।

এই বিলটি ১৮৬১ সালের ৫ আইন সংশোধনের পাণ্ডুলিপি। ইহার ১৫ ধারার লিখিত বিষয়টী সংশোধন সম্বন্ধেই সমস্যা। ঐ ধারার পূর্ব্ব মর্ম্মানুসারে নিয়ম ছিল এই যে, কোনও স্থানে বাদ বিসম্বাদ বা যে কোনও কারণেই হউক দাঙ্গা হাঙ্গাম হইয়া শান্তিভঙ্গ হইলে বা শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা থাকিলে, তথাকার শান্তি রক্ষার্থে অতিরিক্ত পুলিশ প্রহরী নিযুক্ত হইত এবং তাহার নির্ব্বাহার্থে স্থানীয় অধিবাসীদিগের উপর একটী কর সংস্থাপিত হইত। কর সংস্থাপিত হইত দোষী ও নির্দোষী নির্বিশেষে; দাঙ্গায় সংশ্লিষ্ট থাকুক বা না থাকুক স্থানীয় লোক মাত্রই সে কর দিতে আইনানুসারে বাধ্য হইত। কিন্তু, এরূপ আইন স্পষ্টতঃ অন্যায়। ইহা কখনই ন্যায়ানুমোদিত হইতে পারে না যে দোষীর সহিত নির্দ্দোষীও শাস্তি পাইবে।

নির্দ্দোষীর শাস্তি নিবারণ উপরোক্ত সংশোধনের উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য সাধনের উপায় উদ্ভাবন করা দুষ্কর। গবর্ণমেণ্ট যে উপায় অবলম্বন করিতে চাহেন তাহাতে দোষী ও নির্দোষী নির্ব্বাচনের ভার জিলার মাজিষ্টর ও জজদিগের উপর বিন্যস্ত হয়। জজ বা মাজিষ্টর ইহাদের যিনিই হউন স্থানীয় অবস্থা বুঝিয়া দোষী ও নির্দ্দোষী নির্ব্বাচনে ক্ষমবান হইবেন। সে ক্ষমতা পরিচালন করার দ্বারা দোষী ও নির্দোষী নিরাকরণ কল্পে, দস্তুরমত বিচার প্রণালী অবলম্বন করিয়া সাক্ষ্য প্রমাণাদি গ্রহণ ও উকিল মোক্তারের সোয়াল জবাব গ্রহণান্তে, রায় লিখিত হইবে না;—জজ বা মাজিষ্টর স্থানীয় অবস্থানুসারে যাহা স্থির করিবেন তাহাই হইবে। দস্তুরমত দেওয়ানী বিচার যখন হইবে না, তখন অবশ্য তাহার দেওয়ানী

আপিলও চলিবে না। তবে বিভাগীয় কমিসনরের উহাতে হাত থাকিবে।

গবর্ণমেণ্ট পক্ষের যুক্তি এই যে এরূপ স্থলে দস্তুরমত দেওয়ানী বিচার দ্বারা দোষী নির্দ্দোষী নিদ্ধারণ করা সুকঠিন; অথচ নির্দ্দোষীরও রক্ষা পাওয়া উচিত। শান্তি রক্ষা করিতে গবর্ণমেণ্ট স্বতঃ বাধ্য। শান্তিরক্ষার্থে, শান্তিভঙ্গের দণ্ডের জন্য দেওয়ানী বিচার সম্ভবে না। অতএব শাসন ও শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া নির্দ্দোষীদিগকে অব্যাহতি দিবার জন্য জিলার জজ ও মাজিষ্টরদিগকে যে অধিকার দেওয়া হইতেছে ইহাই প্রচুর। পূর্ব্বে দোষী ও নির্দ্দোষী দেশসুদ্ধ লোকেরই দণ্ড হইত, এখন অন্ততঃ কতক লোকওত রক্ষা পাইবে। নির্দ্দোষী মাত্রই পরিত্রাণ না পাউক তাহাদের কতকও ত পাইবে। সংশোধিত আইন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর না হইলেও উহা মন্দের ভাল। বিশেষতঃ এ আইন দণ্ড দিবার জন্য নয়, দাঙ্গা নিবারণই ইহার উদ্দেশ্য। গবর্ণমেণ্টের যুক্তি এই।

অপর পক্ষের কথা এই, যে, শান্তিভঙ্গের আশঙ্কাস্থলে যখন দোষী নির্দ্দোষী সকলেরই উপর পুলিসের ব্যয়ভার স্থাপন করা হয় তখন বস্তুতঃ কাহাকেও বিশেষ করিয়া দোষী করা হয় না। ইহাতে কেবল স্থানীয় লোকের পরে শান্তির ট্যাক্স বসান হয় মাত্র। পরন্তু নূতন নিয়মে ব্যক্তিবিশেষদের প্রতি বিনা বিচারে অপরাধের কলঙ্ক এবং দণ্ড আরোপ করিবার ক্ষমতা কর্ত্তৃপুরুষদের থাকিবে অথচ সে কলঙ্ক ক্ষালন করিবার কোন উপায় দণ্ডিত ব্যক্তিদিগকে দেওয়া হইবে না। বিচার হইবে না অথচ দোষী সাব্যস্ত হইবে।

যদি এ কথা বলা যায় যে, আইনমতে বিচার করিতে গেলে অনেক সময় প্রকৃত দোষী ধরা পড়ে না, অতএব কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগকে সকল সময়েই আইনের দ্বারা বাধ্য করা কর্ত্তব্য নহে, তবে

জিজ্ঞাস্য এই, শাসনপ্রণালীর মধ্যে এই ছিদ্রকে একবার স্থান দিলে কোথায় ইহার সীমা নির্ণয় হইবে? বিচারকেরা যে মনুষ্য-স্বভাবের দুর্ব্বলতাবশতঃ পক্ষপাত করিতে পারেন সে সকল কথা আমরা দূরে রাখিতেছি—স্থূল কথা এই যে, আবশ্যক বুঝিয়া ট্যাক্স বসাইতে গবর্মেণ্টের অধিকার আছে; কিন্তু বিনা বিচারে দোষী করিতে এবং কোন ব্যক্তিকে আপন দোষক্ষালনের অধিকার না দিতে গবর্মেণ্টের ন্যায্য অধিকার নাই। ম্যাজিষ্ট্রেট যদি স্থানীয় অভিজ্ঞতাবশতঃ সর্ব্বজ্ঞ হইয়া থাকেন তবে শান্তিভঙ্গের আয়োজন জন্য চেষ্টা কেন অন্য অপরাধেরও আন্দাজমত খেয়ালমত বিচারের ভার তাঁহার উপর দেওয়া উচিত।

ভারতবর্ষীয় প্রকৃতি।

জর্ম্মান্ অধ্যাপক ওল্‌ডেন্‌বার্গ্‌ বুদ্ধের যে জীবনচরিত লিখিয়াছেন, তাহা ইংরাজিতে অনুবাদিত হইয়াছে এবং সেই সূত্রে তাঁহার বাঙ্গালী পাঠকদিগের নিকট পরিচিত হইয়াছে। সম্প্রতি তিনি জর্ম্মন ভাষায় বেদের ধর্ম্ম নামক এক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা তাহার অনুবাদের প্রতীক্ষা করিয়া আছি।

মনিষ্ট্‌ নামক অ্যামেরিকান্ পত্রিকায় সমালোচনাস্থলে এই গ্রন্থের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, নিম্নে তাহা সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

আধুনিক হিন্দুগণ আপনাদের শান্তিপ্রিয় নির্দ্বন্দ্ব প্রকৃতিকে শ্রেষ্ঠতার লক্ষণ বলিয়া গর্ব্ব করে, কিন্তু অধ্যাপক বলেন ইহা তাহাদের দুর্ব্বলতার লক্ষণ। যে সকল মহা দ্বন্দ্ব সংঘর্ষে য়ুরোপীয় জাতি বলিষ্ঠ পৌরুষ লাভ করিয়াছেন,—ইরাণীদের সহিত বিচ্ছেদের পর ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া অবধি ভারতবাসী আর্য্যগণ সেই সকল প্রবল দ্বন্দ্ব হইতে বঞ্চিত হইয়া ক্রমশই শিথিলবল হইয়াছেন।

এই ফলশস্যশালী নূতন নিবাসের নিস্তব্ধতার মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ আদিম অসভ্য জাতির সহিত একত্র অবস্থান করিয়া তাঁহাদের হিন্দুত্ব ক্রমশই প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছিল। একে ত শীত দেশ হইতে আসিয়া এখানকার আবহাওয়ায় তাঁহাদের অনেকটা নিস্তেজ করিয়াছিল, তাহার পরে অসমকক্ষ অসভ্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের সহিত সহজ সংগ্রামে জয় লাভ পূর্ব্বক উর্ব্বরা বসুন্ধরা নির্বাধে ভোগ করিয়া তাঁহাদের চরিত্রে পুরুষোচিত কাঠিন্যের অভাব জন্মিতে লাগিল। তাঁহাদের জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চ্চার মধ্যে সেই কঠিন প্রয়াসের সুকঠোর সংঘাত ছিল না, যদ্দ্বারা বাস্তব জগতের গভীরতা ভেদ করিয়া সফলকাম হইয়া চিন্তারাজ্যের ভূমানন্দলোকে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। অতি অনায়াসেই তাঁহারা বস্তুজগতের উপরিতলে সত্যের সহিত কল্পনা, সুন্দরের সহিত অদ্ভুত, বিবিধ নবতর আকারে জড়িত মিশ্রিত করিয়া বিচিত্র চিত্রজাল রচনা করিয়াছিলেন।

ওল্‌ডেন্‌বর্গের মত উদ্ধৃত করিয়া সমালোচক তাঁহার হিন্দু বন্ধুবর্গকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিয়াছেন উপরিউক্ত কথাগুলি চিন্তা করিয়া নিজেদের প্রকৃত অবস্থা অনুধাবন করিয়া দেখিলে আত্মো-ন্নতি সাধনের যথার্থ উপায় নির্ণয় হইতে পারে। তিনি বলেন, যে সকল প্রাকৃতিক অবস্থাবশতঃ হিন্দুরা অবসর এবং স্বচ্ছলতা লাভ করিয়াছিলেন সেই সকল অবস্থাগতিকেই তাঁহাদের অনু-ষ্ঠান এবং চিন্তাপ্রণালী এমন কৃত্রিমতা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাঁহাদের বুদ্ধি স্বেচ্ছাচারিণী কল্পনাকে সঙ্গে লইয়া বড় বড় রহস্যময় প্রহে-লিকার সহিত স্বচ্ছন্দে ক্রীড়া করিতে ভালবাসিয়াছে—একদিকে তাঁহারা ধর্ম্ম এবং দর্শনের উচ্চতম শ্রেষ্ঠতম ভাবের মঞ্জরী বিকশিত করিয়া তুলিয়াছেন, অপরদিকে তাঁহাদের থিওরিগুলি বাস্তবতথ্যের সহিত একেবারে অসম্বদ্ধ রহিয়া গিয়াছে। যদি ইহা সত্য হয়,

যে, ভারতবর্ষের উন্নতি এক সময় মাঝখানে আসিয়া অবরুদ্ধ হইয়াছে, এবং তরুণতর পাশ্চাত্য সভ্যতা, বলে বুদ্ধিতে বিজ্ঞানে তাহাকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, তবে, দৈবাগত ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে তাহার কারণ অন্বেষণ করিতে গেলে ভ্রমে পতিত হইতে হইবে; তাহার প্রকৃত কারণ, বিচারের, বিশেষতঃ আত্মবিচারের অভাব (lack of criticsm, and especialy of self criticism)। পাশ্চাত্যজাতির মধ্যে এই বিচার এবং আত্মবিচারের প্রবৃত্তি নানা উৎপাৎ, প্রতিযোগিতা এবং দ্বন্দ্ব সংঘর্ষের দ্বারা সঞ্জাত হইয়াছে। হিন্দুদিগকে সর্ব্বদা এই কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, উন্নতি অর্থে দ্বন্দ্ব;—তাঁহাদিগকে বলিষ্ঠ এবং কার্য্যতৎপর হইতে হইবে, বাস্তব সত্যের ঘনিষ্ঠ সংশ্রবে তাঁহাদিগকে শক্ত হইয়া উঠিতে হইবে। ভারতবর্ষের নিকট, তাহার প্রাচীন আচার্য্যদের নিকট, পাশ্চাত্য জাতি অনেক শিক্ষা লাভ করিয়াছে এক্ষণে পাশ্চাত্যজাতির নিকট ভারতবর্ষের শিক্ষা লাভ করিবার সময় আসিয়াছে; কি বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিবার সময় আসিয়াছে; কি বিষয়ে শিক্ষালাভ করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে কাহারও দ্বিমত থাকিতে পারে না;—তাহা আর কিছু নহে, বৈজ্ঞানিক প্রণালীর কঠিন যাথাযথ্য (exactness)। এই শিক্ষা করিতে হইবে যে, পরীক্ষাসিদ্ধ অভিজ্ঞতাই সত্যের চরম মানদণ্ড, ধ্যানলব্ধ কল্পনা নহে। (The ultimate criterion of Truth is not apriori speculation, but experience; not subjective thought, but objective reality,)

সমালোচক মহাশয়ের উপদেশে অনেক কথা আছে যাহাতে আমাদের দন্তে আঘাত লাগিতে পারে, কিন্তু ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে ক্রমাগত আত্মশ্লাঘাদ্বারা নিশ্চেষ্ট অহঙ্কারে পরিস্ফীত হইয়া

ওঠাকে মহত্ত্বলাভ বলে না। যে সকল কঠিন আঘাতে আমাদিগকে যথার্থ পৌরুষ দান করে, যাহা অপর্য্যাপ্ত অতি মিষ্ট তরল স্তুতিরসে অহরহ আমাদের আকণ্ঠ পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছে তাহা আমাদিগকে সাংঘাতিক অন্ধস্নেহে নিরুদ্যম জড়ত্বের দিকে, সর্ব্বপ্রকার শৈথিল্যের দিকে কোমল আলিঙ্গনপাশে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতেছে; তাহার মায়া ছেদন করিতে না পারিলে আমাদের নিস্তার নাই।

ধর্ম্মপ্রচার।

হিন্দু কখনও ধর্ম্মপ্রচার করিতে বাহির হয় নাই। কিন্তু কালের গতিকে হিন্দুকেও বিদেশে স্বধর্ম্মের জয়ঘোষণা করিতে বাহির করিয়াছে। সম্প্রতি আটলাণ্টিক পার হইয়া হিন্দু আপন ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করিয়া আসিয়াছে এবং সেই নব ধরাতলবাসীগণ আমাদের প্রাচীন ধরাতলের পুরাতন কথা শুনিয়া পরিতৃপ্তি প্রকাশ করিয়াছে। ইহাতে উভয় জাতিরই গৌরবের কথা। পুরুষানুক্রমে এবং শৈশবকাল হইতেই যে সকল সংস্কারের মধ্যে বর্দ্ধিত হওয়া যায়, তাহার বাহিরের কথা, এমন কি, বিরোধী কথা, ধৈর্য্যের সহিত ও শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করা বড় কঠিন। ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমরা ত আপনাদিগকে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উদার বলিয়াই জানি, কিন্তু সংস্কার-বিরোধী কথা আমরা তিলার্দ্ধ পরিমাণও সহ্য করিতে পারি না। অ্যামেরিকা যেরূপ অনুরাগসহকারে বিদেশীর মুখ হইতে হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্ম ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়াছে তাহাতে এই প্রমাণ হয়, যে, তাহাদের জাতীয় প্রকৃতির মধ্যে সেই জীবনীশক্তি আছে যাহার প্রধান লক্ষণ, দান করিবার শক্তি এবং গ্রহণ করিবার শক্তি।

যাহা হউক্, আমরা যে আমাদের ধর্ম্মের সত্য প্রচার করিবার জন্য পল্লী ছাড়িয়া বাহির হইয়াছি ইহা আমাদের নবজীবনের লক্ষণ। এই উপলক্ষ্যে নানা মতের সহিত রীতিমত সংঘর্ষ প্রাপ্ত হইয়া, সকল বিরোধের সহিত যুদ্ধ করিয়া, সকল আপত্তি খণ্ডন পূর্ব্বক যখন নিজের ধর্ম্মকে সকলের ধর্ম্ম করিয়া তুলিতে পারিব, তখনই প্রকৃত উদারতা লাভ করিব; এখন আমরা যাহাকে উদারতা বলিয়া থাকি, তাহা ঔদাসীন্য, তাহা সকল অনুদারতার অধম।

সম্প্রতি ন্যুইয়র্ক নগরের নাইন্‌টীন্থ সেঞ্চুরি ক্লাবে বিশপ্ থোবর্ণ্ এবং বীরচাঁদ গন্ধী নামক বোম্বাইবাসী জৈনধর্ম্মাবলম্বী ব্যারিষ্টারের মধ্যে "ভারতবর্ষে ক্রিশ্চান্ মিশন্" সম্বন্ধে তর্ক হয়;—ডাক্তর পল্ কেরস্ মধ্যস্থ থাকেন। থোবর্ণ্, মিশনের হিতকারীতা, এবং বীরচাঁদ, তাহার অনুপযোগিতা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন। মধ্যস্থ কেরস্ সাহেব যাহা বলেন তাহার মধ্যে আমাদের প্রণিধান যোগ্য অনেক কথা আছে।

তিনি বলেন, যথার্থ দৃঢ় বিশ্বাস থাকিলে প্রচার কার্য্য অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। যে ধর্ম্মে বিশ্বাস করি সে ধর্ম্ম প্রচার করিতে বিরত হওয়াকে অপক্ষপাত বলে না, তাহাতে ঔদাসীন্য, এবং প্রকৃত বিশ্বাসের অভাব প্রকাশ পায়।

আধ্যাত্মিক বিষয়েও প্রতিযোগিতার আবশ্যক, কারণ, প্রতিযোগিতা উন্নতির প্রধান সহায়। ভিন্ন ভিন্ন মতের সংঘর্ষ উপস্থিত না হইলে কখনই সত্যের বিশুদ্ধতা ও উজ্জ্বলতা রক্ষিত হয় না। তিনি বলেন, অখৃষ্টানদের নিকট ধর্ম্মপ্রচার করিতে গিয়া খৃষ্টধর্ম্ম আপন সঙ্কীর্ণতা পরিহার করিয়া উত্তরোত্তর প্রশস্ত হইয়া উঠে। অনেক সময় পরধর্ম্মের ছিদ্র অন্বেষণ করিতে গিয়া নিজধর্ম্মের ছিদ্র বাহির হইয়া পড়ে। তাহার একটি উদা-

হরণ দেখাইয়াছেন। স্পেন্স্ হার্ডি নামক মিশনারির নাম অনেকে অবগত আছেন। তিনি বুদ্ধধর্ম্মসম্বন্ধে অনেক রচনা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থের একস্থলে আছে, বুদ্ধ নিজের ও অন্যের পূর্ব্বজন্ম সম্বন্ধে যে সকল তথ্য বলিয়াছেন তাহা প্রতারণা মাত্র। কারণ, বুদ্ধ বস্তুতই যদি অতি প্রাচীনকালে পৃথিবীতে জন্ম-গ্রহণ করিয়া থাকেন, তবে বিজ্ঞানে যে সকল লুপ্তবংশ প্রাচীন জীবজন্তুর বিবরণ আছে, বুদ্ধের পূর্ব্বজন্মের ইতিহাসে তাহাদের উল্লেখ থাকিত। পৃথিবীকে গোল না বলিয়া সমতল বলাতে বৌদ্ধ সাধুগণকে হার্ডি সাহেব নিন্দা করিয়াছেন। এবং বুদ্ধ যে সকল অলৌকিক কার্য্য করিয়াছিলেন বলিয়া জনশ্রুতি আছে সেগুলি হার্ডিসাহেবের মতে এত অবিশ্বাস্য, যে, তাহা গম্ভীর ভাবে প্রতি-বাদের যোগ্যই নহে।

কেরস্ সাহেব বলেন,হার্ডি সাহেবের এই সকল নিন্দাবাদ শুনিবা মাত্র মনে উদয় হয় যে, খৃষ্টের প্রতিও এ সকল কথার প্রয়োগ হইতে পারে। খৃষ্ট বলেন তিনি এব্রাহামের পূর্ব্বেও ছিলেন অথচ ম্যামথ্ কিম্বা টেরোড্যাক্টিল্ জন্তুর কোনরূপ উল্লেখ করেন নাই। জলের উপর দিয়া বুদ্ধের গমন যদি অসম্ভব হয় তবে খৃষ্টের গমনই বা কেন সম্ভব হইবে? পৃথিবীর সমতলতা সম্বন্ধে হার্ডিসাহেবের মৌন থাকাই শ্রেয় ছিল, কারণ খৃষ্টানদের হাতে গ্যালিলিয়োর কিরূপ লাঞ্ছনা হইয়াছিল তাহা সকলেই অবগত আছে।

অতঃপর কেরস্ সাহেব বলিতেছেন, কিছুকাল হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম পাশ্চাত্য মনের প্রতি আপন প্রভাব বিস্তার করিয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু এধর্ম্মকে যুরোপে কে আনয়ন করিল? স্পেন্স হার্ডি প্রভৃতি মিশনারিগণ। তাহারা বৌদ্ধধর্ম্মের দেশে বৌদ্ধধর্ম্মকে বিনাশ করিতে গিয়া খৃষ্টধর্ম্মের দেশে বৌদ্ধধর্ম্মকে আনিয়া উপস্থিত

করিয়াছে এবং যদিচ বৌদ্ধপ্রচারক পাশ্চাত্য দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিতে যায় নাই তথাপি খৃষ্টান প্রচারক সেই অভাব পূরণ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের সাহায্যে খৃষ্টধর্ম্মকে প্রশস্ত করিয়া তুলিতেছে।

কেরস্ সাহেবের এই সকল উক্তির মধ্যে আমাদের গর্ব্বানুভব করিবার উপযোগী যে অংশ আছে তাহা আমাদের কাহারও চক্ষু এড়াইবে না, সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। ভারতবর্ষের নিকট হইতে শিক্ষালাভ করিয়া খৃষ্টানগণ নিজধর্ম্মের উন্নতি সাধন করিতে-ছেন ইহা শুনিবামাত্র আমাদের ক্ষুদ্রবক্ষ স্ফীত হইয়া উঠিবে, কিন্তু কেরস্ সাহেবের উক্তির মধ্যে আমাদের শিক্ষা করিবার যে বিষয় আছে তাহা সম্ভবতঃ আমাদের নিকট সমাদর প্রাপ্ত হইবে না। প্রকৃত কথা এই যে, হিন্দুগণ ঘরে বলিয়া আপনাদের ধর্ম্ম এবং আপনাদের প্রকৃতিকে যত উদার বলিয়া মনে করে তাহা তাঁহাদের কল্পনামাত্র হইতে পারে। যতক্ষণ না প্রকৃত জগৎ রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন ততক্ষণ তাঁহারা যাহাকে সত্য বলিয়া মনে করিতেছেন তাহা প্রকৃত সত্য কি, তাঁহাদের সংস্কার মাত্র তাহার প্রমাণ হইবে না। মিথ্যার সহিত যখন হাতে হাতে সংগ্রাম বাধে তখনই সত্যের প্রভাব প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে। আমরা নিজে জানি না আমাদের ধর্ম্ম কতখানি সত্য; কারণ, সে সত্যের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, সে সত্যকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া আমরা মিথ্যার বিরুদ্ধে অগ্রসর হই না; আমরা আপন ধর্ম্মকে আচ্ছাদন করিয়া রাখি; আমরা বলি হিন্দুর ধর্ম্ম কেবল হিন্দুরই; অর্থাৎ হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে যে সত্য আছে সে সত্য অন্যত্র সত্য নহে; অতএব সকল ক্ষেত্রেই তাহাকে উপস্থিত করিয়া তাহার সত্যতা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার প্রয়োজন নাই; কেবল হিন্দুর বিশ্বাসের উপরেই তাহাকে স্থাপিত করিয়া রাখিতে হইবে।

হিন্দুমতে স্বগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ; বৈজ্ঞানিকেরাও বলেন, স্বগোত্রে বিবাহ প্রচলিত হইলে বংশানুক্রমে নানা রোগ, পঙ্গুতা, এবং মানসিক বিকার বদ্ধমূল হইয়া যায়। ধর্ম্মমত সম্বন্ধেও একথা খাটে। যে ধর্ম্ম বহুকাল অবধি অন্য ধর্ম্মের সহিত সমস্ত সংস্পর্শ সযত্নে পরিহার করিয়া কেবল নিজের গণ্ডীর মধ্যে বদ্ধ হইয়া উপ-ধর্ম্ম সৃজন দ্বারা বংশবৃদ্ধি করিতে থাকে, তাহার বংশে উত্তরোত্তর নানাজাতীয় বিকার ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইয়া উঠে। মুসলমানধর্ম্মের সংস্রববশতঃ ভারতবর্ষের নানাস্থানে হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে অনেক বিপ্লবের লক্ষণ দেখা দিয়াছিল; এবং আধুনিক বৈষ্ণবধর্ম্মের মধ্যেও মুসলমান ধর্ম্মের প্রভাব কতটা আছে তাহা আলোচনা করিয়া দেখিবার যোগ্য। বঙ্কিম যদিচ পাশ্চাত্যদের প্রতি বহুল অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছেন তথাপি তাঁহার কৃষ্ণচরিত্র যিনি মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিয়া দেখিবেন তিনি দেখিতে পাইবেন খৃষ্টধর্ম্মের সাহায্য ব্যতীত এ গ্রন্থ কদাচ রচিত হইতে পারিত না। অনেকের নিকট তাহা কৃষ্ণচরিত্রের অগৌরবের বিষয় বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারে। আমরা বলি ইহা তাহার প্রধান গৌরব। বঙ্কিম খৃষ্টধর্ম্মের আলোকে হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্মনিহিত সত্যকে উজ্জ্বল করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষা দ্বারা হিন্দুধর্ম্মের কৃত্রিম সঙ্কীর্ণতা ছেদন করিয়াছেন এবং সেই উপায়েই ইহার যথার্থ মাহাত্ম্যকে বাধামুক্ত করিয়া সর্ব্বদেশকালের উপযোগী করিয়া অসঙ্কোচে সগর্ব্বে জগতের সমক্ষে প্রকাশিত করিয়াছেন। বিশুদ্ধ সত্যের উপর কদাচ জাতিবিশেষের শিলমোহরের ছাপ পড়ে না—যেখানে ছাপ পড়ে নিশ্চয় সেখানে খাদ আছে।

গ্রন্থ সমালোচনা।

দেওয়ান গোবিন্দরাম বা দুর্গোৎসব। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সাধু কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

গ্রন্থখানি একটি রীতিমত উপন্যাস। লেখক আয়োজনের ত্রুটি করেন নাই। ইহাতে ভীষণ অন্ধকার রাত্রি, ঘন অরণ্য, দস্যু, পাতালপুরী, ছদ্মবেশিনী সাধ্বীস্ত্রী, কপটাচারী পাষণ্ড এবং সর্ব্ব বিপৎলঙ্ঘনকারী ভাগ্যবান্ সাহসী সাধু পুরুষ প্রভৃতি পাঠক ভুলাইবার বিচিত্র উপকরণ আছে। গ্রন্থখানির উদ্দেশ্যও সাধু; ইহাতে অনেক সদুপদেশ আছে এবং গ্রন্থের পরিণামে পাপের পতন ও পুণ্যের জয় প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত এ কথা একবারও ভুলিতে পারি নাই, যে, গ্রন্থকার পাঠককে ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছেন। দেওয়ানজি হইতে উজ্জলা পর্য্যন্ত কেহই সত্যকার সজীব মানুষের মত হয় নাই, তাহারা যে সকল কথা কয় তাহার মধ্যে সর্ব্বদাই লেখকের প্রম্প্‌টিং শুনা যায় এবং ঘটনাগুলির মধ্যে যদিও সম্ভবতা আছে কিন্তু অবশ্যসম্ভাব্যতা নাই। এইখানে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া রাখা আবশ্যক, যে, উপন্যাসের সম্ভব অসম্ভব সম্বন্ধে আমাদের কোন প্রকার বাঁধা মত নাই। লেখক আমাদের বিশ্বাস জন্মাইতে পারিলেই হইল, তা ঘটনা যতই অসম্ভব হউক্। অনেক রচনায় সুসম্ভব জিনিষও নিজেকে সপ্রমাণ করিয়া উঠিতে পারে না, আবার, অনেক রচনায় অসম্ভব ব্যাপারও চিরসত্যরূপে স্থায়ী হইয়া যায়। "মণ্টেক্রিষ্টো" উপন্যাসবর্ণিত ঘটনা প্রাকৃত জগতে সম্ভবপর নহে কিন্তু "ডুমা"র প্রতিভা তাহাকে সাহিত্যজগতে সত্য করিয়া রাখিয়াছে। কপালকুণ্ডলাকে বঙ্কিমের

কল্পনা সত্য করিয়া তুলিয়াছে কিন্তু হয় ত নিকৃষ্ট লেখকের হাতে এই গ্রন্থ নিতান্ত অবিশ্বাস্য হাস্যকর হইয়া উঠিতে পারিত।

গ্রন্থখানি পড়িয়া বোধ হইল, যে, যদিচ ঘটনা সংস্থান এবং চরিত্র রচনায় গ্রন্থকার কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই তথাপি গ্রন্থবর্ণিত কালের একটা সাময়িক অবস্থা কতক পরিমাণে মনের মধ্যে জাগ্রত করিতে পারিয়াছেন। তখনকার সেই খাল বিল মাঠের ভিতরকার ডাকাতী, এবং দস্যুবৃত্তিতে সম্ভ্রান্ত লোকদিগের গোপন সহায়তা প্রভৃতি অনেক বিষয় বেশ সত্যভাবে অঙ্কিত হইয়াছে; মনে হয় লেখক এ সকল বিষয়ে অনেক বিবরণ ভাল করিয়া জানেন; কোমর বাঁধিয়া আগাগোড়া বানাইতে বসেন নাই।

মনোরমা। শ্রীকুমারকৃষ্ণ মিত্র প্রণীত।

গ্রন্থখানি দুই ফর্ম্মায় সমাপ্ত একটি ক্ষুদ্র উপন্যাস। আরম্ভ হইয়াছে "রাত্রি দ্বিপ্রহর। চারিদিক নিস্তব্ধ। প্রকৃতিদেবী অন্ধকার সাজে সজ্জিত হইয়া গম্ভীরভাবে অধিষ্ঠিতা।" শেষ হইয়াছে "হায়! সামান্য ভুলের জন্য কি না সংঘটিত হইতে পারে!" ইহা হইতে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন, গ্রন্থখানি ক্ষুদ্র, ভুলটিও সামান্য কিন্তু ব্যাপারটি খুব গুরুতর।

কৌতুকপ্রিয় সমালোচক হইলে বলিতেন, "গ্রন্থখানির মধ্যে শেক্‌সপিয়ার হইতে উদ্ধৃত কোটেশন্‌গুলি অতিশয় সুপাঠ্য হইয়াছে" এবং অবশিষ্ট অংশসম্বন্ধে নীরব থাকিতেন। কিন্তু গ্রন্থ সমালোচনায় সকল সময়ে কৌতুক করিবার প্রবৃত্তি হয় না। কারণ, এই কঠিন পৃথিবীতে যখন আর কিছু দিবার সাধ্য থাকে না তখন দুটো মিষ্ট কথা দিবার ক্ষমতা এবং অধিকার সকলেরই আছে, নাই কেবল সমালোচকের। একে ত যে গ্রন্থখানি সমালোচনা করিতে বসে তাহার মূল্যও তাহাকে দিতে হয় না, তাহার

উপরে সুলভ প্রিয়বাক্য দান করিবার অধিকার তাহাও বিধাতা তাহাকে সম্পূর্ণভাবে দেন নাই। এই জন্য, যখন কোন গ্রন্থের প্রতি প্রশংসাবাদ প্রয়োগ করিতে পারি না তখন আমরা আন্তরিক ব্যথা অনুভব করি। নিজের রচনাকে প্রশংসাযোগ্য মনে করা লেখকমাত্রেরই পক্ষে এত সাধারণ ও স্বাভাবিক, যে, সেই ভ্রমের প্রতি কঠোরতা প্রকাশ করিতে কোন লেখকের প্রবৃত্তি হওয়া উচিত হয় না। কিন্তু গ্রন্থকার যথার্থই বলিয়াছেন—হায়! সামান্য ভ্রমের জন্য কি না সংঘটিত হয়! অর্থব্যয়ও হয়, মনস্তাপও ঘটে।

সাধনা।

মুক্তির পথ।

মনুষ্যজাতির আদি পিতা ও আদি মাতা জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইয়া ধরাতলে পাপ দুঃখ ও মৃত্যু আনয়ন করেন, এইরূপ একটা কিংবদন্তী বহুদিন হইতে স্থলবিশেষে প্রচলিত আছে।

এই কিংবদন্তীর ভিতর হইতে একটা গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বাহির করিতে পারা যায়। জ্ঞান হইতে পাপের ও দুঃখের উৎপত্তি, অজ্ঞান অবস্থায় পাপ নাই, দুঃখ নাই, এই কথাটা জগতের অন্যতম বিভীষিকাময় সত্য।

স্থলান্তরে আবার ইহা হইতে বিসদৃশ আর একটা তত্ত্ব-কথা প্রচলিত আছে। জ্ঞান হইতে দুঃখের উৎপত্তি যেমন একটা প্রচলিত ধর্ম্মতত্ত্বের ভিত্তি, জ্ঞানের পূর্ণতায় দুঃখের বিনাশ সেইরূপ আর একটা ধর্ম্মতত্ত্বের মূল।

কোন্ কথাটা সম্পূর্ণ সত্য এখানে তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার প্রয়োজন নাই। উভয়েরই মূলেই কতকটা সত্য নিহিত আছে স্বীকার না করিলে চলে না।

তবে মানবজাতির অন্তর্গত দুইটা বড় বড় সম্প্রদায়কে এই দুই বাক্যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন সুখপন্থায় লইয়া গিয়াছে, ইহা একটা প্রকাণ্ড ঐতিহাসিক সত্য।

জ্ঞান হইতে দুঃখের উৎপত্তি হইয়াছে ; অতএব যোগেযাগে

ধরাতল হইতে জ্ঞানের অন্তর্দ্ধান সাধন করিতে পারিলেই বোধ করি দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করা যাইতে পারে। অন্ততঃ ন্যায়-শাস্ত্রের নির্দ্দিষ্ট প্রচলিত যুক্তির বলে এইরূপ সিদ্ধান্ত আসিয়া দাঁড়ায়। তবে দুর্ভাগ্যক্রমে জ্ঞানবৃক্ষের ফল ভোজন করিয়া এক-বার তাহার রসাস্বাদন ঘটিয়া গেলে, রসনাকে পুনরায় সেই রসা-ন্বেষণে নিবৃত্ত করা একরূপ অসাধ্য হইয়া উঠে। অতএব সেরূপ চেষ্টায় সহসা কোন ফল পাওয়া যায় না। পরন্তু সমগ্র ফার্মা-কোপিয়া অনুসন্ধান করিলে এমন কোন বমনকারক ভেষজে ব্যবস্থা দেখা যায় না, যাহার সাহায্যে মনুষ্যজাতির জঠর হইতে এই বিষময় খাদ্যকে একেবারে বাহির করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। তথাপি যখন দুঃখনিবৃত্তিই পরম পুরুষার্থ এবং সেই পরম পুরুষার্থ সাধনের উপায় বিধানই মানবজাতির হিতৈষী শিক্ষক-সম্প্রদায় ও গুরুমণ্ডলীর জীবনের একমাত্র ব্রত; তখন এই বিষ-পদার্থের বিরেচন বা উদ্গীরণের কোন সদুপায় বর্ত্তমান না থাকিলেও তাহার কুফল নিবারণের জন্য কোনরূপ প্রতিষেধক আণ্টিডোটের ব্যবস্থা এ পর্য্যন্ত না হইলে বড়ই বিস্ময়ের বিষয় হইত। বলা বাহুল্য মানবজাতির পরম হিতচিকীর্ষুগণের আবিষ্কৃত জ্ঞানতরুর বিষময় ফলের বিষত্ব-প্রতিষেধক ঔষধের ইংরাজি নাম faith, বাঙ্গালায় বুঝি ভক্তি।

ইংরাজি শব্দটার বাঙ্গালা তর্জ্জমায় ভক্তি শব্দ নিয়োগ করিতে গেলে একটু সাবধান হওয়া আবশ্যক। ইংরাজিতে আর একটি শব্দ আছে যাহা সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাবব্যঞ্জক, এই শব্দটি reverence। আমাদের দীনা বঙ্গভাষায় দুর্ভাগ্যক্রমে উভয় শব্দের পরিবর্ত্তেই ভক্তি শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

ভাস্বর মহিমার সম্মুখে আপনার ক্ষুদ্রতা লইয়া দণ্ডায়মান

হইলে, আনন্দ ও ভয় এই উভয়কে স্পর্শমাত্র করিয়া যে একটা মনোভাব উপস্থিত হয়, এবং যাহা সেই ক্ষুদ্রতাকে মহিমা হইতে দূরে লইয়া গিয়া স্বস্থানে অবস্থিত রাখে, অথচ সেই মহিমাকে কেন্দ্রীভূত করিয়া তাহার আকর্ষণে আকৃষ্ট ও তাহার দীপ্তিতে প্রদীপ্ত থাকিতে চায়, সেই মনোভাবকে ভক্তি বলা যায়; ইহারই ইংরাজি নাম reverence। মনুষ্যের মধ্যে যখন এই সামগ্রীর একান্ত অভাব হয়, তখন ধরাখানা সরার মত হইয়া যায়, হিমাচল সমতলে পরিণত হয় ও চন্দ্র সূর্য্য দীপ্তিহীন নিষ্প্রভ হইয়া প্রকৃতির কান্তি মলিন হইয়া আসে। প্রার্থনা, মনুষ্যের ও প্রকৃতির সেই শোচনীয় অবস্থা ইতিহাসে বিলম্বিত হউক।

আর একটা অর্থে ভক্তি শব্দ কখন কখন ব্যবহৃত হয়, তাহারই ইংরাজি নাম faith। বাঙ্গালা ভাষায় এই প্রয়োগের উদাহরণ কোন কোন স্থানে পাওয়া যায়। একটা উদাহরণ অনেকের মুখস্থ থাকিবে;—ভক্তিতে পাইবে—তর্কে বহুদূর; অর্থাৎ কি না এমন কোন সামগ্রী বিশ্বজগতে বর্ত্তমান আছে বলিয়া তোমাকে বিশ্বাস করিতেই হইবে, মানবের সমগ্র বুদ্ধিবৃত্তি সমবেত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে যাহার অস্তিত্বের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদান করিতেছে। যে একমাত্র ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া মনুষ্য আপনার মর্য্যাদা ও মহত্ত্ব ও অস্তিত্ব অব্যাহত ও অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আসিতেছে ও এতাবৎ পর্য্যন্ত করালখর্পরধরা প্রকৃতির নির্ম্মম কবল হইতে আত্মরক্ষায় সমর্থ হইয়াছে সেই ভিত্তিভূমির মূল উৎপাটনের জন্য মানবজাতিকে নির্লজ্জভাবে অসঙ্কোচে আহ্বান করিতে কুণ্ঠিত হয় না, এমন ব্যক্তিবিশেষ বা সম্প্রদায়বিশেষ সংসারে বিরল নহে। মানবাত্মার প্রতি বিদ্রোহ সাধনে এই সকল ব্যক্তির বা সম্প্রদায়ের কিরূপ পুণ্য সঞ্চয় ঘটিতেছে তাহা ঠিক্ বলিতে পারি না; তবে সংসারের

বর্ত্তমান অবস্থায়, নিউটন তাঁহার কুক্কুরের প্রতি ঘটনাবিশেষে যে বাক্য প্রয়োগ করিয়া আপন মহামূল্য সম্পত্তির বিনাশজনিত মনঃক্ষোভ শান্ত করিয়াছিলেন, সেই বাক্যই অবজ্ঞার সহিত ও কৃপার সহিত ইহাদের প্রতি প্রয়োগ করিয়া নিরস্ত থাকিতে হয়।

এই সঙ্কীর্ণ সঙ্কুচিত ও হীন অর্থে ভক্তি শব্দের প্রয়োগ ভাষার মধ্যে থাকিতে পারে; কিন্তু আমরা সম্প্রতি উহার এইরূপ অপ-ব্যবহারে একান্ত কাতর। এবং ভক্তি শব্দ মহত্তর মনোবৃত্তির জন্য নির্দ্দিষ্ট রাখিয়া আমরা এই আত্মদ্রোহী ও জ্ঞাতিদ্রোহী বৃত্তির জন্য বিশ্বাস শব্দ ব্যবহার করিব।

প্রায় দুই হাজার বৎসর হইতে নরসমাজে এক সম্প্রদায় কোলা-হলরবে দিঙ্মণ্ডল পূর্ণ করিয়া চীৎকার করিয়া আসিতেছেন, জ্ঞান হইতে দুঃখের উৎপত্তি। অতএব মুক্তি চাও ত জ্ঞানমার্গ পরিহার করিয়া বিশ্বাসের পন্থা অবলম্বন কর। যদি পরমপুরুষার্থ লাভে তোমার বাঞ্ছা থাকে, তবে বুদ্ধিবৃত্তিকে নিরোধ কর ও জ্ঞানের অন্বেষণে ফিরিও না, ব্যক্তিবিশেষে ও বাক্যবিশেষে বিশ্বাস স্থাপনা করিয়া পরমানন্দে কাল যাপন কর। মুক্তি তোমার হস্তে।

বস্তুতই মানবের মত হতভাগ্য জীব দুনিয়ার মধ্যে দুর্লভ। মনুষ্য ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল; এবং চিরন্তন নিয়মমতে যে ক্ষুদ্র সে দুর্ভাগা; যে দুর্ব্বল সে দীন। তাহার অক্ষমতার কারণে সে পরের নিকট কৃপাভিক্ষার জন্য চিরকাল লালায়িত ও তাহার অসহায় পরমুখ-প্রেক্ষিতার ফলে চিরকাল ধরিয়া বিড়ম্বিত ও প্রতারিত। সামান্য একটা কল মেরামতের প্রয়োজন হইলে আমরা উপযুক্ত মিস্ত্রী অথবা কারিগরের সন্ধান করি; কিন্তু মানবদেহ নামক উৎকট রহস্যপূর্ণ যন্ত্রটা কোন অজ্ঞাত কারণে সহসা বিকল হইয়া পড়িলে

যে কোন হাতুড়ে ডাক্তার আমাদের নিকট ধন্বন্তরি বলিয়া গৃহীত হয়। ঠিক্ এই কারণেই সৃষ্টির প্রথমদিবস হইতে আজ পর্য্যন্ত মানবসন্তান প্রকৃতির হস্তে বিবিধ বিধানে লাঞ্ছিত হইয়া দুঃখ-যন্ত্রণায় ত্রাহিস্বরে ডাকিয়া আসিতেছে এবং যে কোন ব্যক্তি আপন মূর্খতা ও নির্ল্লজ্জতার উপর নির্ভর করিয়া আপনাকে এই সনাতন দুঃখব্যাধির একমাত্র অমোঘ ঔষধের একমাত্র আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া জাহির করিয়াছে, অন্ধ অসহায়ের মত তাহারই প্ররোচনায় ভ্রান্ত হইয়া তৎপ্রদত্ত কুপথ্য সেবন করিয়া পরিত্রাণের আশায় মুগ্ধ হইয়াছে।

অসভ্য জাতিবিশেষের মধ্যে তাহাদের সর্দ্দারের মৃত্যু হইলে তাহার শব সমাহিত করিবার সময় তাঁহার স্ত্রীপুত্র ভৃত্যাদি নিতান্ত অন্তরঙ্গগণকে বলিদান দিয়া প্রেতপুরুষের তৃপ্তির জন্য একত্র সমাধিদানের প্রথা প্রচলিত আছে, এবং এই প্রকার বিভীষিকা ও পৈশাচিকতা লইয়া ব্যঙ্গ বিদ্রূপ বক্তৃতার প্রথাও সভ্যতর সমাজে প্রচলিত আছে। কিন্তু সেই সকল সভ্যতর সমাজের মধ্যেও কল্পিত প্রেতমূর্ত্তির প্রসাদনের জন্য ডঙ্কা পিটাইয়া হর্ষোল্লাসের সহিত মানবাত্মার বলিদানের আয়োজন হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে কোন্ প্রথা অধিকতর ভয়াবহ তাহা আলোচনার বিষয়।

জ্ঞান হইতে দুঃখের উৎপত্তি হইয়াছে স্বচ্ছন্দে স্বীকার করিতে পারি ; কিন্তু সেই দুঃখবন্ধন হইতে মুক্তিলাভের জন্য জ্ঞানের আ-লোক ত্যাগ করিয়া অজ্ঞানের অন্ধকারে প্রবেশ করিতে হইবে, এইরূপ আদেশ নতশিরে বহন করিতে সুস্থ ও মোহমুক্ত মানবাত্মা নিশ্চয়ই অসম্মত হইবে। বলা বাহুল্য এই অসম্মতিই মানবাত্মার স্বাস্থ্যের ও অবিমুগ্ধতার একমাত্র পরিচয়।

জ্ঞানবর্জ্জিত বিশ্বাসে মুক্তি হয়, সৌভাগ্যক্রমে সর্ব্বত্র সর্ব্বজাতির

মধ্যে এই বাক্য প্রতিধ্বনিত হয় নাই। জ্ঞানে যাহার উৎপত্তি জ্ঞানের পূর্ণবিকাশই তাহার ধ্বংসের একমাত্র উপায় এই মত অন্যত্র প্রচারিত হইয়াছে। বলিবার প্রয়োজন নাই কোথায় কোন্ সময়ে এই মন্ত্র উচ্চারিত হইয়াছিল।

তবে জ্ঞানের পূর্ণতায় দুঃখের নিবৃত্তি প্রকৃতপক্ষে সম্ভব কি না আলোচ্য বিষয়। যতদূর দেখা যায় জ্ঞানের বিকারের সহিত দুঃখের আগ্রহ বাড়িয়া যায় বলিয়াই বোধ হয়। নানা ভাবে এই প্রশ্নের উত্তর দিবার চেষ্টা হইয়াছে।

এক সম্প্রদায় আছেন যাঁহারা পৃথিবীতে দুঃখের অস্তিত্ব একেবারে স্বীকার করিতে চাহেন না, তাঁহাদের সহিত কোন কথা কহা দুঃসাধ্য। মানব অনুভূতির তীব্রতম ও প্রধানতম বিষয়ই দুঃখ; ইহার অস্তিত্বে সন্দিহান হইলে নাচার। মনুষ্যবংশের অধিকাংশকেই ভূপৃষ্ঠে অবতীর্ণ হইয়া প্রায় পদে পদে যে প্রাণের প্রসারণবিরোধী, জীবনের শোণিতদোষী বাহ্যশক্তির সহিত সংগ্রাম করিয়া অগ্রসর হইতে হয়, ইহা নিত্যঘটনা ও প্রত্যক্ষ ব্যাপার। সংগ্রামে একটু শিথিলপ্রযত্ন হইলেই জীবন রক্ষা দুষ্কর হইয়া উঠে, এমন কি অটুট বিক্রমের সহিত যুদ্ধ চালাইলেও জীবনরক্ষা সকল সময়ে সাধ্য হয় না, ইহাও নিত্য প্রত্যক্ষ ঘটনা। ইহার দুঃখ নামকরণ করিতে না চাও সে স্বতন্ত্র কথা; ইহা আভিধানিক বিবাদের বিষয়; আমরা যাহাকে দুঃখ অভিধান দিতেছি, তাহার অভাবের প্রমাণ নহে।

তবে সাধারণতঃ এই দুঃখের অস্তিত্ব অস্বীকৃত হয় না এবং ইহার উৎপত্তির কারণ নানা ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

প্রাচীন জরথুস্ত্রপ্রবর্ত্তিত মতানুসারে বিশ্বজগতে দুই বিধাতা কার্য্য করিতেছে, একের কার্য্য পুণ্যবিধান, অপরের কার্য্য দুঃখ-

বিধান। শেষ পর্য্যন্ত বোধ করি পুণ্যবিধাতারই জয় এবং মনুষ্যের কর্ত্তব্য সেই পুণ্যবিধানে সাহায্যদান।

শেমিটিক সম্প্রদায়সকলেও এইরূপ দুই বিধাতার অস্তিত্ব স্বীকার করেন। সুখবিধাতার পরাক্রম দুঃখবিধাতার অপেক্ষা সর্ব্বতোভাবেই অধিক, এমন কি তিনি ইচ্ছা করিলে সমুদয় দুঃখের বিলোপ সাধনেও বোধ করি সমর্থ। তবে তাঁহার আদেশে অবহেলাই এই হতভাগ্য মনুষ্যজাতির প্রতি নিদারুণ ক্রোধের কারণ, এবং এই ক্রোধের ফলেই নির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত মনুষ্যকে তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপে দুঃখভোগ করিতে হইবে এই তাঁহার ব্যবস্থা ও আদেশ। আদিম পিতা-মাতার পাপে সমগ্র ভবিষ্যৎ সন্ততিবংশ কিরূপে নিগ্রহভাজন হইতে পারে, এবং পরম কারুণিকত্বের সহিত এই তীব্র ক্রোধ ও প্রতিহিংসার কিরূপে সামঞ্জস্য ঘটিতে পারে, তাহার কোন সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায় না। বোধ হয় ইহা জগদীশ্বরের কেবল খেয়ালমাত্র, অথবা রহস্যময় দুর্ভেদ্য জাগতিক নিয়মাবলীর অন্তর্গত একটা অন্যতর বিধানমাত্র। যাহাই হউক, প্রতিদ্বন্দ্বী দুঃখবিধাতা যে তাঁহার সাধের জগতে বাদ ঘটাইয়া অনর্থ ঘটাইতে সমর্থ হইয়াছে, ইহা তাঁহার একটু অদূরদৃষ্টি অসাবধানতার পরিচয় সন্দেহ নাই; তিনি ইহা প্রতীকারে সমর্থ ও প্রতীকার করিয়া দিবেন এই পর্য্যন্ত স্বীকার করা যায়। মানবজাতির আদি দম্পতীকে স্বাধীন ইচ্ছার সহিত অক্ষমতা প্রদান করিয়া কিরূপে তাঁহার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর ঈর্ষ্যাবৃত্তি পরিতৃপ্তির সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাও চিন্তার বিষয় হইতে পারে।

বস্তুতই বিধাতার করুণাময়ত্ব আরোপ করিয়া তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে দুঃখের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে গেলে বড়ই গোলযোগ

উপস্থিত হয়। সেই জন্য এই দুঃখের নানারূপ ব্যাখ্যা দিয়া দুঃখ-টাকে ঢাকিয়া ফেলিবার অথবা উড়াইয়া দিবার জন্য নানারূপ চেষ্টা হইয়াছে। মনুষ্যের ইচ্ছার স্বাধীনতা ঐরূপ একটা কল্পনা; কিন্তু এ কল্পনাটায় কোনরূপ উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয় না।

আর একরূপ ব্যাখ্যা আছে। দুঃখের পরিণতি পরম সুখ; বিশেষতঃ দুঃখের অভাব ঘটিলে সুখানুভূতির ব্যাঘাত ঘটিত, সেই জন্য শেষ পর্য্যন্ত সুখানুভূতির মাত্রা বাড়াইবার জন্য এই দুঃখের সৃষ্টি। চরমে পুণ্যলাভই এই দুঃখের অস্তিত্বের উদ্দেশ্য।

আজকাল যাঁহারা অভিব্যক্তিবাদকে ভিত্তি করিয়া দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনা করিতে বসেন, তাঁহারাও ঐরূপ একটা কথা বলিয়া মানবজাতিকে আশ্বস্ত করিতে চেষ্টা করেন। অভিব্যক্তির আর একটা নাম ক্রমোন্নতি বা ক্রমবিকাশ। সুতরাং অভিব্যক্তির ফলে উন্নতি ও দুঃখনাশ। কিন্তু মৃত্যুর ন্যায় মহাদুঃখজনক ব্যাপারটা যখন প্রত্যেক মনুষ্যের ও সমগ্র মানবকুলের সম্মুখে প্রতি মুহূর্ত্তে আপতনোন্মুখ হইয়া উপস্থিত রহিয়াছে ও তাহার হাত হইতে এড়াইবার কোন উপায় এ পর্য্যন্ত বিজ্ঞান বা দর্শনশাস্ত্র আবিষ্কার করিল না, তখন ঐরূপ চেষ্টা বৃথা।

ফলে দুঃখের সহিত সুখ আইসে, অবিমিশ্র দুঃখ জগতে নাই, একথাটা যেমন সত্য, সুখের সহিত দুঃখ আইসে, অবিমিশ্র সুখ জগতে নাই, এ কথাটাও তেমনি সত্য। ইহাতে সন্দেহ করিলে সত্যের অপলাপ হয়।

জ্ঞানের বৃদ্ধি দুঃখনাশের প্রয়াসমাত্র এই পর্য্যন্ত নিশ্চয় বলা যায়; কিন্তু জ্ঞানের বৃদ্ধিতে দুঃখের লোপ হইয়া সুখের পরিমাণ বাড়িবে একথা নির্দ্দেশ করিতে ইতস্তত করিতে হয়।

সুতরাং জ্ঞানের পূর্ণতায় মুক্তিলাভ ঘটিবে ইহার সত্যতা

সম্বন্ধে চারিদিক্ হইতে সংশয় আসিয়া উপস্থিত হয়। বোধ করি মানবজাতির এক প্রধান সম্প্রদায় এই কারণেই জ্ঞানের পন্থা পরিত্যাগ করিয়া অতি নিরুপায় হইয়া বিশ্বাসের মার্গ অবলম্বন করিয়াছে। তুমি বলিতেছ জ্ঞানবৃদ্ধি সহকারে দুঃখের হ্রাস হইবে, কিন্তু আমি প্রত্যক্ষ দেখিতেছি জ্ঞানের সহিত দুঃখের উৎপত্তি হইয়াছে ও জ্ঞানের প্রসার বৃদ্ধির সহিত উহার মাত্রা বাড়িয়া যাইতেছে, এরূপ স্থলে জ্ঞানের পূর্ণতায় দুঃখের নাশ কিরূপে মানিতে পারি ?

এই প্রশ্নের সঙ্গত উত্তর আছে কি না জানি না। তবে এই-রূপে একস্থলে ইহার উত্তর দেওয়া হইয়াছে।

তোমরা যাহাকে জ্ঞান বলিতেছ, প্রকৃত পক্ষে তাহা মায়া মোহ বা অজ্ঞান। এই অজ্ঞান হইতেই সৃষ্টি। তোমরা যাহাকে জ্ঞান বল, প্রকৃত পক্ষে যাহা অজ্ঞান বা ভ্রান্তি, তাহা যখন ছিল না, তখন এই জগতের উৎপত্তি হয় নাই। তখন এই জগৎ ছিল কি না ঠিক্ জানি না ; ছিল যদি সত্য হয়, কি ছিল, কি অবস্থায় ছিল, কি ভাবে ছিল, তাহা এখন বলিবার কোন উপায় দেখি না। তার পর হইতে এই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। এই জগতের উৎপত্তির সহিত দুঃখের উৎপত্তি ও সুখের উৎপত্তি হইয়াছে। সুখ দুঃখ উভয়ই এই জ্ঞাননামধারী অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন, উভয়ই একরকম বিকারের ফল, একই বিক্রিয়ার এপিঠ আর ওপিঠ। এ পিঠ হইতে দেখিলে যাহা সুখ, ও পিঠ হইতে দেখিলে তাহা দুঃখ। যদি কেবল অবিমিশ্র শুদ্ধ সুখ চাও তাহা হইলে তাহা তুমি কোথাও পাইবে না, যদি দুঃখ মাত্র চাও তাহাও কোথাও মিলিবে না। একখানা কটাহের এক পৃষ্ঠ যেমন কুব্জ ও অপর পৃষ্ঠ ন্যুব্জ, এই কুব্জত্ব লোপ করিতে গেলে ন্যুব্জত্ব যায়,আর ন্যুব্জত্ব দূর করিতে

গেলে কুব্জত্ব অন্তর্হিত হয়, আর একের, সুতরাং উভয়েরই লোপ হইলে কটাহের আর কটাহত্ব থাকে না, সেইরূপ অজ্ঞান বা ভ্রান্তি হইতে উদ্ভূত এই জগতের দুঃখভাগ লোপ করিতে গেলে সুখের ভাগ আপনা হইতে লোপ পাইয়া যায়, সুখভাগ লোপ করিতে গেলে দুঃখের ভাগও লোপ পায়, এবং সুখ দুঃখ লোপ করিতে গেলে জগতের আর অস্তিত্ব থাকে না। ভ্রান্তি হইতে ইহার উৎপত্তি এবং সেই ভ্রান্তি যতক্ষণ বর্ত্তমান থাকিবে ততক্ষণ সুখ দুঃখ পরিহারের চেষ্টা বৃথা জল্পনা।

জ্ঞানের পূর্ণতায় এই ভ্রান্তি অথবা অজ্ঞানের বিলোপ হইবার সম্ভব। তখন দুঃখ থাকিবে না সত্য, সেইরূপ তখন সুখও থাকিবে না, তখন এই ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ বিচিত্র সুখদুঃখের মূলীভূত সামগ্রী যে জগৎ, তাহারও অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে সন্দেহ নাই।

দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ মনুষ্যের বাঞ্ছনীয় হইতে পারে, তাহাতে আপত্তি নাই; কিন্তু দুঃখের পরিবর্ত্তে, দুঃখকে দূর করিয়া, তাহার স্থানে, সুখলাভের আশা নিতান্ত মূঢ়তা। সুতরাং মুক্তি অর্থে কেবল দুঃখ হইতে মুক্তি নহে, উহা সুখ হইতেও মুক্তি; উহা ভ্রান্তির পাশ হইতে মুক্তি, উহা জগতের বন্ধন হইতে মুক্তি। এই সুখদুঃখবিনির্ম্মুক্ত হইয়া যদি কখন মনুষ্য অবস্থান করিতে পারে তখনই তাহার পরম পুরুষার্থ সাধিত হইল।

ভারতবর্ষে সময়বিশেষে এইরূপ মুক্তিতত্ত্ব প্রচারিত হইয়াছিল। এই মুক্তিবাদ ভারতবর্ষে জনসমাজকে গঠিত, নিয়মিত ও চালিত করিয়াছিল। মনুষ্যের চিন্তা মনুষ্যকে যে পথে লইয়া যাইতে চায়, মনুষ্য সকল সময়ে সে পথে যায় না। প্রকৃতির পন্থার জটিলতায় জীবনের পন্থাও এত দুর্গম ও এত আঁধার, যে মনুষ্য পদে পদে মরীচিকাভ্রান্ত হইয়া বিপথে যায়। পদে পদে স্খলিত হইয়া

বিপন্ন হয়। ভারতবর্ষে মনুষ্যজাতির ভাগ্যে এই দার্শনিক তত্ত্ব প্রচারে কি সামাজিক ফল ঘটিয়াছে তাহা প্রবন্ধান্তরের আলোচ্য।

দিদি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পল্লীবাসিনী কোন এক হতভাগিনীর অন্যায়কারী অত্যাচারী স্বামীর দুষ্কৃতি সকল সবিস্তারে বর্ণন পূর্ব্বক প্রতিবেশিনী তারা অত্যন্ত সংক্ষেপে নিজের রায় প্রকাশ করিয়া কহিল এমন স্বামীর মুখে আগুন। শুনিয়া জয়গোপাল বাবুর স্ত্রী শশি অত্যন্ত পীড়া অনুভব করিলেন;—স্বামী-জাতির মুখে চুরটের আগুন ছাড়া অন্য কোন প্রকার আগুন কোন অবস্থাতেই কামনা করা স্ত্রীজাতিকে শোভা পায় না। অতএব এ সম্বন্ধে তিনি কিঞ্চিৎ সঙ্কোচ প্রকাশ করাতে কঠিন-হৃদয় তারা দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত কহিল এমন স্বামী থাকার চেয়ে সাতজন্ম বিধবা হওয়া ভাল। এই বলিয়া সে সভাভঙ্গ করিয়া চলিয়া গেল।

শশি মনে মনে কহিল, স্বামীর এমন কোন অপরাধ কল্পনা করিতে পারি না, যাহাতে তাঁহার প্রতি মনের ভাব এত কঠিন হইয়া উঠিতে পারে। এই কথা মনের মধ্যে আলোচনা করিতে করিতেই তাহার কোমল হৃদয়ের সমস্ত প্রীতিরস তাহার প্রবাসী স্বামীর অভিমুখে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল; শয্যাতলে তাহার স্বামী যে অংশে শয়ন করিত সেই অংশের উপর বাহু প্রসারণ করিয়া পড়িয়া শূন্য বালিশকে চুম্বন করিল, বালিশের মধ্যে স্বামীর মাথার

"মুক্তির পথ" প্রবন্ধের ভ্রমসংশোধন—৪০৯ পৃষ্ঠা ১৬ পংক্তি 'কম্পিত' স্থানে 'কল্পিত' হইবে, ৪১০ পৃষ্ঠা ১৪ পংক্তি 'শোণিতদোষী' স্থানে 'শোণিতশোষী' হইবে, ৪১১ পৃষ্ঠা ৬ পংক্তি 'আদেশে' না হইয়া 'আদেশের' হইবে।

আঘ্রাণ অনুভব করিল এবং দ্বার রুদ্ধ করিয়া কাঠের বাক্স হইতে স্বামীর একখানি বহুকালের লুপ্তপ্রায় ফোটোগ্রাফ এবং হাতের লেখা চিঠিগুলি বাহির করিয়া বসিল। সেদিনকার নিস্তব্ধ মধ্যাহ্ন এইরূপে নিভৃত কক্ষে, নির্জ্জন চিন্তায়, পুরাতন স্মৃতিতে এবং বিষাদের অশ্রুজলে কাটিয়া গেল।

শশিকলা এবং জয়গোপালের যে নবদাম্পত্য তাহা নহে। বাল্যকালে বিবাহ হইয়াছিল, ইতিমধ্যে সন্তানাদিও হইয়াছে। উভয়ে বহুকাল একত্র অবস্থান করিয়া নিতান্ত সহজ সাধারণ ভাবেই দিন কাটিয়াছে; কোন পক্ষেই অপরিমিত প্রেমোচ্ছ্বাসের কোন লক্ষণ দেখা যায় নাই। প্রায় ষোল বৎসর একাদিক্রমে অবিচ্ছেদে যাপন করিয়া হঠাৎ কর্ম্মবশে তাহার স্বামী বিদেশে চলিয়া যাওয়ার পর শশির মনে একটা প্রবল প্রেমাবেগ জাগ্রত হইয়া উঠিল। বিরহের দ্বারা বন্ধনে যতই টান পড়িল কোমল হৃদয়ে প্রেমের ফাঁশ ততই শক্ত করিয়া আঁটিয়া ধরিল; ঢিলা অবস্থায় যাহার অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারে নাই এখন তাহার বেদনা টন্‌টন্ করিতে লাগিল। তাই আজ এতদিন পরে এত বয়সে ছেলের মা হইয়া শশি বসন্তমধ্যাহ্নে নির্জ্জন ঘরে বিরহ-শয্যায় উন্মেষিতযৌবনা নববধূর সুখস্বপ্ন দেখিতে লাগিল। যে প্রেম অজ্ঞাতভাবে জীবনের সম্মুখ দিয়া প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে, সহসা আজ তাহারই কলগীতিশব্দে জাগ্রত হইয়া মনে মনে তাহারই উজান বাহিয়া দুই তীরে বহু দূরে অনেক সোনার পুরী অনেক কুঞ্জবন দেখিতে লাগিল;—কিন্তু সেই অতীত সুখসম্ভাবনার মধ্যে এখন আর পদার্পণ করিবার স্থান নাই। মনে করিতে লাগিল এইবার যখন স্বামীকে নিকটে পাইব তখন জীবনকে নীরস এবং বসন্তকে নিষ্ফল হইতে দিব না। কতদিন কতবার

তুচ্ছতর্কে সামান্য কলহে স্বামীর প্রতি সে উপদ্রব করিয়াছে আজ অনুতপ্ত চিত্তে একান্ত মনে সংকল্প করিল আর কখনই সে অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিবে না, স্বামীর ইচ্ছায় বাধা দিবে না, স্বামীর আদেশ পালন করিবে, প্রীতিপূর্ণ নম্রহৃদয়ে নীরবে স্বামীর ভালমন্দ সমস্ত আচরণ সহ্য করিবে; কারণ, স্বামী সর্ব্বস্ব, স্বামী প্রিয়তম. স্বামী দেবতা।

অনেকদিন পর্য্যন্ত শশিকলা তাহার পিতামাতার একমাত্র আদরের কন্যা ছিল। সেই জন্য, জয়গোপাল যদিও সামান্য চাকৃরি করিত, তবু ভবিষ্যতের জন্য তাহার কিছুমাত্র ভাবনা ছিল না। পল্লিগ্রামে রাজভোগে থাকিবার পক্ষে তাহার শ্বশুরের যথেষ্ট সম্পত্তি ছিল।

এমন সময় নিতান্ত অকালে প্রায় বৃদ্ধবয়সে শশিকলার পিতা কালীপ্রসন্নের একটি পুত্রসন্তান জন্মিল। সত্য কথা বলিতে কি, পিতামাতার এইরূপ অনপেক্ষিত অসঙ্গত অন্যায় আচরণে শশি মনে মনে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল; জয়গোপালও সবিশেষ প্রীতিলাভ করে নাই।

অধিক বয়সের ছেলেটির প্রতি পিতামাতার স্নেহ অত্যন্ত ঘনীভূত হইয়া উঠিল। এই নবাগত, ক্ষুদ্রকায়, স্তন্যপিপাসু, নিদ্রাতুর শ্যালকটি অজ্ঞাতসারে দুই দুর্ব্বল হস্তের অতি ক্ষুদ্র বদ্ধমুষ্টির মধ্যে জয়গোপালের সমস্ত আশা ভরসা যখন অপহরণ করিয়া বসিল, তখন সে আসামের চা-বাগানে এক চাকরি লইল।

নিকটবর্ত্তী স্থানে চাকৃরির সন্ধান করিতে সকলেই তাহাকে পীড়াপীড়ি করিয়াছিল—কিন্তু সর্ব্বসাধারণের উপর রাগ করিয়াই হোক, অথবা চা-বাগানে দ্রুত বাড়িয়া উঠিবার কোন উপায় জানিয়াই হোক জয়গোপাল কাহারও কথায় কর্ণপাত করিল না;

শশিকে সন্তানসহ তাহার বাপের বাড়ি রাখিয়া সে আসামে চলিয়া গেল। বিবাহিত জীবনে স্বামীস্ত্রীর এই প্রথম বিচ্ছেদ।

এই ঘটনায় শিশু ভ্রাতাটির প্রতি শশিকলার ভারি রাগ হইল। যে মনের আক্ষেপ মুখ ফুটিয়া বলিবার যো নাই তাহারই আক্রোশটা সব চেয়ে বেশি হয়। ক্ষুদ্র ব্যক্তিটি আরামে স্তনপান করিতে ও চক্ষু মুদিয়া নিদ্রা দিতে লাগিল এবং তাহার বড় ভগিনীটি দুধ গরম, ভাত ঠাণ্ডা, ছেলের ইস্কুলে যাওয়ার দেরি প্রভৃতি নানা উপলক্ষ্যে নিশিদিন মান অভিমান করিয়া অস্থির হইল এবং অস্থির করিয়া তুলিল।

অল্পদিনের মধ্যেই ছেলেটির মার মৃত্যু হইল; মরিবার পূর্ব্বে জননী তাঁহার কন্যার হাতে শিশুপুত্রটিকে সমর্পণ করিয়া দিয়া গেলেন।

তখন অনতিবিলম্বেই সেই মাতৃহীন ছেলেটি অনায়াসেই তাহার দিদির হৃদয় অধিকার করিয়া লইল। হুহুঙ্কার শব্দপূর্ব্বক সে যখন তাঁহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া পরম আগ্রহের সহিত দন্তহীন ক্ষুদ্র মুখের মধ্যে তাঁহার মুখ চক্ষু নাসিকা সমস্তটা গ্রাস করিবার চেষ্টা করিত, ক্ষুদ্র মুষ্টির মধ্যে তাঁহার কেশগুচ্ছ লইয়া কিছুতেই দখল ছাড়িতে চাহিত না, সূর্য্যোদয় হইবার পূর্ব্বেই জাগিয়া উঠিয়া গড়াইয়া তাঁহার গায়ের কাছে আসিয়া কোমল স্পর্শে তাঁহাকে পুলকিত করিয়া মহাকলরব আরম্ভ করিয়া দিত;—যখন ক্রমে সে তাঁহাকে জিজি এবং জিজিমা বলিয়া ডাকিতে লাগিল, এবং কাজকর্ম্ম ও অবসরের সময় নিষিদ্ধ কার্য্য করিয়া, নিষিদ্ধ খাদ্য খাইয়া, নিষিদ্ধস্থানে গমনপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি বিধিমত উপদ্রব আরম্ভ করিয়া দিল, তখন শশি আর থাকিতে পারিলেন না। এই স্বেচ্ছাচারী ক্ষুদ্র অত্যাচারীর নিকটে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিলা দিলেন।

ছেলেটির মা ছিল না বলিয়া তাঁহার প্রতি তাহার আধিপত্য ঢের বেশি হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ছেলেটির নাম হইল নীলমণি। তাহার বয়স যখন দুই বৎসর তখন তাহার পিতার কঠিন পীড়া হইল। অতি শীঘ্র চলিয়া আসিবার জন্য জয়গোপালের নিকট পত্র গেল। জয়গোপাল যখন বহু চেষ্টায় ছুটি লইয়া আসিয়া পৌঁছিল তখন কালিপ্রসন্নের মৃত্যুকাল উপস্থিত।

মৃত্যুর পূর্ব্বে কালিপ্রসন্ন, নাবালক ছেলেটির তত্ত্বাবধানের ভার জয়গোপালের প্রতি অর্পণ করিয়া তাঁহার বিষয়ের সিকি অংশ কন্যার নামে লিখিয়া দিলেন।

সুতরাং বিষয় রক্ষার জন্য জয়গোপালকে কাজ ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া আসিতে হইল।

অনেক দিনের পরে স্বামীস্ত্রীর পুনর্ম্মিলন হইল। একটা জড়পদার্থ ভাঙ্গিয়া গেলে আবার ঠিক তাহার খাঁজে খাঁজে মিলাইয়া দেওয়া যায়। কিন্তু দুটি মানুষকে যেখানে বিচ্ছিন্ন করা হয়, দীর্ঘ বিচ্ছেদের পরে আর ঠিক সেখানে রেখায় রেখায় মেলে না;—কারণ, মন জিনিষটা সজীব পদার্থ; নিমেষে নিমেষে তাহার পরিণতি এবং পরিবর্ত্তন।

শশির পক্ষে এই নূতন মিলনে নূতন ভাবের সঞ্চার হইল। সে যেন তাহার স্বামীকে ফিরিয়া বিবাহ করিল। পুরাতন দাম্পত্যের মধ্যে চিরাভ্যাসবশত যে এক অসাড়তা জন্মিয়া গিয়াছিল, বিরহের আকর্ষণে তাহা অপসৃত হইয়া সে তাহার স্বামীকে যেন পূর্ব্বাপেক্ষা সম্পূর্ণতর ভাবে প্রাপ্ত হইল,—মনে মনে প্রতিজ্ঞা

করিল, যেমন দিনই আসুক্ যতদিনই যাক্, স্বামীর প্রতি এই দীপ্ত প্রেমের উজ্জ্বলতাকে কখনই ম্লান হইতে দিব না।

নূতন মিলনে জয়গোপালের মনের অবস্থাটা অন্যরূপ। পূর্ব্বে যখন উভয়ে অবিচ্ছেদে একত্রে ছিল যখন স্ত্রীর সহিত তাহার সমস্ত স্বার্থের এবং বিচিত্র অভ্যাসের ঐক্যবন্ধন ছিল। স্ত্রী তখন জীবনের একটি নিত্য সত্য হইয়াছিল,—তাহাকে বাদ দিতে গেলে দৈনিক অভ্যাসজালের মধ্যে সহসা অনেকখানি ফাঁক পড়িত। এই জন্য বিদেশে গিয়া জয়গোপাল প্রথম প্রথম অগাধ জলের মধ্যে পড়িয়াছিল। কিন্তু ক্রমে তাহার সেই অভ্যাস-বিচ্ছেদের মধ্যে নূতন অভ্যাসের তালি লাগিয়া গেল। কেবল তাহাই নহে। পূর্ব্বে নিতান্ত নিশ্চেষ্ট নিশ্চিন্তভাবে তাহার দিন কাটিয়া যাইত। মাঝে দুই বৎসর, অবস্থা-উন্নতি-চেষ্টা তাহার মনে এমন প্রবলভাবে জাগিয়া উঠিয়াছিল যে, তাহার মনের সম্মুখে আর কিছুই ছিল না। এই নূতন নেশার তীব্রতার তুলনায় তাহার পূর্ব্বজীবন বস্তুহীন ছায়ার মত দেখাইতে লাগিল। স্ত্রীলোকের প্রকৃতিতে প্রধান পরিবর্ত্তন ঘটায় প্রেম, এবং পুরুষের ঘটায় দুশ্চেষ্টা।

জয়গোপাল দুই বৎসর পরে আসিয়া অবিকল তাহার পূর্ব্বস্ত্রীটিকে ফিরিয়া পাইল না। তাহার স্ত্রীর জীবনে শিশু শ্যালকটি একটা নূতন পরিসর বৃদ্ধি করিয়াছে। এই অংশটি তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ অপরিচিত,—এই অংশে স্ত্রীর সহিত তাহার কোন যোগ নাই। স্ত্রী তাহাকে আপনার এই শিশুস্নেহের ভাগ দিবার অনেক চেষ্টা করিত—কিন্তু ঠিক কৃতকার্য্য হইত কি না বলিতে পারি না।

শশি নীলমণিকে কোলে করিয়া আনিয়া হাস্যমুখে তাহার স্বামীর সম্মুখে ধরিত—নীলমণি প্রাণপণে শশির গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার কাঁধে মুখ লুকাইত, কোন প্রকার কুটুম্বিতার খাতির

মানিত না। শশির ইচ্ছা, তাহার এই ক্ষুদ্র ভ্রাতাটির যত প্রকার মন ভুলাইবার বিদ্যা আয়ত্ত আছে সবগুলি জয়গোপালের নিকট প্রকাশ হয়; কিন্তু জয়গোপালও সে জন্য বিশেষ আগ্রহ অনুভব করিত না এবং শিশুটিও বিশেষ উৎসাহ দেখাইত না। জয়-গোপাল কিছুতেই বুঝিতে পারিত না এই কৃশকায় বৃহৎমস্তক গম্ভীরমুখ শ্যামবর্ণ ছেলেটার মধ্যে এমন কি আছে যে জন্য তাহার প্রতি এতটা স্নেহের অপব্যয় করা হইতেছে।

ভালবাসার ভাবগতিক মেয়েরা খুব চট্ করিয়া বোঝে। শশি অবিলম্বেই বুঝিল জয়গোপাল নীলমণির প্রতি বিশেষ অনুরক্ত নহে। তখন ভাইটিকে সে বিশেষ সাবধানে আড়াল করিয়া রাখিত—স্বামীর স্নেহহীন বিরাগদৃষ্টি হইতে তাহাকে তফাতে রাখিতে চেষ্টা করিত। এইরূপে ছেলেটি তাহার গোপন যত্নের ধন, তাহার একলার স্নেহের সামগ্রী হইয়া উঠিল। সকলেই জানেন, স্নেহ যত গোপনের, যত নির্জ্জনের হয় ততই প্রবল হইতে থাকে।

নীলমণি কাঁদিলে জয়গোপাল অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিত—এই জন্য শশি তাহাকে তাড়াতাড়ি বুকের মধ্যে চাপিয়া সমস্ত প্রাণ দিয়া বুক দিয়া তাহার কান্না থামাইবার চেষ্টা করিত;—বিশেষতঃ নীলমণির কান্নায় যদি রাত্রে তাহার স্বামীর ঘুমের ব্যাঘাত হইত, এবং স্বামী এই ক্রন্দনপরায়ণ ছেলেটার প্রতি অত্যন্ত হিংস্রভাবে ঘৃণা প্রকাশ পূর্ব্বক জর্জ্জরচিত্তে গর্জ্জন করিয়া উঠিত তখন শশি যেন অপরাধিনীর মত সঙ্কুচিত শশব্যস্ত হইয়া পড়িত, তৎক্ষণাৎ তাহাকে কোলে করিয়া দূরে লইয়া গিয়া একান্ত সানুনয় স্নেহের স্বরে সোনা আমার, ধন আমার, মাণিক আমার বলিয়া ঘুম পাড়াইতে থাকিত।

ছেলেতে ছেলেতে নানা উপলক্ষ্যে ঝগড়া বিবাদ হইয়াই

থাকে। পূর্ব্বে এরূপ স্থলে শশি নিজের ছেলেদের দণ্ড দিয়া ভাই-য়ের পক্ষ অবলম্বন করিত, কারণ, তাহার মা ছিল না। এখন বিচারকের সঙ্গে সঙ্গে দণ্ডবিধির পরিবর্ত্তন হইল। এখন সর্ব্বদাই নিরপরাধে এবং অবিচারে নীলমণিকে কঠিন দণ্ড ভোগ করিতে হইত। সেই অন্যায় শশির বক্ষে শেলের মত বাজিত; তাই সে দণ্ডিত ভ্রাতাকে ঘরে লইয়া গিয়া তাহাকে মিষ্ট দিয়া খেলেনা দিয়া আদার করিয়া চুমো খাইয়া শিশুর আহত হৃদয়ে যথাসাধ্য সান্ত্বনা বিধান করিবার চেষ্টা করিত।

ফলতঃ দেখা গেল, শশি নীলমণিকে যতই ভালবাসে জয়-গোপাল নীলমণির প্রতি ততই বিরক্ত হয়; আবার জয়গোপাল নীলমণির প্রতি যতই বিরাগ প্রকাশ করে, শশি তাহাকে ততই স্নেহসুধায় অভিষিক্ত করিয়া দিতে থাকে। জয়গোপাল লোকটা কখনও তাহার স্ত্রীর প্রতি কোনরূপ কঠোর ব্যবহার করে না এবং শশি নীরবে নম্রভাবে প্রীতির সহিত তাহার স্বামীর সেবা করিয়া থাকে, কেবল এই নীলমণিকে লইয়া ভিতরে ভিতরে উভয়ে উভয়কে অহরহ আঘাত দিতে লাগিল। এইরূপ নীরব দ্বন্দ্বের গোপন আঘাত প্রতিঘাত প্রকাশ্য বিবাদের অপেক্ষা ঢের বেশি দুঃসহ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

নীলমণির সমস্ত শরীরের মধ্যে মাথাটাই সর্ব্বপ্রধান ছিল। দেখিলে মনে হইত বিধাতা যেমন একটা সরু কাঠির মধ্যে ফুঁ দিয়া তাহার ডগার উপরে একটা বড় বুদ্বুদ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ডাক্তাররাও মাঝে মাঝে আশঙ্কা প্রকাশ করিত ছেলেটি এইরূপ বুদ্বুদের মতই ক্ষণভঙ্গুর ক্ষণস্থায়ী হইবে। অনেক দিন পর্য্যন্ত সে

কথা কহিতে এবং চলিতে শেখে নাই। তাহার বিষণ্ণ গম্ভীর মুখ দেখিয়া বোধ হইত, তাহার পিতামাতা তাঁহাদের অধিক বয়সের সমস্ত চিন্তাভার এই ক্ষুদ্র শিশুর মাথার উপরে চাপাইয়া দিয়া গেছেন।

দিদির যত্নে ও সেবায় নীলমণি তাহার বিপদের কাল উত্তীর্ণ হইয়া ছয়বৎসরে পা দিল।

কার্ত্তিকমাসে ভাইফোঁটার দিনে নূতন জামা, চাদর এবং এক-খানি লালপেড়ে ধুতি পরাইয়া বাবু সাজাইয়া নীলমণিকে শশি ভাইফোঁটা দিতেছেন এমন সময়ে পূর্ব্বোক্ত স্পষ্টভাষিণী প্রতিবে-শিনী তারা আসিয়া কথায় কথায় শশির সহিত ঝগড়া বাধাইয়া দিল। সে কহিল, গোপনে ভাইয়ের সর্ব্বনাশ করিয়া ঘটা করিয়া ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দিবার কোন ফল নাই। শুনিয়া শশি বিস্ময়ে ক্রোধে বেদনায় বজ্রাহত হইল। অবশেষে শুনিতে পাইল, তাহারা স্বামী স্ত্রীতে পরামর্শ করিয়া নাবালক নীলমণির সম্পত্তি খাজনার দায়ে নিলাম করাইয়া তাহার স্বামীর পিস্‌তুতো ভাইয়ের নামে বেনামী করিয়া কিনিতেছে। শুনিয়া শশি অভিশাপ দিল, যাহারা এতবড় মিথ্যা কথা রটনা করিতে পারে তাহাদের মুখে কুষ্ঠ হউক্!

এই বলিয়া সরোদনে স্বামীর নিকট উপস্থিত হইয়া জনশ্রুতির কথা তাহাকে জানাইল। জয়গোপাল কহিল আজকালকার দিনে কাহাকেও বিশ্বাস করিবার যো নাই। উপেন্ আমার আপন পিস্‌তুতো ভাই; তাহার উপরে বিষয়ের ভার দিয়া আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ছিলাম—সে কখন্ গোপনে খাজনা বাকি ফেলিয়া মহল হাসিল্‌পুর নিজে কিনিয়া লইয়াছে আমি জানিতেও পারি নাই।

শশি আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, নালিশ করিবে না?

জয়গোপাল কহিল, ভাইয়ের নামে নালিশ করি কি করিয়া? এবং নালিশ করিয়াও ত কোন ফল নাই, কেবল অর্থ নষ্ট।

স্বামীর কথা বিশ্বাস করা শশির পরমকর্ত্তব্য, কিন্তু কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিল না। তখন এই সুখের সংসার এই প্রেমের গার্হস্থ্য সহসা তাহার নিকট অত্যন্ত বিকট বীভৎস আকার ধারণ করিয়া দেখা দিল। যে সংসারকে আপনার পরম আশ্রয় বলিয়া মনে হইত—হঠাৎ দেখিল সে একটা নিষ্ঠুর স্বার্থের ফাঁদ—তাহাদের দুটি ভাইবোনকে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া ধরিয়াছে। সে একা স্ত্রীলোক, অসহায় নীলমণিকে কেমন করিয়া রক্ষা করিবে ভাবিয়া কূল কিনারা পাইল না। যতই চিন্তা করিতে লাগিল, ততই ভয়ে এবং ঘৃণায় এবং বিপন্ন বালক ভ্রাতাটির প্রতি অপরিসীম স্নেহে তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইতে লাগিল সে যদি উপায় জানিত তবে লাট্‌সাহেবের নিকট নিবেদন করিয়া, এমন কি, মহারাণীর নিকট পত্র লিখিয়া তাহার এই ভাইয়ের সম্পত্তি রক্ষা করিতে পারিত। মহারাণী কখনই নীলমণির বার্ষিক সাত শ আটান্ন টাকার মুনফার হাসিলপুর মহল বিক্রয় হইতে দিতেন না।

এইরূপে শশি যখন একেবারে মহারাণীর নিকট দরবার করিয়া তাহার পিস্‌তুতো দেবরকে সম্পূর্ণ জব্দ করিয়া দিবার উপায় চিন্তা করিতেছে তখন হঠাৎ নীলমণির জ্বর আসিয়া আক্ষেপ সহকারে মূর্চ্ছা হইতে লাগিল।

জয়গোপাল এক গ্রাম্য নেটিভ ডাক্তরকে ডাকিল। শশি ভাল ডাক্তারের জন্য অনুরোধ করাতে জয়গোপাল বলিল, কেন মতি-লাল মন্দ ডাক্তার কি! শশি তখন তাঁহার পায়ে পড়িল, মাথার

দিব্য দিল; জয়গোপাল বলিল, আচ্ছা, সহর হইতে ডাক্তার ডাকিতে পাঠাইতেছি।

শশি নীমলণিকে কোলে করিয়া বুকে করিয়া পড়িয়া রহিল। নীলমণিও তাহাকে এক দণ্ড চোখের আড়াল হইতে দেয় না; পাছে ফাঁকি দিয়া পালায় এই ভয়ে তাহাকে জড়াইয়া থাকে; এমন কি, ঘুমাইয়া পড়িলেও আঁচলটি ছাড়ে না।

সমস্ত দিন এমনি ভাবে কাটিলে সন্ধ্যার পর জয়গোপাল আসিয়া বলিল—সহরে ডাক্তার বাবুকে পাওয়া গেল না, তিনি দূরে কোথায় রোগী দেখিতে গিয়াছেন। ইহাও বলিল, মকদ্দমা উপলক্ষ্যে আমাকে আজই অন্যত্র যাইতে হইতেছে; আমি মতিলালকে বলিয়া গেলাম সে নিয়মিত আসিয়া রোগী দেখিয়া যাইবে।

রাত্রে নীলমণি ঘুমের ঘোরে প্রলাপ বকিল। প্রাতঃকালেই শশি কিছুমাত্র বিচার না করিয়া রোগী ভ্রাতাকে লইয়া নৌকা চড়িয়া একেবারে সহরে গিয়া ডাক্তারের বাড়ি উপস্থিত হইল। ডাক্তার বাড়িতেই আছেন—সহর ছাড়িয়া কোথাও যান নাই। ভদ্র স্ত্রীলোক দেখিয়া তিনি তাড়াতাড়ি বাসা ঠিক করিয়া একটি প্রাচীনা বিধবার তত্ত্বাবধানে শশিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিলেন এবং ছেলেটির চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন।

পরদিনই জয়গোপাল আসিয়া উপস্থিত। ক্রোধে অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া স্ত্রীকে তৎক্ষণাৎ তাহার সহিত ফিরিতে অনুমতি করিল। স্ত্রী কহিল, আমাকে যদি কাটিয়া ফেল তবু আমি এখন ফিরিব না। তোমরা আমার নীলমণিকে মারিয়া ফেলিতে চাও—উহার মা নাই, বাপ নাই, আমি ছাড়া উহার আর কেহ নাই—আমি উহাকে রক্ষা করিব।

জয়গোপাল রাগিয়া কহিল, তবে এই খানেই থাক, তুমি আর

আমার ঘরে ফিরিয়ো না। শশি তখন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়া কহিল ঘর তোমার কি! আমার ভাইয়েরই ত ঘর! জয়গোপাল কহিল—আচ্ছা সে দেখা যাইবে!

পাড়ার লোকে এই ঘটনায় কিছুদিন খুব আন্দোলন করিতে লাগিল। প্রতিবেশিনী তারা কহিল, স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করিতে হয় ঘরে বসিয়া কর না বাপু। ঘর ছাড়িয়া যাইবার আবশ্যক কি! হাজার হৌক্, স্বামীত বটে।

সঙ্গে যাহা টাকা ছিল সমস্ত খরচ করিয়া গহনাপত্র বেচিয়া শশি তাহার ভাইকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিল। তখন সে খবর পাইল, দ্বারিগ্রামে তাহাদের যে বড় জোৎ ছিল, যে জোতের উপরে তাহাদের বাড়ি, নানা রূপে যাহার আয় প্রায় বার্ষিক দেড় হাজার টাকা হইবে সেই জোৎটি জমিদারের সহিত যোগ করিয়া জয়-গোপাল নিজের নামে খারিজ করিয়া লইয়াছে। এখন বিষয়টি সমস্তই তাহাদের—তাহার ভাইয়ের নহে।

ব্যামো হইতে সারিয়া উঠিয়া নীলমণি করুণস্বরে বলিতে লাগিল, দিদি, বাড়ি চল। সেখানে তাহার সঙ্গী ভাগিনেয়দের জন্য তাহার মন-কেমন করিতেছে। তাই বারম্বার বলিল, দিদি আমাদের সেই ঘরে চলনা, দিদি! শুনিয়া দিদি কেবলই কাঁদিতে লাগিল। আমাদের ঘর আর কোথায়!

কিন্তু কেবল কাঁদিয়া কোন ফল নাই—তখন পৃথিবীতে দিদি ছাড়া তাহার ভাইয়ের আর কেহ ছিল না। ইহা ভাবিয়া চোখের জল মুছিয়া শশি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ তারিণী বাবুর অন্তঃপুরে গিয়া তাঁহার স্ত্রীকে ধরিল। ডেপুটি বাবু জয়গোপালকে চিনিতেন। ভদ্রঘরের স্ত্রী ঘরের বাহির হইয়া বিষয় সম্পত্তি লইয়া স্বামীর সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইতে চাহে ইহাতে শশির প্রতি তিনি বিশেষ

বিরক্ত হইলেন। তাহাকে ভুলাইয়া রাখিয়া তৎক্ষণাৎ জয়গোপালকে পত্র লিখিলেন। জয়গোপাল শ্যালকসহ তাহার স্ত্রীকে বলপূর্ব্বক নৌকায় তুলিয়া বাড়ি লইয়া গিয়া উপস্থিত করিল।

স্বামী স্ত্রীতে, দ্বিতীয় বিচ্ছেদের পর, পুনশ্চ এই দ্বিতীয়বার মিলন হইল! প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ!

অনেক দিন পরে ঘরে ফিরিয়া পুরাতন সহচরদিগকে পাইয়া নীলমণি বড় আনন্দে খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার সেই নিশ্চিন্ত আনন্দ দেখিয়া অন্তরে অন্তরে শশির হৃদয় বিদীর্ণ হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

শীতকালে ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব মফস্বল পর্য্যবেক্ষণে বাহির হইয়া শীকার সন্ধানে গ্রামের মধ্যে তাঁবু ফেলিয়াছেন। গ্রামের পথে সাহেবের সঙ্গে নীলমণির সাক্ষাৎ হয়। অন্য বালকেরা তাঁহাকে দেখিয়া চাণক্য শ্লোকের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক নখী দন্তী শৃঙ্গী প্রভৃতির সহিত সাহেবকেও যোগ করিয়া যথেষ্ট দূরে সরিয়া গেল। কিন্তু সুগম্ভীরপ্রকৃতি নীলমণি অটল কৌতূহলের সহিত প্রশান্ত-ভাবে সাহেবকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিল। সাহেব সকৌতুকে কাছে আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি পাঠ-শালায় পড়?—বালক নীরবে মাথা নাড়িয়া জানাইল, হাঁ। সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি কোন্ পুস্তক পড়িয়া থাক?—নীলমণি পুস্তক শব্দের অর্থ না বুঝিয়া নিস্তব্ধভাবে ম্যাজিষ্ট্রেটের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

ম্যাজিষ্টর সাহেবের সহিত এই পরিচয়ের কথা নীলমণি অত্যন্ত উৎসাহের সহিত তাহার দিদির নিকট বর্ণনা করিল।

মধ্যাহ্নে চাপকান প্যাণ্ট্‌লুন পাগ্‌ড়ি পরিয়া জয়গোপাল ম্যাজি-

ষ্ট্রেট্‌কে সেলাম করিতে গিয়াছে। অর্থী প্রত্যর্থী চাপ্‌রাশী কন্‌ষ্টেব্‌লে চারিদিক লোকারণ্য। সাহেব গরমের ভয়ে তাম্বুর বাহিরে খোলা ছায়ায় ক্যাম্পটেবিল পাতিয়া বসিয়াছেন এবং জয়গোপালকে চৌকিতে বসাইয়া তাহাকে স্থানীয় অবস্থা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। জয়গোপাল তাঁহার গ্রামবাসী সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে এই গৌরবের আসন অধিকার করিয়া মনে মনে স্ফীত হইতেছিল, এবং মনে করিতেছিল এই সময়ে চক্রবর্ত্তীরা এবং নন্দীরা কেহ আসিয়া দেখিয়া যায় ত বেশ হয়!

এমন সময় নীলমণিকে সঙ্গে করিয়া অবগুণ্ঠনাবৃত একটি স্ত্রীলোক একেবারে ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। কহিল, সাহেব, তোমার হাতে আমার এই অনাথ ভাইটিকে সমর্পণ করিলাম, তুমি ইহাকে রক্ষা কর!

সাহেব তাঁহার সেই পূর্ব্বপরিচিত বৃহৎমস্তক গম্ভীরপ্রকৃতি বালকটিকে দেখিয়া এবং স্ত্রীলোকটিকে ভদ্রস্ত্রীলোক বলিয়া অনুমান করিয়া তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন—কহিলেন, আপনি তাঁবুতে প্রবেশ করুন।—স্ত্রীলোকটি কহিল, আমার যাহা বলিবার আছে আমি এইখানেই বলিব।

জয়গোপাল বিবর্ণমুখে ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। কৌতূহলী গ্রামের লোকেরা পরম কৌতুক অনুভব করিয়া চারিদিকে ঘেঁষিয়া আসিবার উপক্রম করিল। সাহেব বেত উঁচাইবামাত্র সকলে দৌড় দিল।

তখন শশি তাহার ভ্রাতার হাত ধরিয়া সেই পিতৃমাতৃহীন বালকের সমস্ত ইতিহাস আদ্যোপান্ত বলিয়া গেল। জয়গোপাল মধ্যে মধ্যে বাধা দিবার উপক্রম করাতে ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ রক্তবর্ণ মুখে গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিলেন—চুপ্‌রও! এবং বেত্রাগ্র দ্বারা,

তাহাকে চৌকি ছাড়িয়া সম্মুখে দাঁড়াইতে নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। জয়গোপাল মনে মনে শশির প্রতি গর্জ্জন করিতে করিতে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। নীলমণি দিদির অত্যন্ত কাছে ঘেঁষিয়া অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিল।

শশির কথা শেষ হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট্ জয়গোপালকে গুটিকতক প্রশ্ন করিলেন এবং তাহার উত্তর শুনিয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শশিকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন—বাছা, এ মকর্দ্দমা যদিও আমার কাছে উঠিতে পারে না তথাপি তুমি নিশ্চিন্ত থাক—এ সম্বন্ধে যাহা কর্ত্তব্য আমি করিব। তুমি তোমার ভাইটিকে লইয়া নির্ভয়ে বাড়ি ফিরিয়া যাইতে পার!

শশি কহিল—সাহেব, যতদিন নিজের বাড়ি ও না ফিরিয়া পায় ততদিন আমার ভাইকে বাড়ি লইয়া যাইতে আমি সাহস করি না। এখন নীলমণিকে তুমি নিজের কাছে না রাখিলে ইহাকে কেহ রক্ষা করিতে পারিবে না।

সাহেব কহিলেন, তুমি কোথায় যাইবে?

শশি কহিল, আমি আমার স্বামীর ঘরে ফিরিয়া যাইব, আমার কোন ভাবনা নাই।

সাহেব ঈষৎ হাসিয়া অগত্যা এই গলায় মাদুলি পরা কৃশকায় শ্যামবর্ণ গম্ভীর প্রশান্ত মৃদুস্বভাব বাঙ্গালীর ছেলেটিকে সঙ্গে লইতে রাজি হইলেন। তখন শশি বিদায় লইবার সময় বালক তাহার আঁচল চাপিয়া ধরিল। সাহেব কহিলেন, বাবা তোমার কোন ভয় নেই—এস!

ঘোমটার মধ্য হইতে অবিরল অশ্রু মোচন করিতে করিতে শশি কহিল—লক্ষ্মী ভাই, যা ভাই—আবার তোর দিদির সঙ্গে দেখা হবে! এই বলিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার মাথায় পিঠে

হাত বুলাইয়া কোন মতে আপন অঞ্চল ছাড়াইয়া তাড়াতাড়ি সে চলিয়া গেল; অমনি সাহেব নীলমণিকে বাম হস্তের দ্বারা বেষ্টন করিয়া ধরিলেন। সে দিদিগো দিদি করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল;– শশি একবার ফিরিয়া চাহিয়া দূর হইতে প্রসারিত দক্ষিণ হস্তে তাহার প্রতি নীরবে সান্ত্বনা প্রেরণ করিয়া বিদীর্ণ হৃদয়ে চলিয়া গেল।

আবার সেই বহুকালের চিরপরিচিত পুরাতন ঘরে স্বামী স্ত্রীর মিলন হইল। প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ!

কিন্তু এ মিলন অধিক দিন স্থায়ী হইল না। কারণ, ইহার অনতিকাল পরেই একদিন প্রাতঃকালে গ্রামবাসীগণ সংবাদ পাইল যে, রাত্রে শশি ওলাউঠো রোগে আক্রান্ত হইয়া মরিয়াছে—এবং রাত্রেই তাহার দাহক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেছে।

কেহ এ সম্বন্ধে কোন কথা বলিল না। কেবল সেই প্রতিবেশিনী তারা মাঝে মাঝে গর্জ্জন করিয়া উঠিতে চাহিত, সকলে চুপ্ চুপ্ করিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দিত।

বিদায়কালে শশি ভাইকে কথা দিয়া গিয়াছিল আবার দেখা হইবে—সে কথা কোন্‌খানে রক্ষা হইয়াছে জানি না।

পুরাতন ভৃত্য।

ভূতের মতন চেহারা যেমন,
নির্ব্বোধ অতি ঘোর!
যা কিছু হারায়, গিন্নি বলেন
কেষ্টা বেটাই চোর!

উঠিতে বসিতে করি বাপান্ত,
শুনেও শোনে না কানে।
যত পায় বেত না পায় বেতন
তবু না চেতন মানে।
বড় প্রয়োজন, ডাকি প্রাণপণ
চীৎকার করি' "কেষ্টা,"—
যত করি তাড়া, নাহি পাই সাড়া,
খুঁজে ফিরি সারা দেশটা!
তিনখানা দিলে একখানা রাখে,
বাকি কোথা নাহি জানে।
একখানা দিলে নিমেষ ফেলিতে
তিনখানা করে আনে!
যেখানে সেখানে দিবসে দুপরে
নিদ্রাটি আছে সাধা।
মহা কলরবে গালি দেই যবে
পাজি হতভাগা গাধা,
দরজার পাশে দাঁড়িয়ে সে হাসে
দেখে' জলে' যায় পিত্ত!
তবু মায়া তার ত্যাগ করা ভার
বড় পুরাতন ভৃত্য!

ঘরের কর্ত্রী রুক্ষ-মূর্ত্তি
বলে, "আর পারি না কো!
"রহিল তোমার এ ঘর দুয়ার
কেষ্টারে লয়ে থাকো!

"না মানে শাসন, বসন বাসন
অশন আসন যত
"কোথায় কি গেলো, শুধু টাকাগুলো
যেতেছে জলের মত!
"গেলে সে বাজার, সারাদিনে আর
দেখা পাওয়া তার ভার!
"করিলে চেষ্টা কেষ্টা ছাড়া কি
ভৃত্য মেলে না আর!"
শুনে মহা রেগে ছুটে যাই বেগে,
আনি তার টিকি ধরে,'—
বলি তারে "পাজি, বেরো তুই আজই,
দূর করে দিনু তোরে!"
ধীরে চলে যায়, ভাবি, গেল দায়;—
পরদিনে উঠে দেখি
হুঁকাটি বাড়ায়ে রয়েছে দাঁড়ায়ে
বেটা বুদ্ধির ঢেঁকি!
প্রসন্ন মুখ, নাহি কোন দুখ,
অতি অকাতর চিত্ত!
ছাড়ালে না ছাড়ে, কি করিব তারে,
মোর পুরাতন ভৃত্য!

সে বছরে ফাঁকা পেনু কিছু টাকা
করিয়া দালাল-গিরি।
করিলাম মন শ্রীবৃন্দাবন
বারেক আসিব ফিরি।

পরিবার তার সাথে যেতে চায়,—
বুঝায়ে বলিনু তারে—
পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য ;—
নহিলে খরচ বাড়ে!
লয়ে রশারশি করি কশাকশি
পোঁটলা পুঁটুলি বাঁধি'
বলয় বাজায়ে বাক্স সাজায়ে
গৃহিনী কহিল কাঁদি,—
"পরদেশে গিয়ে কেষ্টারে নিয়ে
কষ্ট অনেক পাবে!"
আমি কহিলাম "আরে রাম রাম!
নিবারণ সাথে যাবে!"
রেলগাড়ি ধায় ;—হেরিলাম হায়
নামিয়া বর্দ্ধমানে—
কৃষ্ণকান্ত অতি প্রশান্ত
তামাক্ সাজিয়া আনে!
স্পর্দ্ধা তাহার হেন মতে আর
কত বা সহিব নিত্য!
যত তারে দুষি' তবু হনু খুসি
হেরি পুরাতন ভৃত্য!

নামিনু শ্রীধামে ; দক্ষিণে বামে
পিছনে সমুখে যত
লাগিল পাণ্ডা, নিমেষে প্রাণটা
করিল কণ্ঠাগত!

জন ছয় সাতে মিলি একসাথে
পরম বন্ধুভাবে
করিলাম বাসা, মনে হল আশা
আরামে দিবস যাবে!
কোথা ব্রজবালা, কোথা বনমালা,
কোথা বনমালী হরি!
কোথা, হা হন্ত, চিরবসন্ত!
আমি বসন্তে মরি!
বন্ধু যে যত স্বপ্নের মত
বাসা ছেড়ে দিল ভঙ্গ।
আমি একা ঘরে, ব্যাধি-খরশরে
ভরিল সকল অঙ্গ!
ডাকি নিশিদিন সকরুণ ক্ষীণ—
"কেষ্ট আয় রে কাছে!
এতদিনে শেষে আসিয়া বিদেশে
প্রাণ বুঝি নাহি বাঁচে!"
হেরি তার মুখ ভরে' ওঠে বুক,
সে যেন পরম বিত্ত!
নিশিদিন ধরে' দাঁড়ায়ে শিয়রে
মোর পুরাতন ভৃত্য!

মুখে দেয় জল, শুধায় কুশল,
শিরে দেয় মোর হাত;
দাঁড়ায়ে নিঝুম, চোখে নাই ঘুম,
মুখে নাই তার ভাত।

বলে বার বার, "কর্ত্তা, তোমার
কোন ভয় নাই, শুন,
"যাবে দেশে ফিরে, মা-ঠাকুরাণীরে
দেখিতে পাইবে পুন।"
লভিয়া আরাম আমি উঠিলাম;
তাহারে ধরিল জ্বরে;
নিল সে আমার কাল-ব্যাধিভার
আপনার দেহ পরে!
হয়ে জ্ঞানহীন কাটিল দুদিন
বন্ধ হইল নাড়ি।
এতবার তারে গেনু ছাড়াবারে,
এতদিনে গেল ছাড়ি'!
বহুদিন পরে আপনার ঘরে
ফিরিনু সারিয়া তীর্থ।
আজ সাথে নেই চিরসাথী সেই
মোর পুরাতন ভৃত্য!

১২ ফাল্গুন, }
১৩০১। }

নৃত্যকলা।

আমাদের শাস্ত্রে গীত ও বাদ্যের সহিত নৃত্যও সঙ্গীতের অঙ্গ-স্বরূপ গণ্য হইয়াছে; কিন্তু উক্ত কলাদ্বয় অপেক্ষা নৃত্যের এতটা অধঃপতন হইয়াছে যে, ইহাকে উহাদের এক শ্রেণীভুক্ত বলিয়া

মনেই হয় না। চতুঃষষ্টি কলার তালিকা দেখিলে, পুরাকালে কলা শব্দের সহিত যে বিশেষ উচ্চ ভাব জড়িত ছিল তাহা মনে হয় না। বোধ করি সেই জন্যই কালিদাস উচ্চ অঙ্গের কলাবিদ্যাগুলিকে "ললিত কলা" নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইংরাজিতে যাহাকে "Fine arts" বলে বাঙ্গলায় বোধ করি তাহাকে ললিত কলা শব্দে অনুবাদ করা যাইতে পারে। কেহ কেহ ফাইন্ আর্ট্‌স্‌কে বাঙ্গলায় "সূক্ষ্মশিল্প" বলিয়া থাকেন,সেটা আমাদের কানে বড়ই বর্ব্বর ঠেকে।

যাহা হউক, প্রাচীনকালে নৃত্যও সম্ভবতঃ "ললিত কলা" উপাধিতে সম্মান প্রাপ্ত হইত; বর্ত্তমানকালে তাহাকে গীত, বাদ্য, আলেখ্য, নাট্য প্রভৃতির সহিত সমান আসন দেওয়া হয় না।

কিন্তু আমাদের মতে নৃত্যের মধ্যে এমন কোন মূলগত দোষ নাই, যে জন্য উহাকে হীনপদবীতে নামাইয়া দেওয়া যায়। অভিধানে নৃত্য শব্দের সহিত বিলাসিতার ভাব জড়িত আছে বটে—সবিলাসোঽঙ্গবিক্ষেপোনৃত্যমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ—কিন্তু এ সংজ্ঞা আজকাল খাটে বলিয়া বোধ হয় না। তালমানযুক্ত অঙ্গচালনা মাত্রকেই বাঙ্গলা ভাষায় নৃত্য বলা হয়, এবং তাহার উপর, ভাবোদ্রেক করা উহার উদ্দেশ্য হইলে, আধুনিক মত অনুসারেও নৃত্যকে কলার মধ্যে স্থান দেওয়া যাইতে পারে। তাহা ছাড়া আমাদের দেশেও যে নৃত্যকে চিরকাল হেয় জ্ঞান করা হইত, এমন বোধ হয় না। আদিম মনুষ্য যে আনন্দভরে প্রথম গাহিয়া উঠিয়াছিল, সেই আনন্দেরই প্রভাবে নৃত্যও করিয়াছিল; দুইই সমান স্বাভাবিক এবং দুইয়ের মধ্যে নৃত্যই সম্ভবতঃ আগে অভিব্যক্ত হইয়াছিল। পর্য্যটকেরা বলেন যে অসভ্য জাতি সকল এতই নৃত্যপ্রিয় যে, যে কোন রকম তালযুক্ত আওয়াজ শুনিলে তাহারা আর থাকিতে পারে না—একেবারে শ্রান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত নাচিতে

থাকে। আমাদের দেশের সাঁওতাল কোল প্রভৃতি জাতি দেখিলে ইহা বুঝা যায়। ইহা হইতে মনে হয় যে, মনুষ্যের শরীর মনের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিবার উপায় যে নৃত্য, তাহাকে অনাদরে সমাজ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দেওয়া সুবিচার নহে।

কিন্তু নৃত্য কথার অর্থ যাহাই হৌক না কেন, আমাদের ভদ্র সমাজে যেরূপে উহার চর্চ্চা হইয়া থাকে, তাহাতে উহার সহিত উচ্চ বা প্রীতিকর ভাবের সম্পর্ক দেখা যায় না, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এবং এ আকারে যে উহা অধিক দিন আমাদের সমাজে থাকিবে না, থাকাও বাঞ্ছনীয় নহে, সে বিষয়েও মতভেদ হইতে পারে না।

প্রচলিত নৃত্যে না থাকে সৌন্দর্য্য না পাওয়া যায় ভাব না দেখা যায় কোন দ্রষ্টব্য বিষয়; এবং আশ্চর্য্য এই যে ইহা বুঝিয়াও অনেকে প্রথা অনুসারে নাচ দিয়া থাকেন। কোন ভদ্রলোকের বাড়িতে নাচের নিমন্ত্রণ হইলে কি দেখা যায়? বাড়ির লোকেরা আতিথ্যে ব্যস্ত, প্রবীণেরা নিদ্রাকুল, নবীনেরা গল্পে মত্ত; এদিকে নাচওয়ালী সারঙ্গীওয়ালার সজোরে মাথা নাড়া এবং তবলাওয়ালার সশব্দ বাহবা ব্যতীত অন্য কোন উৎসাহের অভাবে দস্তুরমত হাতপা নাড়িতেছে—নিরানন্দ রেখাঙ্কিত মুখে হাসির ভাণ, বে-মানান বে-ঢপ্ কাপড় পরিয়া ভাবব্যঞ্জক অঙ্গভঙ্গীর চেষ্টা, মলিনতা ও কলঙ্কের মধ্য দিয়া সৌন্দর্য্য বিকাশের প্রয়াস!—দেখিলে মনে হয় যেন প্রমোদের কঙ্কাল সৌন্দর্য্যের বিদ্রূপমাত্র দেখিতেছি। ভদ্রলোকের বাড়িতে উক্ত প্রকারে এই রীত রক্ষা হইয়া থাকে,—যাহারা আচরণের দ্বারা ভদ্রনাম হারাইয়াছে, তাহাদের নাচের মজলিস সম্বন্ধে আলোচনা না করাই ভাল।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এরূপ নৃত্য থাকিয়াও ফল নাই,

থাকিবার সম্ভাবনাও নাই। এ প্রথায় নৃত্যের কোন উদ্দেশ্যই সফল হয় না। নৃত্যের দ্বারা দুই ভিন্ন কার্য্য সাধন হইতে পারে—অঙ্গচালনা এবং ভাবোদ্রেক। আর একজনকে নাচিতে দেখিয়া প্রথমটির কোন সুবিধা হয় না এবং যে শ্রেণীর লোকেরা নৃত্য করিয়া থাকে, তাহাদের দ্বারা দ্বিতীয়টি হওয়া অসম্ভব।

আজকাল কোন বিষয়ে শুধু দেশী প্রথার আলোচনা করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা যায় না। বিলাতফেরতারা, যাঁরা স্বয়ং ইংরাজ-রমণীর সহিত নাচিয়া আসিয়াছেন, তাঁরা আমাদের দেশে য়ুরোপীয় প্রণালীর নৃত্য চলিত হইলে সুখী হন! পাঠকেরা বোধ হয় অবগত আছেন এ প্রণালী কিরূপ। বাজনা খেমটা বা কাওয়ালী তালে বাজিয়া উঠিলেই উপস্থিত স্ত্রী পুরুষ সকলে পরস্পরের সহিত জোড়া বাঁধিয়া ১, ২, ৩ বা ১, ২, ৩, ৪ মাত্রা অনুসারে পা ফেলিতে ফেলিতে ঘরময় ঘুরিয়া বেড়ান— ১০। ১৫ মিনিট এরূপ করিলে একটা নাচ সম্পূর্ণ হয়। কিন্তু আর অধিক বর্ণনা বোধ করি আবশ্যক নাই, প্রকৃত বঙ্গসন্তান ইতিমধ্যেই, অপরিচিত বা অল্পপরিচিত স্ত্রীপুরুষে পরস্পরের আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ হইয়া ঘূর্ণ্যমান হইবার চিত্রে, যথেষ্ট ভীত হইয়া থাকিবেন। আমাদেরও এ বিষয়ে তাঁহার সঙ্গে সম্পূর্ণ মতের ঐক্য আছে, সুতরাং এ প্রথা 'সভ্যতম' জাতি সকলের অনুমোদিত হইলেও, আমাদের পক্ষে উহাকে বাদ দিয়া কথা কহাই ভাল।

স্ত্রী এবং পুরুষের স্বতন্ত্রভাবে নৃত্যেরও বড় সুবিধা দেখা যায় না। শুধু অসভ্য জাতিদের মধ্যে নহে, এমন অনেক সভ্যজাতিও আছে যাহাদের মধ্যে দিনের কর্ম্ম শেষ হইবার পর, গ্রামের সকলে একত্র হইয়া, যুবক যুবতীরা নৃত্যে মাতিয়া, বৃদ্ধেরা দেখিয়া, বালক-বালিকারা শিখিয়া প্রচুর আনন্দ উপভোগ করে। এরূপ প্রথায়,

কোন প্রকার যুক্তির দ্বারা, ভাল বৈ মন্দ কিছুই পাওয়া যায় না! বাউল বৈষ্ণব প্রভৃতিরাও কীর্ত্তন করিতে করিতে নাচিয়া থাকে, কিন্তু আমাদের শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায় সকল বিষয়ে কিছু অধিক গম্ভীর হইয়া পড়িয়াছে—কোন প্রকার দেহচাঞ্চল্য বা সরল আনন্দ প্রকাশ বা এমন কোন কার্য্য যাহাতে ছেলেমানুষী লেশ-মাত্র প্রকাশ পায়, তাহার প্রতি উহাদের সম্পূর্ণ বিরাগ দেখা যায়! এরূপ অবস্থা যে সম্পূর্ণ বিজ্ঞতার আধিক্য বশতঃ ঘটিয়াছে, তাহাও ঠিক করিয়া বলা যায় না—যাহারা হাঁচি টিকটিকির সহিত নিজ অদৃষ্টের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ অনুভব করে, এবং যাহারা গবর্ণমেণ্টের নিকট ক্রন্দনকে ঐহিক, ও পুতুলখেলাকে পারত্রিক উন্নতির উপায় মনে করে, তাহাদের মধ্যে ছেলেমানুষী মোটে নাই বলিলে অন্যায় হয়।

যাহা হউক এ সকল দুরূহ আলোচনার মধ্যে প্রবেশ করিয়া কাজ নাই। আপাততঃ এইটুকু দেখা যাইতেছে যে, যে কয়প্রকার নৃত্যের উল্লেখ করা গেল, তাহার মধ্যে, একটা না একটা কারণে, কোনটাই আমাদের সমাজে চলিবার বিশেষ সুবিধা নাই।

পাঠক হয়ত এতক্ষণে চটিয়া উঠিয়াছেন—কোন প্রস্তাবই যদি সম্ভবপর না হয় তবে এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য কি? এ প্রবন্ধে দুইটি বক্তব্য আছে। প্রথমটি এই যে আমাদের সুগম্ভীর সুসংযত দেশেও এক দল আছে যাহাদের ছেলেমানুষীর প্রতি একান্ত বিরাগ নাই—ইহারা আর কেহ নহে বালক বালিকার দল। ইহারা, আদি-কাল হইতে আজও পর্য্যন্ত, এবং পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত, একই স্বভাবসম্পন্ন। ইহাদের সুবিধা অনুসারে, দেশীয় অথবা বিদেশীয় নানা প্রকার নৃত্য শিখাইলে যেমন সুসঙ্গত ও সুশোভন হয়, তেমনি উহাদেরও পিতামাতাদের উভয়ের পক্ষে

আনন্দদায়ক হয়; তাহার উপর ইহাতে ছেলেদের শারীরিক ও মানসিক শিক্ষার বিশেষ সহায়তা করে।

শারীরিক শিক্ষা কথাটা হয়ত একটু অদ্ভুত শুনাইবে। সাধারণ বিশ্বাস এই যে, শরীর হৃষ্টপুষ্ট হইলে তাহার আর কোন অভাব থাকে না। কিন্তু যেমন, একটা লোক স্বভাবতঃ যতই বুদ্ধিমান হোক না কেন, বিদ্যাশিক্ষা না করিলে সে বুদ্ধিকে সম্পূর্ণরূপে প্রয়োগ করিতে পারিবে না, সেইরূপ দেহ যতই বলিষ্ঠ হোক না কেন, সে দেহের উপযুক্ত শিক্ষা না হইলে, তাহার দ্বারা দৈনিক সহজ কার্য্যগুলি শোভনরূপে, ও কোন কঠিন কার্য্য অনায়াসে হইবে না। সুতারের কাঠ প্রভৃতি সম্বন্ধে, অথবা কামারের লোহা প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান আছে; সুশিক্ষিত ভদ্রলোকের, ব্যবসায়ী অপেক্ষা, বিশেষ বিষয়ে কম জ্ঞান থাকিলেও, সাধারণ জ্ঞান অধিক থাকা উচিৎ; সেইরূপ সচরাচর ভদ্রলোক পাকা দাঁড়ির মত দাঁড় টানাতে অথবা পাকা লাঠিয়ালের মত লাঠি খেলাতে মজবুত না হইলেও, তাহার সাধারণ শারীরিক পটুতা ইহাদের অপেক্ষা অধিক হওয়া উচিৎ, অর্থাৎ উঠা, বসা, চলা, খেলা এবং ভদ্রলোকের অবশ্যকর্ত্তব্য সকল কার্য্যই উহার নিপুণ এবং শোভনরূপে করিতে পারা উচিৎ।

এ বিষয়ে আমাদের মনোযোগ কতটা কম এবং অভাব কতটা বেশী তাহা ইংরাজদের সহিত তুলনা না করিলে সম্পূর্ণরূপে বুঝা যায় না। আমাদের চলিবার সময়ে এলাগোলা ভাব, যেন গায়ের সহিত হাত পা মাথা ভাল করিয়া জোড়া হয় নাই; আমাদের কোমর ভাঙ্গিয়া কুঁজা হইয়া বসা, আমাদের এলোমেলো ভাবে দাঁড় টানা, টেনিস্ প্রভৃতি খেলা;—ইহার সহিত ইংরাজদের যেন স্প্রিংবসানো অনায়াস চাল, সহজ ভাবে খাড়া হইয়া বসা,

সুছাঁদভাবে ব্যায়াম করা তুলনা করিয়া দেখিলে, তবেই প্রকৃত পক্ষে, শিক্ষিত শরীর কাহাকে বলে, তাহা বুঝা যায়। বিলাতে গেলে, শিক্ষিত ভদ্রসম্প্রদায়ের কি মেয়ের কি পুরুষের প্রত্যেক ছোটখাট কার্য্য করিবার শোভনতায় মুগ্ধ দৃষ্টি আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে না।

এরূপ শিক্ষার অবশ্য অনেক রকম উপায় হইতে পারে, কিন্তু তাহার মধ্যে ছেলেবেলায় উপযুক্ত লোকের নিকট নাচ শেখাটা যেমন সহজ, তেমনি প্রীতিকর, এবং ইহা, অন্যান্য পড়াশুনার উপর একটা উপরি বোঝা না হইয়া, বরং ছেলেমেয়েদের নিকট ছুটির সময়ের একটা খেলার মত বোধ হইবে। এরূপ শারীরিক গতি-সংযম অভ্যাস করার অনেক স্বাস্থ্যকর সুফল আছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই ত গেল অঙ্গচালনা হিসাবে নৃত্য। এখন দেখা যাক্ কলা হিসাবে, অর্থাৎ সঙ্গীতের অঙ্গহিসাবে উহাকে কি স্থান দেওয়া যাইতে পারে। ভাবপ্রকাশের তিন অঙ্গ আছে; কথা, সুর এবং অঙ্গভঙ্গী। আমরা যখন বিশেষরূপে সৌন্দর্য্যভাবকে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি, তখন কথাকে সুন্দর কবিতায়, সুরকে সুন্দর সঙ্গীতে এবং অঙ্গভঙ্গীকে সুন্দর নৃত্যে পরিণত করিলে তবে আমাদের উদ্দেশ্য প্রকৃষ্টরূপে সাধিত হইতে পারে। আমাদের দেশেও ভাব বাৎলান নৃত্যের একটা অঙ্গ বলিয়া গণ্য হয়। কিন্তু সচরাচর যে রকম ভাব বাৎলান হইয়া থাকে তাহা সন্তোষজনক নহে—তাহাতে সঙ্গীতের ভাবকে হৃদয়গ্রাহী করিবার বড় সাহায্য করে না, বরং মনকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয়। ইহার কারণ এই যে, গানের মুখ্য ভাবের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া, আনুষঙ্গিক ছোটখাট ভাবের প্রতি অধিক মনোযোগ দেওয়া হয়। 'পিয়া'র নিকট

যখন একজন লোক যাইতেছে এবং পথে বজ্রবিদ্যুতে চকিত হইয়া উঠিতেছে, তখন সে ব্যক্তি 'বিজুলি চম্‌কানো'তে কি রূপে ভয় পাইতেছে তাহাই বেশী করিয়া দেখান হয়; গানের যেটা আসল উদ্দেশ্য, অর্থাৎ শ্রোতার মনে উক্ত বিরহীর উদ্বিগ্ন চিত্তের একটি চিত্র আনয়ন করা, তাহার প্রতি মনোযোগ দেওয়া হয় না।

তাহা ছাড়া ভাববাৎলান আর অভিনয়ে যে প্রভেদ আছে সেটাও মনে রাখা কর্ত্তব্য। শেষোক্তের ন্যায় সম্পূর্ণ চিত্র প্রদর্শন করা ভাববাৎলানর উদ্দেশ্য নহে। গানের ভাবকে পরিস্ফুটন কার্য্যে সহায়তা করাই উহার প্রকৃত উদ্দেশ্য; সেই জন্য, দুঃখের গানে ম্লান মুখভাব ও অঙ্গে শিথিলতার ভঙ্গী, সুখের গানে মুখে ঈষৎহাসি ও দেহের সোৎসাহ ভাব, উত্তেজনার গানে বিস্ফারিত বক্ষ, ঋজু দেহ, আবশ্যকমত উত্তেজনার ভঙ্গীতে হস্তোত্তলন বা পদাঘাত,—এইরূপ শারীরিক ইঙ্গিতমাত্রই ব্যবহার করা উচিত, কারণ রীতিমত অভিনয় কেবল নাট্যমঞ্চের আশপাশের সমস্ত আয়োজনের মধ্যেই সত্য বলিয়া মনে হয়; উহার বাহিরে বড় ন্যাকামির মত দেখায়। তবে যেরূপ ভাববাৎলান অনুমোদন করা গেল তাহাকেও ঠিক নৃত্যের অঙ্গ বলা যায় না।

অর্থাৎ, কোন রূপ নকল করা নৃত্যেরও অঙ্গ নহে সঙ্গীতেরও অঙ্গ নহে। গানের কথার কোথাও যদি থাকে দোয়েল ডাকিতেছে অমনি যদি হঠাৎ দোয়েলের মত শিশ্ দিয়া উঠা যায় তবে তাহার মধ্যে যতই নৈপুণ্য থাক্ তাহা উচ্চ অঙ্গের সঙ্গীতের মধ্যে গণ্য হইতে পারে না। পাখীর গান শুনিয়া মনে যে একটা অনির্দ্দিষ্ট সৌন্দর্য্যের ভাব জাগ্রত হয়, সঙ্গীতও সুরের বিন্যাস করিয়া শ্রোতার মনে সেই জাতীয় ভাবের উদ্রেক করিতে চেষ্টা করে—পাখীর গানের অবিকল নকল করিয়া সে উদ্দেশ্য সাধন করে না।

তেমনি প্রিয়সমাগমোৎসুক নায়িকা সাজসজ্জা করিতেছে এই বর্ণনাটির মধ্যে যে একটি সৌন্দর্য্যের ভাব জড়িত আছে, সুন্দর নৃত্য সেই ভাবটি মাত্র জাগ্রত করিবার সহায়তা করে—সাজসজ্জা করিবার কাজগুলির অবিকল নকল করিবার চেষ্টা করা কলা-কৌশলের অদ্ভুত বিড়ম্বনা মাত্র। হর্‌বোলার বিদ্যাটাকে যদি সঙ্গীত বিদ্যা বলা যায়, তবে আমাদের প্রচলিত নৃত্যের ভাববাৎলা-নোকেও নৃত্য নাম দেওয়া যাইতে পারে।

আজকাল, কলা হিসাবে, নৃত্যকে প্রধানতঃ গীতিনাট্যে স্থান দেওয়া উচিত। আমাদের দেশে গীতিনাট্য এখনো সেরূপ প্রতি-পত্তি লাভ করে নাই। অনেকে উহার উদ্দেশ্য এবং অর্থ বুঝিতেই পারেন না। তাঁহারা বলেন, নাটকের উদ্দেশ্য প্রকৃত জীবনের একটি সঠিক চিত্র প্রদশন করা। কিন্তু প্রকৃত জীবনে লোকে কবিতাতেও কথা কহে না, সুর করিয়াও ভাব প্রকাশ করিবার চেষ্টা করে না। তবে এরূপ ছেলেখেলার অর্থ কি? এ রকম কল্পনা-শক্তিহীন লোককে সংক্ষেপে উত্তর দিতে হইলে এই বলিতে হয় প্রকৃত জীবনে যাহা ঘটিতেছে নাট্যমঞ্চে তাহাই যদি যথাযথভাবে দেখিতে চাও তবে আসল ছাড়িয়া নকল দেখিবার কি আবশ্যক? রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া দেখ না। প্রকৃত পক্ষে, নাটক আমাদিগকে সংসারের অবিকল নকল দেখায় না—পরন্তু সংসারের ভিতর-কার যে গভীর সুখ দুঃখ ও সৌন্দর্য্য যাহা বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন সামান্য-ভাবে আমাদের চোখে পড়ে নাটক তাহাকেই সংহত সমগ্র সম্পূর্ণ ভাবে আমাদের সম্মুখে উপনীত করে—সংসারযাত্রার অবিকল নকল করিলে আমরা তাহা কখনই পাইতাম না। এই জন্য নাট্যাভিনয় ব্যাপারটাও স্বভাবের মাছিমারা নকল নহে। এক ত নাট্যমঞ্চই নাটকের বিষয়টাকে সাধারণ সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন

করিয়া একটা স্বতন্ত্র কৃত্রিম গণ্ডীর মধ্যে বদ্ধ করিয়া ফেলে;—কারণ দর্শকের মনে এমন একটি মোহসঞ্চার করা আবশ্যক যাহাতে তাহারা প্রকৃত সংসারকে ভুলিতে পারে—যাহাতে তাহারা মনে করিতে পারে এমন একটি জগতে গিয়াছি যেখানে প্রকৃত জগতের শত সহস্র অপ্রাসঙ্গিতা বিচ্ছিন্নতা তুচ্ছতা নাই—যেখানে একটা হইতে আরেকটা আসিয়া পড়ে না, যেখানে রসভঙ্গ নাই, ঘটনাসূত্রের বিচ্ছেদ নাই, যেখানে অন্তরের অত্যন্ত সুগভীর দুরূহ দুষ্প্রকাশ্য ভাবগুলিও লোকে সহজে সুন্দররূপে ব্যক্ত করিতে পারে, যেখানে সংসারের তুচ্ছ প্রথা ও অভ্যাসের আবরণগুলি অপসারিত করিয়া দিয়া মানবের গূঢ় প্রবল মনোভাবগুলি মেঘমুক্ত সূর্য্য হইতে সূর্য্যরশ্মির মত প্রকাশিত হইয়া পড়ে। অতএব যখন গীতিনাট্য দেখিতে প্রস্তুত হইব তখন যবনিকা উঠিলেই, কল্পনার রথে আরোহণ পূর্ব্বক, প্রতিদিনকার গন্থরাজ্য ছাড়িয়া, সৌন্দর্য্যের মায়ারাজ্যে গিয়া উপস্থিত হইতে হইবে। সেখানে অদ্ভুত ঘটনা ঘটে, কবিতায় কথা হয়, সুরে ভাব ব্যক্ত হয় এবং সেখানকার সুন্দর নরনারীগণ মনোহরবেশে সুরম্যস্থানে সুসজ্জিত হইয়া থাকে। এ রাজ্যে যে কখনো গিয়াছে সেই আমাদের এ কথারও সার্থকতা বুঝিতে পারিবে যে, এ রাজ্যের স্বাভাবিক চলাফেরাও নৃত্য হওয়া উচিত। দুঃখের শিথিলতা, সুখের হিল্লোল, আনন্দের উচ্ছ্বাস, ক্রোধের মত্ততা প্রভৃতি মনের ভাবের সকল রকম বাহ্যিক প্রকাশের উপযুক্ত নৃত্য—তালে ঈষৎ শরীর আন্দোলন হইতে গতির প্রবলতা বা সুনিপুণ দ্রুত পদক্ষেপ পর্য্যন্ত—পাওয়া যাইতে পারে।

গীতিনাট্যে বাজনা এবং নাচ, উভয়েরই ব্যবহারে আম. য়ুরোপীয়দের তুলনায় অনেক পিছাইয়া আছি। ফাল্গুন মাসে

সাধনায় আমরা, গানের সহিত বাজনার যোজনাতে য়ুরোপীয় প্রণালীর দ্বারা কি রকমের সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে, সে সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম। নাচ সম্বন্ধেও এ কথা বলা যাইতে পারে যে, য়ুরোপের গীতিনাট্যে এবং অন্যত্র, উহা কি প্রকারে ব্যবহার হইয়া থাকে দেখিলে, নৃত্যকে কি উপায়ে ভাবোদ্রেকের কাজে লাগাইতে হয়, সে বিষয়ে ধারণা হইবে।

সরলতা।

স্রোতস্বিনী কোন এক বিখ্যাত ইংরাজ কবির উল্লেখ করিয়া বলিলেন, কে জানে, তাঁহার রচনা আমার কাছে ভাল লাগে না।

দীপ্তি আরো প্রবলতরভাবে স্রোতস্বিনীর মত সমর্থন করিলেন।

সমীরণ কখন পারতপক্ষে মেয়েদের কোন কথার স্পষ্ট প্রতিবাদ করে না। তাই সে একটু হাসিয়া ইতস্তত করিয়া কহিল, কিন্তু অনেক বড় বড় সমালোচক তাঁহাকে খুব উচ্চ আসন দিয়া থাকেন।

দীপ্তি কহিলেন, আগুন যে পোড়ায় তাহা ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য কোন সমালোচকের সাহায্য আবশ্যক করে না—তাহা নিজের বাম হস্তের কড়ে আঙুলের ডগার দ্বারাও বোঝা যায়—ভাল কবিতার ভালত্ব যদি তেমনি অবহেলে না বুঝিতে পারি তবে আমি তাহার সমালোচনা পড়া আবশ্যক বোধ করি না।

আগুনের যে পোড়াইবার ক্ষমতা আছে সমীরণ তাহা জানিত, এই জন্য সে চুপ করিয়া রহিল; কিন্তু ব্যোম বেচারার সে

সকল বিষয়ে কোনরূপ কাণ্ডজ্ঞান ছিল না এই জন্য সে উচ্চস্বরে আপন স্বগত-উক্তি আরম্ভ করিয়া দিল।

সে বলিল—মানুষের মন মানুষকে ছাড়াইয়া চলে, অনেক সময়ে তাহাকে নাগাল পাওয়া যায় না;——

ক্ষিতি তাহাকে বাধা দিয়া কহিল—ত্রেতাযুগে হনুমানের শত যোজন লাঙ্গুল শ্রীমান্ হনুমানজীউকে ছাড়াইয়া বহুদূরে গিয়া পৌঁছিত;—লাঙ্গুলের ডগাটুকুতে যদি উকুন বসিত তবে তাহা চুলকাইয়া আসিবার জন্য ঘোড়ার ডাক বসাইতে হইত। মানুষের মন হনুমানের লাঙ্গুলের অপেক্ষাও সুদীর্ঘ, সেই জন্য এক এক সময়ে মন যেখানে গিয়া পৌঁছায়, সমালোচকের ঘোড়ার ডাক ব্যতীত সেখানে হাত পৌঁছে না। ল্যাজের সঙ্গে মনের প্রভেদ এই যে, মনটা আগে আগে চলে এবং ল্যাজটা পশ্চাতে পড়িয়া থাকে—এই জন্যই জগতে ল্যাজের এত লাঞ্ছনা এবং মনের এত মাহাত্ম্য।

ক্ষিতির কথা শেষ হইলে ব্যোম পুনশ্চ আরম্ভ করিল—বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য জানা, এবং দর্শনের উদ্দেশ্য বোঝা, কিন্তু কাণ্ডটি এমনি হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, বিজ্ঞানটি জানা এবং দর্শনটি বোঝাই অন্য সকল জানা এবং অন্য সকল বোঝার অপেক্ষা শক্ত হইয়া উঠিয়াছে;—ইহার জন্য কত ইস্কুল, কত কেতাব, কত আয়োজন আবশ্যক হইয়াছে! সাহিত্যের উদ্দেশ্য আনন্দ দান করা, কিন্তু সেই আনন্দটি গ্রহণ করাও নিতান্ত সহজ নহে—তাহার জন্যও বিবিধ প্রকার শিক্ষা এবং সাহায্যের প্রয়োজন। সেই জন্যই বলিতেছিলাম, দেখিতে দেখিতে মন এতটা অগ্রসর হইয়া যায়, যে, তাহার নাগাল পাইবার জন্য সিঁড়ি লাগাইতে হয়। যদি কেহ অভিমান করিয়া বলেন, যাহা বিনা শিক্ষায় না জানা যায় তাহা

বিজ্ঞান নহে, যাহা বিনা চেষ্টায় না বোঝা যায় তাহা দর্শন নহে এবং যাহা বিনা সাধনায় আনন্দ দান না করে তাহা সাহিত্য নহে, তবে কেবল খনার বচন, প্রবাদ বাক্য এবং পাঁচালি অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে অনেক পশ্চাতে পড়িয়া থাকিতে হইবে।

সমীরণ কহিল, মানুষের হাতে সব জিনিষই ক্রমশঃ কঠিন হইয়া উঠে। অসভ্যেরা যেমন-তেমন চীৎকার করিয়াই উত্তেজনা অনুভব করে, অথচ আমাদের এমনি গ্রহ, যে, বিশেষ অভ্যাস-সাধ্য শিক্ষাসাধ্য সঙ্গীত ব্যতীত আমাদের সুখ নাই; আরো গ্রহ এই, যে, ভাল গান করাও যেমন শিক্ষাসাধ্য, ভাল গান হইতে সুখ অনুভব করাও তেমনি শিক্ষাসাধ্য। তাহার ফল হয় এই, যে, এক সময়ে যাহা সাধারণের ছিল, ক্রমেই তাহা সাধকের হইয়া আসে। চীৎকার সকলেই করিতে পারে, এবং চীৎকার করিয়া অসভ্য সাধারণে সকলেই উত্তেজনাসুখ অনুভব করে—কিন্তু গান সকলে করিতে পারে না এবং গানে সকলে সুখও পায় না। কাজেই, সমাজ যতই অগ্রসর হয় ততই অধিকারী এবং অনধিকারী, রসিক এবং অরসিক এই দুই সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইতে থাকে।

ক্ষিতি কহিল, মানুষ বেচারাকে এম্‌নি করিয়া গড়া হইয়াছে, যে, সে যতই সহজ উপায় অবলম্বন করিতে চায় ততই দুরূহতার মধ্যে জড়ীভূত হইয়া পড়ে। সে সহজে কাজ করিবার জন্য কল তৈরি করে কিন্তু কল জিনিষটা নিজে এক বিষম দুরূহ ব্যাপার; সে সহজে সমস্ত প্রাকৃতজ্ঞানকে বিধিবদ্ধ করিবার জন্য বিজ্ঞান সৃষ্টি করে কিন্তু সেই বিজ্ঞানটাই আয়ত্ত করা কঠিন কাজ; সুবিচার করিবার সহজ প্রণালী বাহির করিতে গিয়া আইন বাহির হইল, শেষকালে আইনটা ভাল করিয়া বুঝিতেই দীর্ঘজীবী লোকের বারো আনা জীবনদান করা আবশ্যক হইয়া পড়ে; সহজে আদান-

প্রদান চালাইবার জন্য টাকার সৃষ্টি হইল, শেষকালে টাকার সমস্যা এমনি এক সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে, যে, মীমাংসা করে কাহার সাধ্য! সমস্ত সহজ করিতে হইবে এই চেষ্টায় মানুষের জানা শোনা খাওয়া দাওয়া আমোদ প্রমোদ সমস্তই অসম্ভব শক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

স্রোতস্বিনী কহিলেন—সেই হিসাবে কবিতাও শক্ত হইয়া উঠিয়াছে; এখন মানুষ খুব স্পষ্টতঃ দুইভাগ হইয়া গিয়াছে; এখন অল্প লোকে ধনী এবং অনেকে নির্দ্ধন, অল্প লোকে গুণী এবং অনেকে নির্গুণ; এখন কবিতাও সর্ব্বসাধারণের নহে, তাহা বিশেষ লোকের; সকলি বুঝিলাম। কিন্তু কথাটা এই, যে, আমরা যে বিশেষ কবিতার প্রসঙ্গে এই কথাটা তুলিয়াছি, সে কবিতাটা কোন অংশেই শক্ত নহে; তাহার মধ্যে এমন কিছুই নাই যাহা আমাদের মত লোকও বুঝিতে না পারে—তাহা নিতান্তই সরল, অতএব তাহা যদি ভাল না লাগে তবে সে আমাদের বুঝিবার দোষে নহে।

ক্ষিতি এবং সমীরণ ইহার পরে আর কোন কথা বলিতে ইচ্ছা করিল না। কিন্তু ব্যোম অম্লান মুখে বলিতে লাগিল—যাহা সরল তাহাই যে সহজ এমন কোন কথা নাই। অনেক সময় তাহাই অত্যন্ত কঠিন, কারণ, সে নিজেকে বুঝাইবার জন্য কোনপ্রকার বাজে উপায় অবলম্বন করে না,—সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে; তাহাকে না বুঝিয়া চলিয়া গেলে সে কোনরূপ কৌশল করিয়া ফিরিয়া ডাকে না। সরলতার প্রধান গুণ এই যে, সে একেবারে অব্যবহিত ভাবে মনের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করে—তাহার কোন মধ্যস্থ নাই। কিন্তু যে সকল মন মধ্যস্থের সাহায্য ব্যতীত কিছু গ্রহণ করিতে পারে না, যাহাদিগকে ভুলাইয়া আকর্ষণ করিতে

হয়, সরলতা তাহাদের নিকট বড়ই দুর্ব্বোধ। কৃষ্ণনগরের কারীগরের রচিত ভিস্তি তাহার সমস্ত রং চং মশক্ এবং অঙ্গভঙ্গী দ্বারা আমাদের ইন্দ্রিয় এবং অভ্যাসের সাহায্যে চট্ করিয়া আমাদের মনের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে—কিন্তু গ্রীক্ প্রস্তরমূর্ত্তিতে রং চং রকম সকম্ নাই—তাহা সরল এবং সর্ব্বপ্রকার প্রয়াসবিহীন। কিন্তু সরল বলিয়া তাহা সহজ নহে। সে কোনপ্রকার তুচ্ছ বাহ্যিক কৌশল অবলম্বন করে না বলিয়াই ভাবসম্পদ তাহার অধিক থাকা চাই।

দীপ্তি বিশেষ একটু বিরক্ত হইয়া কহিল—তোমার গ্রীক্ প্রস্তরমূর্ত্তির কথা ছাড়িয়া দাও! ও সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিয়াছি এবং বাঁচিয়া থাকিলে আরও অনেক কথা শুনিতে হইবে। ভাল জিনিষের দোষ এই, যে, তাহাকে সর্ব্বদাই পৃথিবীর চোখের সাম্‌নে থাকিতে হয়, সকলেই তাহার সম্বন্ধে কথা কহে, তাহার আর পর্দ্দা নাই, আব্রু নাই; তাহাকে আর কাহারও আবিষ্কার করিতে হয় না, বুঝিতে হয় না, ভাল করিয়া চোখ মেলিয়া তাহার প্রতি তাকাইতেও হয় না, কেবল তাহার সম্বন্ধে বাঁধিগৎ শুনিতে এবং বলিতে হয়। সূর্য্যের যেমন মাঝে মাঝে মেঘগ্রস্ত থাকা উচিত, নতুবা মেঘমুক্ত সূর্য্যের গৌরব বুঝা যায় না, আমার বোধ হয় পৃথিবীর বড় বড় খ্যাতির উপরে মাঝে মাঝে সেইরূপ অবহেলার আড়াল পড়া উচিত—মাঝে মাঝে গ্রীক্ মূর্ত্তির নিন্দা করা ফেশান্ হওয়া ভাল, মাঝে মাঝে সর্ব্বলোকের নিকট প্রমাণ হওয়া উচিত যে, কালিদাস অপেক্ষা চাণক্য বড় কবি। নতুবা আর সহ্য হয় না। যাহা হউক্ ওটা একটা অপ্রাসঙ্গিক কথা। আমার বক্তব্য এই, যে, অনেক সময়ে ভাবের দারিদ্র্যকে আচারের বর্ব্বরতাকে সরলতা বলিয়া ভ্রম হয়, অনেক সময় প্রকাশক্ষমতার

অভাবকে ভাবাধিক্যের পরিচয় বলিয়া কল্পনা করা হয়—সে কথা-টাও মনে রাখা কর্ত্তব্য।

আমি কহিলাম, কলাবিদ্যায় সরলতা উচ্চ অঙ্গের মানসিক উন্নতির সহচর। বর্ব্বরতা সরলতা নহে। বর্ব্বরতার রং চং আড়ম্বর আয়োজন অত্যন্ত বেশি। সভ্যতা অপেক্ষাকৃত নিরলঙ্কার। অধিক অলঙ্কার আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে কিন্তু মনকে প্রতিহত করিয়া দেয়। আমাদের বাঙ্গলা ভাষায় কি খবরের কাগজে, কি উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যে সরলতা এবং অপ্রমত্ততার অভাব দেখা যায়;—সকলেই অধিক করিয়া, চীৎকার করিয়া, এবং ভঙ্গিমা করিয়া বলিতে ভালবাসে; বিনা আড়ম্বরে সত্য কথাটি পরিষ্কার করিয়া বলিতে কাহারও প্রবৃত্তি হয় না; কারণ, এখনও আমাদের মধ্যে একটা আদিম বর্ব্বরতা আছে; সত্য সরল বেশে আসিলে তাহার গভীরতা এবং অসামান্যতা আমরা দেখিতে পাই না, ভাবের সৌন্দর্য্য কৃত্রিম ভূষণে এবং সর্ব্বপ্রকার আতিশয্যে ভারাক্রান্ত হইয়া না আসিলে আমাদের নিকট তাহার মর্য্যাদা নষ্ট হয়।

সমীরণ কহিল—কলাবিদ্যায়, সরলতা অর্থে দৈন্য নহে, সরলতা অর্থে স্বাভাবিক সংযম—বিনা চেষ্টায় বিনা আস্ফালনে নিজের সহজ স্বরূপে প্রকাশ হওয়া। সংযম ভদ্রতার একটি প্রধান লক্ষণ। ভদ্রলোকেরা কোন প্রকার গায়ে-পড়া আতিশয্য দ্বারা আপন অস্তিত্ব উৎকটভাবে প্রচার করে না;—বিনয় এবং সংযমের দ্বারা তাহারা আপন মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া থাকে। অনেক সময়ে সাধারণ লোকের নিকট সংযত সুসমাহিত ভদ্রতার অপেক্ষা আড়ম্বর এবং আতিশয্যের ভঙ্গিমা অধিকতর আকর্ষণজনক হয় কিন্তু সেটা ভদ্রতার দুর্ভাগ্য নহে সে সাধারণের ভাগ্যদোষ। সাহিত্যে

সংযম এবং আচারব্যবহারে সংযম উন্নতির লক্ষণ—আতিশয্যের দ্বারা দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টাই বর্ব্বরতা।

আমি কহিলাম—এক আধটা ইংরাজি কথা মাপ করিতে হইবে। যেমন ভদ্রলোকের মধ্যে, তেমনি ভদ্র সাহিত্যেও, ম্যানার্ আছে কিন্তু ম্যানারিজ্‌ম্ নাই। ভাল সাহিত্যের বিশেষ একটি আকৃতি প্রকৃতি আছে সন্দেহ নাই—কিন্তু তাহার এমন একটি পরিমিত সুষমা যে আকৃতিপ্রকৃতির বিশেষত্বটাই বিশেষ করিয়া চোখে পড়ে না। তাহার মধ্যে একটা ভাব থাকে, একটা গূঢ় প্রভাব থাকে, কিন্তু কোন অপূর্ব্ব ভঙ্গিমা থাকে না। তরঙ্গভঙ্গের অভাবে অনেক সময়ে পরিপূর্ণতাও লোকের দৃষ্টি এড়াইয়া যায়, আবার পরিপূর্ণতার অভাবে অনেক সময়ে তরঙ্গভঙ্গও লোককে বিচলিত করে, কিন্তু তাই বলিয়া এ ভ্রম যেন কাহারও না হয় যে, পরিপূর্ণতার সরলতাই সহজ এবং অগভীরতার ভঙ্গিমাই দুরূহ।

স্রোতস্বিনীর দিকে ফিরিয়া কহিলাম, উচ্চশ্রেণীর সরল সাহিত্য বুঝা অনেক সময় এই জন্য কঠিন, যে, মন তাহাকে বুঝিয়া লয় কিন্তু সে আপনাকে বুঝাইতে থাকে না।

দীপ্তি কহিল, নমস্কার করি,—আজ আমাদের যথেষ্ট শিক্ষা হইয়াছে। আর কখনও উচ্চ অঙ্গের পণ্ডিতদিগের নিকট উচ্চ অঙ্গের সাহিত্য সম্বন্ধে মত ব্যক্ত করিয়া বর্ব্বরতা প্রকাশ করিব না।

স্রোতস্বিনী সেই ইংরাজ কবির নাম করিয়া কহিল, তোমরা যতই তর্ক কর এবং যতই গালি দাও, সে কবির কবিতা আমার কিছুতেই ভাল লাগে না।

স্বরলিপি।

শঙ্করা—কাওয়ালী।

চল্‌রে চল সবে ভারত-সন্তান,
মাতৃভূমি করে আহ্বান।
বীর-দর্পে পৌরুষ-গর্ব্বে
সাধ্‌রে সাধ্‌ সবে দেশের কল্যাণ॥
দেশ দেশান্তে, যাওরে আন্‌তে, নব নব জ্ঞান।
নব ভাবে, নবোৎসাহে, জাগো,
উঠাও রে নবতর তান॥
এক চিত্তে কর তপ, এক মন্ত্র জপ,
শিক্ষা, দীক্ষা, লক্ষ্য, ইচ্ছা, এক—
এক সুরে গাও সবে গান॥
লোকনিন্দা লোকভয়ে না করি দৃক্‌পাত,
যাহা শুভ, যাহা সত্য, ন্যায়,
তাহাতে জীবন কর দান॥
অপমান পদাঘাত স'বে কত আর,
তেজ, বীর্য্য, লজ্জা, মান—সব্‌
হয়েছে কি অন্তর্ধান?॥
উচ্চ গৌরবের তরে তুচ্ছ নয় কি প্রাণ?
হোক্‌ না যতই কঠিন ভীষণ বাধা,
ভেঙ্গে চুরে কর্‌ খান্‌ খান্‌॥

৸।৹

২´ ৩
। র্সাঃ র্সঃ নর্সা ধনা॥ পনা ধর্সা না -া। পাঃ ক্ষপঃ গা পা।
। চল্‌ রে চল্‌ সবে॥ ভার ত,স ন্তা ন্‌। মা তৃ ভূ মি।

১ ॥

। গগা রা সা -া। সা -গা সা গা। পা সসা গা পধা।

। করে আ হ্বা -ন্। বী র্ দ র্পে। পৌ রুষ গ র্ব্বে।

। র্সাঃ নঃ র্রর্সা-র্সর্সা। ননা ধনা পা -ধা। র্সাঃ র্সঃ নর্সা ধনা॥

। সাধ্ রে সাধ্ সবে। দেশে র,ক ল্যা -ণ্। চল্ রে চল্ সবে॥

২´

। র্সাঃ র্গঃ র্রা র্মা। র্গাঃ র্রঃ র্সা নধনা।

।(১) দেশ দে শা ন্তে। যাও রে আন্ তে।

।(২) এ ক চি ত্তে। ক র ত- প্।

।(৩) লো ক নি ন্দা। লো ক ভ য়ে।

।(৪) অ প মা ন্। প দা ঘা ত।

।(৫) উ চ্চ গৌ র। বে র ত রে।

। পাঃ নঃ ধা র্সা। না -া -া -া।

।(১) ন ব ন ব। জ্ঞা — — ন।

।(২) এ ক ম ন্ত্র। জ — — প্।

।(৩) না ক রি দৃক্। পা — — ত্।

।(৪) স বে ক ত। আ — — র।

।(৫) তু চ্ছ নয় কি। প্রা — — ণ্।

। গা পা মা ধা। পা না ধা র্সা। না র্রা -া -া।

।(১) ন ব ভা বে। ন বোৎ সা হে। জা গো — —।

।(২) শী ক্ষা দী ক্ষা। ল ক্ষ্য ই চ্ছা। এ — — ক্।

।(৩) যা হা শু ভ। যা হা স ত্য। ন্যা — — য়।

।(৪) তে জ বী র্য্য। ল জ্জা মা ন্। স — — ব্।

।(৫) হোক্ না য তই। ক ঠিন্ ভী ষণ্। বা ধা — —।

।	র্গর্রা	র্সর্সা	নধা	পধা	। র্সা	-া	না	ধনা	॥
।(১)	উঠ	ওরে	নব	তর	। তা	-ন্	স	বে	॥
।(২)	এক	সুরে	গাও	সবে	। গা	-ন্	স	বে	॥
।(৩)	তাহা	তে,জী	বন	কর	। দা	-ন্	স	বে	॥
।(৪)	হয়ে	ছে কি	অ	স্ত	। র্ধা	-ন্	স	বে	॥
।(৫)	ভেঙ্গে	চূরে	কর্	থান্	। থা	-ন্	স	বে	॥

ব্যাখ্যা।

১। হ্ম=কড়ি মধ্যম।

২। দ্বিতীয় তাল সম হইতে এই গানের-আরম্ভ।

৩। গানের প্রত্যেক কলির শেষে যেখানে যুগল ছেদ দেখিবে, সেখান হইতে ফিরিয়া গিয়া গোড়ার যুগল ছেদ হইতে আবার গান আরম্ভ করিবে।

৪। ।=এক মাত্রা ; ।ঃ=দেড় মাত্রা ; ঃ=অর্দ্ধ মাত্রা।

৫। কলিগুলির সুর এক রকম বলিয়া স্বতন্ত্র স্বরলিপি না করিয়া একই স্বরলিপির নীচে কলিগুলি সংখ্যাঙ্কিত করিয়া যথাক্রমে পর-পর বসান হইয়াছে। প্রত্যেক কলির, প্রথম পংক্তিতে যে সংখ্যাঙ্ক দেখিবে, সেই সংখ্যাঙ্ক পরবর্ত্তী যে যে পংক্তির গোড়ায় সেই সেই পংক্তি পূর্ব্বেরই অনুবৃত্তি বলিয়া বুঝিবে।

মেয়েলি ব্রত।

১

রাম দুর্গা বা পূর্ণিমার ব্রত।

আমাদের দেশে পল্লিগ্রামের নারীসমাজে নানাবিধ বারব্রত প্রচলিত আছে। অবিবাহিতা বালিকা, যুবতী এবং বৃদ্ধা সকলেই কোন না কোন ব্রত করিয়া থাকেন। বয়স, এবং সধবা কি বিধবা ইত্যাদি অবস্থাভেদে ব্রতেরও অধিকারভেদ আছে। স্বামীকামনা,

পুত্রকামনা, স্বামী ও পুত্রের কল্যাণকামনা, ঐশ্বর্য্যকামনা, ইত্যাদিরূপ কাম্যবস্তুর উদ্দেশ্যে এই সকল ব্রত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই উদ্দেশ্য ইহজন্মে সিদ্ধ হইতে পারে, জন্মান্তরেও হইতে পারে, সুতরাং ব্রতানুষ্ঠান নিষ্ফল, একথা বলিবার যো নাই। ব্রতচর্য্যা করিয়া যিনি ইহজন্মেই অভীষ্ট ফল লাভ করিলেন, তিনি ত পরম সৌভাগ্যশালিনী, যিনি তাহা পারিলেন না, তাঁহারও নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই। আবার কোন কোন ব্রত কেবল্ পরজন্মের উদ্দেশ্যেই অনুষ্ঠিত হয়, যেমন "দুধে-আল্‌তা" এবং "ধনগছান"। যিনি অদৃষ্টবশতঃ ইহজন্মে শারীরিক শোভা সৌন্দর্য্যে বঞ্চিত হইয়াছেন, তিনি আগামী জন্মে দুগ্ধমিশ্রিত আল্‌তার ন্যায় চম্পকগৌরকান্তি লাভ করিবার জন্য "দুধে-আল্‌তা" ব্রত করিয়া থাকেন। "ধনগছান" ব্রতটী মূলধনের বহুগুণ সুদ প্রদানকারী একটী প্রকাণ্ড 'ব্যাঙ্ক' বিশেষ। দুই চারিটী কড়ি ও ধান, একটী পৈতার সহিত কোন ব্রাহ্মণকে গচ্ছিতস্বরূপ দান করিলেই পরজন্মে প্রচুর ধনধান্য লাভ হয়, সুতরাং নিতান্ত নির্ব্বোধ ব্যতীত এমন সুযোগ কেহই পরিত্যাগ করিতে পারেন না।

এই সকল ব্রতের মধ্যে কতকগুলি শাস্ত্রীয়, যেমন "সাবিত্রীব্রত" "অনন্তব্রত" ইত্যাদি আর কতকগুলি অশাস্ত্রীয় বা "মেয়েলি শাস্ত্রীয়" যেমন "সাঁজপূজনী", "পুন্নিপুকুর" ও "ইতুসংক্রান্তি" ইত্যাদি। পুরোহিতের পুঁথিপত্রে এগুলির কোন উল্লেখ পওয়া যায়না। সমগ্র হিন্দুশাস্ত্রপারাবার মন্থন করিলেও এগুলির অনুকূলে অনুষ্টুভ্‌ছন্দে রচিত একটীও শ্লোক উদ্ধার করিতে পারা যায় না, অথচ আমাদের রমণীসমাজে এই ব্রতগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে। আমরা এই গুলিকেই "মেয়েলিব্রত" নামে অভিহিত করিয়াছি। এই সকল ব্রতোপলক্ষে নানাবিধ আখ্যায়িকা উপদেশ ছড়া ইত্যাদি

প্রচলিত আছে। একটু নিবিষ্টচিত্তে তাহা আলোচনা করিলে আমরা আমাদের সমাজসংক্রান্ত অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারি। এই সমুদায় মেয়েলিব্রতের অনুষ্ঠান-পদ্ধতিতে যে কেবল চাল কলা মিষ্টান্ন ও বিশুদ্ধ গব্যবসের উল্লেখ আছে তাহা নহে, আমাদের সমাজের রীতি পদ্ধতি সুখ দুঃখ, আমাদের ভাষার শৈশব ইতিহাস এবং তৎসম্বলিত কিঞ্চিৎ কাব্যরসও আমরা ইহা হইতে আদায় করিতে পারি।

ব্রতানুষ্ঠানের মধ্যে "ব্রতকথা" শুনিবার নিয়ম আছে। শাস্ত্রীয় ব্রতগুলির ব্রতকথা সংস্কৃতভাষায় লিখিত, সুতরাং ব্রতচারিণীকে বর্ণজ্ঞানশূন্য পুরোহিতের মুখে অশুদ্ধ ও অবোধ্য মন্ত্রগুলি কেবল নীরবে কর্ণস্থ করিয়া সন্তুষ্ট হইতে হয়। কিন্তু মেয়েলি ব্রতের কথাগুলি মেয়েলি ভাষায় মেয়েলি ছড়াতে মেয়েলি ভঙ্গীতে রচিত, ইহার শ্রোতা বক্তা সমস্তই স্ত্রীলোক। কোন প্রবীণা রমণী এই ছড়া ও কথাগুলি আনন্দ ও উচ্ছ্বাসের সঙ্গে যখন বর্ণনা করেন, শ্রোতৃমণ্ডলীও শ্রদ্ধাপূর্ণচিত্তে তাহা শ্রবণ করিয়া থাকেন, ইহাতে কথাগুলি তাঁহাদের হৃদয়ক্ষেত্রে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়া যায়। এই ব্রতোপাখ্যান হইতে পল্লিবাসিনী রমণীগণ স্বামিভক্তি, দেবভক্তি ভ্রাতাভগিনীর প্রতি স্নেহ-মমতা, পরোপকার প্রভৃতি বিবিধরূপ শিক্ষা লাভ করিয়া থাকেন। আমরা সাধনার পাঠকগণকে ক্রমশঃ এই সমুদায় ব্রতের বিবরণ উপহার দিতে চেষ্টা করিব।

আমরা অদ্য যে ব্রতের উপলক্ষে এই প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছি, তাহার নাম "রামদুর্গা বা পূর্ণিমার ব্রত"। এই ব্রতের সবিস্তার বিবরণ ক্রমশঃ লিখিত হইতেছে। এই ব্রতটী "হলোয়ের বটিকা" বিশেষ; ইহার অনুষ্ঠানে সকল কামনাই সিদ্ধ হয়, সুতরাং সকলেই ইহা অবলম্বন করিতে পারেন। এই ব্রতের সমস্ত বিবরণই

মেয়েলি ছড়ায় নিবদ্ধ, কিন্তু ছড়াগুলির সকল স্থলে মিল নাই, বরং মাঝে মাঝে চলিত কথাবার্ত্তার ন্যায় দুই চারিটী কথাও আছে। ছড়াগুলি কোন্ সময়ের রচনা জানিবার কোন উপায় নাই, বহু-কাল হইতে শ্রুতিপরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে। যাহা হউক আমরা এই ছড়াগুলি অবলম্বন করিয়া প্রথমতঃ ব্রতের উৎপত্তি-বিবরণ ও অনুষ্ঠান-পদ্ধতির উল্লেখ করিব, পরে উপাখ্যান ভাগ বিবৃত করিতে চেষ্টা পাইব।

অথ ব্রতোৎপত্তি বিবরণ।

"নমঃ নমঃ সদাশিব তুমি প্রাণেশ্বর।
ভক্তিবাহনে প্রভু দেবদিবাকর॥
হরগৌরীর চরণে করিয়া নমস্কার।
যাহার প্রচারে হ'ল দেবীর প্রচার॥
শুন সবে সর্ব্বলোক হয়ে হরষিত।
বড়ই আশ্চর্য্য কথা সূর্য্যের চরিত॥
একদিন কৈলাসশিখরে পশুপতি।
কৌতুকে খেলেন পাশা দুর্গার সঙ্গতি॥
সেইখানে ছিলেন এক ব্রাহ্মণ বরুড়।"

কোন সময়ে কৈলাস পর্ব্বতে হরপার্ব্বতী পাশা খেলিতেছিলেন, বরুড় ব্রাহ্মণ নামা কোন ব্রাহ্মণযুবক তাঁহাদের জন্য পুষ্পচয়ন করিতেছিলেন। খেলিতে খেলিতে দুর্গা বলিলেন, "কার জিৎ"? শিবও জিজ্ঞাসা করিলেন "কার জিৎ"? মাতৃভক্ত ব্রাহ্মণ বলি-লেন "মায়ের জিৎ"। শিব অমনি ক্রোধে অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া ব্রাহ্মণকে শাপ দিলেন, শিবের অভিসম্পাতে তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণের কুষ্ঠ হইল। আশুতোষ মহাদেবের অকারণে এতটা ক্রোধ প্রকাশ করা অবশ্য

সঙ্গত হয় নাই। যাহা হউক, পীড়ার যন্ত্রণায় ব্রাহ্মণ ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন।

"কৃমির কামড়ে বিপ্র পরিত্রাহি ডাকে।
রক্ষাকর হরপার্ব্বতী পড়িলাম বিপাকে ॥"

ব্রাহ্মণের কাতরক্রন্দনে দেবী ভগবতীর দয়া হইল; তিনি ব্রাহ্মণকে সূর্য্যের আরাধনারূপ ব্রত অবলম্বন করিতে উপদেশ দিয়া বলিলেন, এই ব্রত করিলে সর্ব্বকামনা সিদ্ধ হয়; তুমি ভক্তিভরে "সূর্য্যঅর্ঘ্য" প্রদান কর, তোমার কুষ্ঠ আরোগ্য হইবে এবং তুমি সূর্য্যের ন্যায় জ্যোতির্ম্ময় রূপ লাভ করিবে। এইরূপে ব্রতের উৎপত্তি হইল। দুর্গা উপদেশ দিলেন, এই জন্য ইহার নাম "রাম-দুর্গার ব্রত"। পূর্ণিমার দিন ব্রত উদ্‌যাপন করিতে হয় বলিয়া ইহাকে পূর্ণিমার ব্রতও" বলে।

অথ অনুষ্ঠান পদ্ধতি।

অগ্রহায়ণ মাসের অমাবস্যায় অঋণী ব্যক্তির ধান্যক্ষেত্র হইতে ১৭ সতরশিষ্‌ ধান ও ১৭ গাছি দূর্ব্বা তুলিয়া একত্র বাঁধিয়া গৃহে রাখিতে হয়। ধান ও দূর্ব্বা সংগৃহীত হইলে এই দিন একবার সমস্ত ব্রতকথা আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিতে হয়। ইহার পরদিন অর্থাৎ প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত প্রতিদিন প্রাতে একবার কথা শুনিবার নিয়ম, কেবল পূর্ণিমার দিন দুইবার প্রাতঃকালে ও আহারের সময়; এইরূপে মোট ১৭ বার কথা শুনিতে হয়। অমাবস্যার দিন যে ধানদূর্ব্বা তুলিয়া রাখা হইয়াছে, পূর্ণিমার দিন প্রাতঃকালে কথা শুনিবার পূর্ব্বে সেই ধান ও দূর্ব্বাদ্বারা পুরোহিত "সূর্য্যঅর্ঘ্য" প্রদান করিবেন। অনন্তর স্ত্রীলোকেরা আবার "মেয়েলি-মন্ত্রে" সূর্য্যের পূজা করিবেন। পূজার উপকরণ ও মন্ত্র এইরূপ,—

"ওড়ফুল যোড় কলা   রক্তচন্দন জবারমালা
ঘিয়ের প্রদীপ তামার টা'টে থুয়ে।
অর্ঘ্য দিলেন দিবাকরে
এই বোল বলিয়ে—
'নমঃ নমঃ দিবাকর ভক্তির কারণ।
ভক্তিরূপে নাও প্রভু জগৎ কারণ॥
ভক্তিরূপে প্রণাম করিলে তুয়া পায়।
মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ করেন প্রভু দেবরায়' ॥"

এইরূপে অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমা অর্থাৎ প্রথম পূর্ণিমার ব্রত শেষ হইলে আবার যথাক্রমে পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুন মাসের অমাবস্যা হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত পূর্ব্ববৎ প্রতিদিন কথা শ্রবণ, ও প্রত্যেক পূর্ণিমায় পূর্ব্বসংগৃহীত ধান দূর্ব্বাদ্বারা সূর্য্যঅর্ঘ্য প্রদান করিতে হয়। চতুর্থ পূর্ণিমায় অর্থাৎ ফাল্গুনী দোলপূর্ণিমায় ব্রত শেষ হয়। প্রত্যেক পূর্ণিমায় আহারের নিয়ম স্বতন্ত্র। যথা—

"প্রথমেতে গুলিগুলি করিবে ভোজন ॥
দ্বিতীয় মাসেতে রামা খাইবে পায়েসে।
তৃতীয় মাসেতে দধি অন্ন খাইবে হরিষে ॥
চার মাসে মুগপুলি খাবেন ইচ্ছামতী।
সূর্য্যের কৃপাতে তাঁর কার্য্য হবে সিদ্ধি ॥"

প্রথম মাসের "গুলিগুলি"র অর্থ ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। আলোচাল বাঁটিয়া গুলি পাকাইয়া জলে সিদ্ধ করিয়া দুগ্ধ ও গুড় অথবা চিনি মিশ্রিত করিয়া খাইতে হয় ইহার নাম "গুলিগুলি"। যদি বেশী খাইতে না পারে, অন্ততঃ ১৭ গ্রাসও খাইতে হইবে। প্রতি পূর্ণিমায় একবার মাত্র আহারের নিয়ম।

অথ ব্রত-কথা।

ব্রতোৎপত্তি বিবরণ, অনুষ্ঠানপদ্ধতি ও উপাখ্যান, সমস্তই ব্রতকথার অন্তর্গত। ব্রতচারিণীকে এই সমস্তই শ্রবণ করিতে হয়। আমরা এস্থলে কেবল উপাখ্যানভাগ বিবৃত করিতেছি।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে দেবী ভগবতী বরুড় ব্রাহ্মণের প্রতি কৃপা করিয়া রোগ হইতে মুক্তিলাভের জন্য তাঁহাকে সূর্য্যপূজা-রূপ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ ব্রত গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, ব্রাহ্মণ উৎকট রোগযন্ত্রণা উপেক্ষা করিয়া পরম রূপবতী রাজকুমারী ইচ্ছামতীর পাণিগ্রহণ প্রার্থনায় ব্রত আরম্ভ করিলেন। কৃমিকীটজর্জ্জরিত কুষ্ঠরোগগ্রস্ত আতুরের এ-প্রকার প্রার্থনা নিতান্ত অস্বাভাবিক ও অসঙ্গত সন্দেহ নাই। কিন্তু দেবীর বরে আর সূর্য্যের কৃপায় কিছুই অসঙ্গত ও অসম্ভব নহে। সূর্য্য বলিলেন, "তথাস্তু"। কিন্তু কি উপায়ে ইহা সম্পন্ন হয়, রাজ-কন্যা কিছু জানিয়া শুনিয়া আপন ইচ্ছায় কুষ্ঠীকে মাল্যপ্রদান করিবেন না, অতএব কোন কৌশল অবলম্বন আবশ্যক, তাই সূর্য্যের নিকট

"উপদেশ পেয়ে ব্রাহ্মণ
কৈলাস শিখরে পড়িয়ে রহিল।
(একদিন) স্নান করে যান কন্যা সঙ্গে শত নারী।
'পথছেড়ে দাও ব্রাহ্মণ স্নান ক'রে আসি॥'
বরুড় বলে 'নড়িতে আমার নাহিকো সঙ্গতি।
আমারে লঙ্ঘিয়ে যাও কন্যা ইচ্ছামতী'॥
'একেত ব্রাহ্মণ তুমি বিষ্ণুর সমান।
তোমারে লঙ্ঘিব আমি কি মতি মোর জ্ঞান?'

'তবে সত্য কর কন্যে পথ ছেড়ে দিই'।
'কি সত্য করিব আমি রাজার কুমারী।
যত লাগে টাকা সিকে সব দিতে পারি'॥
'টাকা সিকে কড়িতে নাহিকো প্রয়োজন।
তুমি মোরে হবে স্বয়ম্বরা এই আমার মন॥"

ব্রাহ্মণের এই অদ্ভুত প্রার্থনা শুনিয়া ইচ্ছামতীর মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তখন

"যাছিল কপালে ব'লে কপালে মেলে ঘা।
অনুমতি দিয়ে কন্যা গেল নিজ ঘর।
নিজ ঘর গিয়ে কন্যা কপাট ঢালিয়ে পড়িয়ে রহিল।
সেথা তার মাতাপিতা জিজ্ঞেসা করিল॥
'কে তোমায় কহেছে বাণী কহ সত্য বাণী?'
'কেহ না কহেছে বাণী
স্বয়ম্বরা হইতে লয়েছে আমার মন।'
রাজকন্যা স্বয়ম্বরা রাজ্যে স্বয়ম্বর।
ঘরে ঘরে আনন্দ বাজনা বাজিতে লাগিল।"

স্বয়ম্বরের আয়োজন ও বাদ্যভাণ্ডের কোলাহল শুনিয়া ব্রাহ্মণের হৃদয়ে আনন্দ উথলিয়া উঠিল। রাজসভায় যাইবার উপযুক্ত সাজ-সজ্জায় প্রয়োজন; সুতরাং

"তা দেখে বরুড় ধীরে ধীরে মেলিনীর বাড়ী গেল।
মেলিনী পাইয়ে তারে হরষিত হ'ল॥
তপ্ত জল করে কুষ্ঠ ধোয়ন করিল।
বিচিত্র আসনে তারে বসাইল॥
সুগন্ধি চন্দন তার মাল্য গলে দিল।

বলে 'না পারিবে যেতে বাপু
না পারিবে যেতে।
হস্তী ঘোড়ার মনিষ্যের চাপনে মরিবে।'
'না মরিব না মরিব দেবীর দয়ায়।'
তখন সর্ব্ব পুরাণ কথা মেলিনীকে কহে,
—'আমি কুষ্ঠ পড়েছিলাম কৈলাসশিখরে।
কোপকরে সদাশিব শেঁপেছিল মোরে॥
দশা দেখে ভগবতী দয়া বিতরিল।
কামনা করিয়ে ব্রত করেছিলাম আমি।
তাই হব রাজকন্যার স্বামী॥'
তাহা শুনিয়ে মেলিনী হরষিত হলেন।
ধীরে ধীরে বরুড় ব্রাহ্মণ রাজবাড়ী গেলেন॥"

নানা দিগ্দেশীয় রাজগণ দেবর্ষি ও মহর্ষিগণ সভা আলো করিয়া উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে কুষ্ঠীবিপ্র মালিনীপ্রদত্ত সুবাসিত পুষ্পমাল্যশোভিত হইয়া সভার একপার্শ্বে উপবেশন করিলেন। অনন্তর যথাসময়ে রাজকুমারী ইচ্ছামতী সভাতে প্রবেশ করিলেন।

"সভা করে বসেছেন যত দেবগণ,
সভা করে বসেছেন যত ঋষিগণ,
সভা করে বসেছেন যত রাজাগণ।
সবাইকে ছাড়িয়া কন্যা
বরুড় ব্রাহ্মণকে দিলেন মালা।"

রাজকুমারীর এই অসঙ্গত কার্য্য দেখিয়া সকলেই তাঁহাকে ধিক্কার প্রদান করিতে লাগিলেন।

"ধিক্ ধিক্ করে যত রাজা প্রজাগণ।
ধিক্ ধিক্ করে যত দেবঋষিগণ॥

ধিক্ ধিক্ করে কন্যা শতগণ।
ধিক্ ধিক্ করে যত দাস দাসীগণ॥"

কন্যা নিজে যখন আপনার পতি মনোনীত করিয়া ব্রাহ্মণকে বরমাল্য প্রদান করিয়াছেন, তখন রাজা আর কি করিবেন? সমাগত রাজা প্রজা ও পুরনারীগণের উপহাস ধিক্কারে ঘৃণা ও লজ্জায় একবারে ম্রিয়মাণ হইলেন।

"ধিক্ ধিক্ করে সবে কন্যার অন্দরে।
দুঃখিত হইয়ে রাজা কন্যাদান করে॥"

সম্প্রদান কার্য্য শেষ হইলে রাজা বলিলেন,

"দেখিবার উচিত পাত্র নহেত কুমারী।
বনবাসে দিয়ে এস বাঁধিয়ে কুমারী॥
দূতগণে ডাকিয়ে রাজা
ইচ্ছামতী ব্রাহ্মণে
রাখিয়ে এলেন বনে॥"

পতিব্রতা রাজকুমারী পতিসহ বনবাসে গমন করিয়া ভক্তি ও শ্রদ্ধাসহকারে পতিশুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইলেন।

"তপ্ত জল ক'রে কুষ্ঠ ধোয়ন করেন।
দুর্গন্ধি সহিতে নারেন দুঃখেতে কাঁদেন॥
'কেন কন্যে! কাঁদ তুমি কিসের কারণ?'
'শুন প্রভু প্রাণনাথ করি নিবেদন॥
দুর্গন্ধ সহিতে নারি কাঁদি যে দুঃখেতে'।
'শুন কন্যে! আমার উত্তর।
আমি কুষ্ঠ পড়েছিলাম কৈলাস শিখরে।
কোপ ক'রে সদাশিব শেঁপেছিল মোরে॥

দশা দেখে ভগবতী দয়াবিতরিল।
সতন্তর শিবকে বলিল ॥
কামনা করিয়ে ব্রত করেছিলাম আমি।
তাই তোমার হইয়াছি স্বামী ॥
সেই ব্রত ক'রে অর্ঘ্য দাও দিবাকরে।
কুষ্ঠ ঘুচিয়ে সুন্দর হব দেববরে ॥"

ব্রতের কথা শুনিয়া ইচ্ছামতীর হৃদয় আহ্লাদে নাচিয়া উঠিল। অনন্তর তিনি অগ্রহায়ণ মাসের অমাবস্যাতে পূর্ব্বোক্ত বিধান অনুসারে সূর্য্য অর্ঘ্য প্রদান করিয়া ব্রত অবলম্বন ও উদ্‌যাপন করিলেন।

"তা শুনিয়ে কন্যা হরষিত হলেন।
অঘ্রাণ মাসে অমাবস্যা পেলেন ॥
সতের ধান সতের দূর্ব্বা তোলন করিলেন।
রক্তচন্দন জবাপুষ্প তামার পাত্রে থুলেন ॥
অর্ঘ্য দিলেন দিবাকরে
এই বোল বলিয়ে।
'নমঃ নমঃ দিবাকর ভক্তির কারণ।
ভক্তিরূপে নাও প্রভু জগৎ কারণ ॥
ভক্তিভাবে প্রণাম করিলে তুয়াপায়।
মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ করেন প্রভু দেবরায়।'
দেবীর দয়াতে কার্য্য হ'ল সিদ্ধি।
আতুর ছিলেন চতুর হ'লেন
কন্দর্প রূপ হ'ল সূর্য্যের মত বর্ণ হ'ল ॥"

এইরূপে দেবীর বরে ব্রাহ্মণের কুষ্ঠ আরোগ্য হইয়া দেহ সুবর্ণ-কান্তি ধারণ করিল। রাজকন্যা কামদেবতুল্য রূপযৌবনসম্পন্ন

মনোমত স্বামী লাভ করিয়া আনন্দিত হইলেন। কিন্তু কেবল রূপযৌবন লইয়া মানুষ সুখী হইতে পারে না। কামদেবতুল্য স্বামী লইয়া কি হইবে যদি উদরে অন্ন না থাকে। সুতরাং

"আর এক দিন কন্যা কাঁদেন দুঃখেতে,
'কেন কন্যে কাঁদ তুমি কিসের কারণ!'
'শুন প্রভু প্রাণনাথ করি নিবেদন,
ধন ধান্য বিনে পুরুষের জীবনে মরণ,
ধন ধান্য বিনে পুরুষের সব অন্ধকার,
ধন ধান্য বিনে পুরুষের শোভা নাহি পায়'।
'শুন কন্যে আমার উত্তর,
যে ব্রত ক'রে কন্যে পাইলাম তোমারে,
যে ব্রত ক'রে কন্যে হইলাম সুন্দর,
সেই ব্রত কর কন্যে হবে ধনধান্য'।
তা শুনে কন্যা হরষিত হলেন।
দেবীর দয়াতে তার অদৈন্য ধন॥"

ব্রত করিয়া ইচ্ছামতী অতুল ধনসম্পত্তি দাসদাসী অট্টালিকা সমস্তই লাভ করিলেন। কিন্তু পুত্র বিনা নারীর জীবন বৃথা; পুত্রই গৃহের শোভা, রমণীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভূষণ, এই জন্য পুত্র কামনায়

"আর এক দিন কন্যা কাঁদেন দুঃখেতে।
'কেন কন্যে কাঁদ তুমি কিসের কারণ?'
'শুন প্রভু প্রাণনাথ করি নিবেদন,
পুত্র বিনে পুরুষের জীবনে মরণ,
পুত্র বিনে পুরুষের সব অন্ধকার,
পুত্র বিনে পুরুষের শোভা নাহি পায়।'

"শুন কন্যে আমার উত্তর,
যে ব্রত করে কন্যে পাইলাম তোমারে,
যে ব্রত করে কন্যে হইলাম সুন্দর,
সেই ব্রত কর কন্যে হবে পুত্র কন্যা।'

পুনর্ব্বার ব্রত করিয়া ইচ্ছামতী পুত্ররত্ন লাভ করিলেন।

"গণনা গণিতে তার নয় মাস গেল।
শুভক্ষণে ইচ্ছামতী পুত্র প্রসবিল॥"

পিতাকর্ত্তৃক নির্ব্বাসিতা হইয়া ইচ্ছামতী এতদিন দারুণ দুঃখের দশায় কেবল স্বামীর পরিচর্য্যায় আত্মসমর্পণ করিয়া দিন কাটাইয়াছিলেন। যত দিন না স্বামীকে রোগমুক্ত করিতে পারিয়াছিলেন, ততদিন তাঁহার হৃদয়ে আর কোন চিন্তাই স্থান পায় নাই। এখন দেবীর বরে আর সূর্য্যের কৃপায় তাঁহার স্বামী উৎকট পীড়া হইতে মুক্তিলাভ করিয়া রূপযৌবনে শোভান্বিত হইয়াছেন, গৃহ প্রচুর ধনধান্য সুখ সৌভাগ্যে শ্রীসম্পন্ন এবং তাঁহার ক্রোড় পুত্ররত্নে অলঙ্কৃত হইয়াছে। এই সৌভাগ্যের সময় পিতামাতাকে স্বতঃই মনে পড়িল। আশৈশব পিতামাতার স্নেহবাৎসল্য আদর যত্ন, স্বয়ম্বরকালে তাঁহাদের কঠোর ব্যবহার, অবশেষে পিতাকর্ত্তৃক শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে নির্ব্বাসন, এই সমস্ত স্মৃতিপথে উদিত হইয়া ইচ্ছামতীর স্নেহসুকোমল ক্ষুদ্র হৃদয়খানিকে একবারে আকুলিত করিল। তাঁহার অশ্রুসিক্ত বিষণ্ণবদন দেখিয়া স্বামী স্নেহভরে বলিলেন,

"কেন কন্যে কাঁদ তুমি কিসের কারণ?"

ইচ্ছামতী অশ্রুপূর্ণ লোচনে গদগদস্বরে বলিলেন,

"শুন প্রভু প্রাণনাথ করি নিবেদন।
মাতা পিতে দেখিতে হয়েছে আমার মন॥"

এদিকে দেবী ভগবতীর দয়াতে ইচ্ছামতীর মাতা স্বপ্ন দেখিয়া কন্যার শোকে কান্দিয়া উঠিলেন। রাজার এক শত জন রাণী, সকলেই বহুদিনের পর ইচ্ছামতীর শোকে অধীর হইয়া রাজাকে নানাপ্রকারে অনুযোগ প্রদান করিতে লাগিলেন। ইচ্ছামতীর গর্ভধারিণী প্রধানা মহিষী বলিলেন,

"কোন্ বনে রাখিয়ে এলে কন্যে ইচ্ছামত ?
বনবাস দিয়ে কন্যে না কর তল্লাস।
কন্যার লাগিয়ে মোর লেগেছে হুতাশ ॥"

তখন রাজা দূতগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহারা ইচ্ছামতীর সন্ধান করিতে পারিবে বলিল। অনন্তর দূতগণের পরামর্শে বহু সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে রাজা ও রাণী মথুরা নগরে প্রবেশ করিলেন। দূতগণ বলিল, এইখানে নিবিড় বনের ভিতর আমরা ইচ্ছামতী ও তাঁহার স্বামীকে রাখিয়া গিয়াছিলাম, কে তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়া এই অরণ্যের মধ্যে অমন সুন্দর নগর নির্ম্মাণ করিল ? এই সমুদায় অট্টালিকা দাসদাসী হাতী ঘোড়াই বা কাহার ? পরে তাহারা অনুসন্ধানে জানিতে পারিল যে, ইচ্ছামতীই এই রাজ্যের রাণী, ইচ্ছামতীই এই সমস্ত ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বরী! অনন্তর রাজা ও রাণী কন্যার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ইচ্ছামতী অবনতমস্তকে পিতামাতার চরণে প্রণাম করিয়া আপনার সুখ-দুঃখের অতীতকাহিনী বর্ণনা করিতে লাগিলেন।

"তখন সর্ব্বপুরাণ কথা বলেন পিতারে।
'ইনি কুষ্ঠ পড়েছিলেন কৈলাস শিখরে।
কোপ করে সদাশিব শেঁপেছিল এঁরে ॥
দয়াকরে ভগবতী দয়া বিতরিল।
সেই ব্রতর ফল ইহাঁরে ফলিল ॥

সেই ব্রত করে অর্ঘ্য দিয়াছিলাম আমি।
কুষ্ঠ ঘুচে সুন্দর হইল মম স্বামী॥"

কিন্তু রাজা কন্যার কথায় সহসা বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলেন না। কন্যা যথার্থ পতিব্রতা কি না পরীক্ষা করিবার জন্য বলিলেন,

"মা গো! পুনঃ ব্রত ক'রে অর্ঘ্য দাও দিবাকরে।
সুন্দর ঘুচে কুষ্ঠ কর দেখি এঁরে॥
তবেত প্রত্যয় নয় না হয় প্রত্যয়।"

পিতার প্রত্যয়ের জন্য ইচ্ছামতী ব্রত করিলেন, ব্রতের আশ্চর্য্য শক্তিতে তাহার স্বামীর আবার কুষ্ঠ হইল, ব্রাহ্মণ রোগের যাতনায় পূর্ব্বের ন্যায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণের যন্ত্রণা দেখিয়া রাজা মহা দুঃখিত হইয়া কন্যাকে বলিলেন,

"সর্ব্বকামনা-ব্রত যদি জান মাতা,
রোগ হ'তে মুক্ত কর ব্রাহ্মণকুমারে।
তবে রহে ভক্তি নইলে না রহে ভক্তি॥"

ইচ্ছামতী পুনর্ব্বার ব্রত করিলেন, দেবীর বরে ব্রাহ্মণ রোগ-মুক্ত হইয়া পূর্ব্ববৎ দিব্যশ্রী লাভ করিলেন। কন্যার অপূর্ব্ব ধর্ম্ম-নিষ্ঠা পাতিব্রত্য এবং ব্রতের অদ্ভুত শক্তি দেখিয়া রাজার সমুদায় সন্দেহ নিরাকৃত হইল। রাজা সন্দেহের নিমিত্ত মহালজ্জিত হইলেন, এবং কন্যাকে সস্নেহে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন,

"সর্ব্বকামনাব্রত যদি জান মাতা,
অপুত্র আছে তোমার মা হউ পুত্রবতী।"

ইচ্ছামতী আবার ব্রত করাতে দেবীর দয়ায় তাঁহার মাতা যথা-কালে গর্ভধারণ করিলেন।

"গণনা গণিতে তার নয়মাস গেল,
শুভক্ষণে রাজরাণী পুত্র প্রসবিল॥"

এইরূপে রাজা ও ইচ্ছামতী ধনধান্য পুত্রকন্যা যশঃখ্যাতি লাভ করিয়া পরমানন্দে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। একদিন রাজা কন্যাকে বলিলেন,

"সর্ব্বকামনাব্রত যদি জান মাতা।
আপনি উদ্ধার উদ্ধার পিতা মাতা ॥"
তাও শুনিয়ে হরষিত হ'লেন,
অঘ্রাণের অমাবস্যা পেলেম,
সতের ধান সতের দূর্ব্বা তোলেন,
অর্ঘ্য দিলেন দিবাকরে।
দেবীর দয়ায় রথ আইলেন।"

উপযুক্ত পুত্রকে রাজ্যভার প্রদান করিয়া ইচ্ছামতী পিতা মাতা ও স্বামার সহিত "দিব্য" রথে আরোহণ করিয়া স্বর্গে গমন করিবেন,

"হেনকালে ব্রতকথা পড়ে গেল মনে,
'আহা আহা এমন আশ্চর্য্য ব্রত
কারে না বলিলাম।'
হেনকালে দেখে এক ব্রাহ্মণকুমারী,
হাদেহে ব্রাহ্মণকুমারী।
একটী ব্রতর কথা কই তোমারে।"

ইচ্ছামতী ব্রাহ্মণকুমারীকে ব্রতের সমুদায় বিবরণ আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলেন। বর্ণনা শেষ হইবামাত্র রথ দিব্যগতিতে দেবলোকে প্রস্থান করিল।

এই ব্রাহ্মণকুমারী হইতেই আমাদের নারীসমাজে এই ব্রত প্রচলিত হইয়াছে এবং বংশপরম্পরায় আজ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। আমরাও এক ব্রাহ্মণকুমারীর নিকট এই বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছি।

অথ ফলশ্রুতি।

শাস্ত্রের আদেশ এই, "রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ।" অর্থাৎ ক্রিয়াতে রুচি জন্মাইবার জন্য শাস্ত্রে নানাবিধ পুষ্পিত বাক্যরূপ ফলশ্রুতি লিখিত হইয়াছে সমালোচ্য ব্রতের ফলশ্রুতি এইরূপ,—

"যে বলে শোনে তার স্বর্গে বাস।
যে ব্রত করে তার পোরে আশ॥"

ব্রতচারিণীর আশা পূর্ণ হউক্ আর না হউক, বক্তাপ্রবন্ধলেখক এবং শ্রোতা পাঠকবর্গ যে অতি সুলভ উপায়ে স্বর্গবাসের অধিকারী হইতে পারেন, লেখকও পাঠকের পক্ষে ইহা অল্প সৌভাগ্যের বিষয় নহে।

যুগান্তর। *

যাহারা বালি ধুইয়া হীরা বাহির করে, তাহারা অনেককাল বিস্তর বালি ঘাঁটিয়া এক টুকুরা হীরার সন্ধান পায়। গ্রন্থ-সমালোচকের ভাগ্যেও হীরা সহজে মেলে না; সেই জন্য বহুকাল বিস্তর নীরস এবং নিস্ফল পরিশ্রমের পর যেদিন একখানা যথার্থ গ্রন্থ হাতে আসে সেদিন আনন্দবেগে গ্রন্থকারকে মনুমেণ্টের উপর তুলিয়া দিয়া জয়জয়কার করিতে ইচ্ছা করে।

কিন্তু সমালোচকের কাজটা এমনি যে, তাহাকে পদে পদে আপন উচ্ছ্বাস সম্বরণ করিয়া চলিতে হয়,—যখন কৃতজ্ঞচিত্তে শুন

---

* যুগান্তর। সামাজিক উপন্যাস। শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী বিরচিত। মূল্য ১৷৹ আনা।

খাইতেছি তখনো এই কথা মনে রাখিতে হয় কেবলি গুণ গাহিলে চলিবে না, যদি দোষ থাকে তাহাও গাহিতে হইবে!

শিবনাথ বাবুর যুগান্তর উপন্যাসখানি পাঠ করিতে করিতে কর্ত্তব্যক্লান্ত সমালোচকের চিত্ত বহুকাল পরে আনন্দ এবং কৃতজ্ঞতায় উচ্ছ্বসিত হইতেছিল। এমন পর্য্যবেক্ষণ, এমন চরিত্র সৃজন, এমন সরস হাস্য, এমন সরল সহৃদয়তা বঙ্গসাহিত্যে দুর্লভ। লেখক বিশ্বনাথ তর্কভূষণকে আমাদের নিকট পরমাত্মীয়ের ন্যায় পরিচিত করিয়া দিয়াছেন। এমন সত্যচরিত্র বাঙ্গলা উপন্যাসে ইতিপূর্ব্বে কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। লেখক তাঁহাকে সমস্ত তুচ্ছ ঘটনার মধ্যে প্রত্যক্ষবৎ জাজ্বল্যমান দেখিয়াছেন—তাঁহার চরিত্রটিকে প্রতিদিনের হাস্যে এবং অশ্রুজলে, দোষে এবং গুণে অতি সহজেই সজীব করিয়া তুলিয়াছেন! বিরলবসতি বঙ্গসাহিত্য-রাজ্যে তর্কভূষণ মহাশয় যে একটি জনসংখ্যা বৃদ্ধি করিলেন এবং আমরা যে একটি স্থায়ী বন্ধুলাভ করিলাম সে বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ মাত্র নাই।

কেবল তর্কভূষণকে কেন, লেখক, বঙ্গসাহিত্যে নশিপুর নামক আস্ত একটি গ্রাম বসাইয়া দিয়াছেন। এই গ্রামের ক্রিয়াকর্ম্ম, আমোদ প্রমোদ, কৌতুক উপদ্রব, সুজন দুর্জ্জন সমস্তই পাঠকদের চিরসম্পত্তি হইয়া গিয়াছে। তর্কভূষণের টোল, "হাঁসের দল," চিমু ঘোষ, জহরলালের ইতিহাস নূতন-গঠিত সদ্যপঠিত হইলেও তাহা আমাদের নিকট যেন অনেককালের পুরাতন পরিচিত হইয়া উঠিয়াছে। এদিকে উলোর রামরতন মুখুয্যের ঘরে তর্কভূষণের কনিষ্ঠা কন্যা ভুবনেশ্বরীর ঘরকন্নাও আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ সত্য এবং অত্যন্ত বেদনাজনক হইয়াছে! সংক্ষেপে, তর্কভূষণ, তাঁহার গ্রাম, তাঁহার পরিবার, তাঁহার ছাত্রবর্গ তাঁহার শত্রুমিত্র সকলকে

লইয়া একটি গ্রাম্য গ্রহমণ্ডলীর কেন্দ্রবর্ত্তী সূর্য্যের ন্যায় আমাদের নিকট প্রবল উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হইয়াছেন।

এমন সময়ে আমাদের পরম দুর্ভাগ্যবশতঃ উপন্যাসটি অকস্মাৎ যুগান্তরে লোকান্তরে আসিয়া উপস্থিত হইল। কোথায় গেল তর্কভূষণ, নশিপুর, হাঁসের দল—কোথা হইতে উপস্থিত নবীনচন্দ্র,হাতিবাগান, নবরত্ন সভা। গ্রন্থকারও নূতন বেশ ধারণ করিলেন। তিনি ছিলেন ঔপন্যাসিক হইলেন ঐতিহাসিক, ছিলেন ভাবুক হইলেন নীতি প্রচারক। আমরা রসসম্ভোগের সত্যযুগ হইতে তর্কবিতর্কের যুগান্তরে আসিয়া অবতীর্ণ হইলাম। গ্রন্থকার পূর্ব্বে যেখানে মানুষ গড়িতেছিলেন এখন সেখানে মত গড়িতে লাগিলেন,—পূর্ব্বে যেখানে আনন্দ নিকেতন ছিল এখন সেখানে পাঠশালা বসিয়া গেল।

এরূপ অঘটন সংঘটন হইল কেন তাহা বলিতে পারি না। তর্কভূষণের বিধবা ভগ্নী বিজয়া এবং তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র হরচন্দ্রের কলিকাতায় আগমন কালটি তাঁহাদের নিজের পক্ষে সুক্ষণ, কিন্তু উপন্যাসের পক্ষে কুক্ষণ,—কারণ সেই উপলক্ষ্যটুকু অবলম্বন করিয়া গ্রন্থের শেষার্দ্ধটি প্রথমার্দ্ধের সহিত জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। পরস্পরের মধ্যে কোন অবশ্যযোগ নাই।

দুইটা মানুষকে এক দড়ি দিয়া বাঁধিলে ঐক্য হিসাবেও তাহাদের বলবৃদ্ধি হয় না এবং দ্বৈতহিসাবেও তাহাদের সুবিধা হয় না। তেমনি দুই স্বতন্ত্র গল্পকে জবরদস্তি করিয়া একত্র বাঁধিয়া দিলে একটা গল্পের হিসাবেও তাহারা নষ্ট হয় দুইটা গল্পের হিসাবেও তাহাদের স্বচ্ছন্দ স্বাধীন পরিণতিতে বাধা দেওয়া হয়। বর্ত্তমান গ্রন্থেও তাহাই হইয়াছে। গ্রন্থকার যদি দুটি গল্পকে বিচ্ছিন্ন আকারে রচনা করিতেন তাহা হইলে সম্ভবতঃ দুটিকেই উৎকৃষ্ট গল্পে পরিণত করিতে পারিতেন।

দ্বিতীয় গল্পটির কথা বলিতে পারি না—কিন্তু প্রথম গল্পটি যে সাহিত্যের অত্যুচ্চ স্থান অধিকার করিত সে বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নাই।

আসল কথা, লেখক নিজেই নূতন যুগের মধ্যে বাস করিতেছেন; এমন কি, নবযুগরথের বাহকবর্গের মধ্যে তিনিও একজন গণ্য ব্যক্তি। তিনি ইহার ঘর্ঘরশব্দ এবং জনতাকোলাহল হইতে কল্পনাযোগে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া এতদূরে লইয়া যাইতে পারেন নাই যেখানে শান্তিতে বসিয়া নিপুণ চিত্রকরের ন্যায় ইহাকে চিত্রিত করিতে পারেন। বিচিত্র মতামত এবং তর্ক বিতর্কগুলা একেবারে গোটা আসিয়া পড়ে তাহা রক্তমাংসের মানবাকারে পরিণত হইয়া উঠে না। তাঁহার পঞ্চু, ব্রজরাজ, সুরেন্দ্র গুপ্ত, মথুরেশ, এমন কি, নবীনও খুব ভাল ছেলে বটে কিন্তু সজীব নহে—তাহারা বীজগণিতের ক খ গ অক্ষরের ন্যায় কেবল কতকগুলি চিহ্নমাত্র।

সাহিত্যের চিত্রপটে স্থিতি অপেক্ষা গতি আঁকা শক্ত। যাহা পুরাতন, যাহা স্থির, যাহা নানা দিকে নানা ভাবে সমাজের হৃদয় হইতে রসাকর্ষণ করিয়া শ্যামল সতেজ এবং পরিপূর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে - তাহাকে সত্য এবং সরসভাবে পাঠকের মনে জাজ্বল্যমান করিয়া তোলা অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু যাহা নূতন উঠিতেছে, যাহা চেষ্টা করিতেছে যুদ্ধ করিতেছে পরিবর্ত্তনের মুখে আবর্ত্তিত হইতেছে, যাহা এখনো সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতি লাভ করে নাই তাহাকে যথাযথভাবে প্রতিফলিত করিতে হইলে বিস্তর সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ অথবা ঘাতপ্রতিঘাত ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়া বিচিত্র নাট্যকলা প্রয়োগ আবশ্যক হয়। কিন্তু সেরূপ করিতে হইলে রচনার বিষয় হইতে রচয়িতার নিজেকে বিশ্লিষ্ট করিয়া লইতে হয়—অত্যন্ত কাছে থাকিলে, মণ্ডলীর কেন্দ্রের মধ্যে বাস করিলে,

সমগ্রের তুলনায় তাহার অংশগুলি, ব্যক্তির তুলনায় তাহার মত-গুলি, কার্য্যপ্রবাহের তুলনায় তাহার উদ্দেশ্যগুলি যেরূপ বেশি করিয়া চোখে পড়ে—তাহাতে রচনা সত্যবৎ হয় না, তাহার পরি-মাণ-সামঞ্জস্য নষ্ট হইয়া যায়—এবং বাহিরের নির্লিপ্ত পাঠকদের নিকটে কিরূপে বিষয়টিকে সমগ্র এবং সপ্রমাণ করিতে হইবে তাহার ঠাহর থাকে না।

কিন্তু এই দ্বিতীয় নম্বর গল্পটিতেও লেখক যেখানেই নবযুগের আবর্ত্ত ছাড়িয়া খাঁটি মানুষ গুলির কথা বলিয়াছেন সেইখানেই দুই চারিটি সরল বর্ণনায় স্বল্প রেখাপাতে অতি সহজেই চিত্র আঁকিয়াছেন এবং পাঠকের হৃদয়কে রসে অভিষিক্ত করিয়াছেন। এক স্থলে গ্রন্থকার প্রসঙ্গক্রমে শ্রীধর ঘোষের সহিত কেবল চকিতের মত আমাদের পরিচয় করাইয়া তাহাকে অপসৃত করিয়া দিয়াছেন—কিন্তু সেই স্বল্পকালের পরিচয়েই আমাদের মনে একটা আক্ষেপ রাখিয়া গিয়াছেন; আমাদের বিশ্বাস, লেখক মনোযোগ করিলে এই শ্রীধর ঘোষটিকে একটি গ্রন্থের কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করিয়া আর একটি উপন্যাসকে প্রাণদান করিতে পারিতেন! আমরা শ্রীধরের সংক্ষেপ পরিচয়টি এস্থলে উদ্ধৃত করি।

"এই ঘোষ পরিবার বৈষ্ণব পরিবার; গোঁসায়ের শিষ্য। শ্রীধর ঘোষ মহাশয় অতি সাত্বিক প্রকৃতির লোক ছিলেন। উদ-রান্নের জন্য ম্লেচ্ছের অধীনে কাজ করিতেন বটে, কিন্তু নিষ্ঠার কিছুমাত্র ব্যাঘাত হইত না। আপীষে যখন কর্ম্ম করিতেন, তখন তাঁহার নাসাতে তিলক ও সর্ব্বাঙ্গে হরিনামের ছাপ দৃষ্ট হইত। ··· মানুষটি শ্যামবর্ণ সুস্থ ও সবলদেহ ছিলেন, মুখটি সদ্ভাবে ও ভক্তিতে যেন গদগদ, সে মুখ দেখিলেই কেমন হৃদয় স্বভাবত তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইত। ঘোষজা মহাশয় আপিসে প্রবেশের দ্বারের পার্শ্বের

ঘরেই বসিতেন; এবং যত গাড়ি মাল আমদানী ও রপ্তানি হইত তাহার হিসাব রাখিতেন। সুতরাং তাঁহাকে প্রতিদিন প্রাতঃকালে আপীসে প্রবেশের সময়ে অনেকবার এই প্রশ্ন শুনিতে হইত—'কি ঘোষজামশাই, খপর কি? সব কুশল ত।' অমনি ঘোষজার উত্তর,—'আজ্ঞে গোবিন্দের কৃপাতে সবই কুশল।' ঘোষজা দোলের সময় কিছু ব্যয় করিতেন; লোকজনকে শ্রদ্ধা সহকারে আহ্বান করিয়া উত্তমরূপ খাওয়াইতেন। এই জন্য আপীসের লোকে মাঘ-মাস পড়িলেই জিজ্ঞাসা করিত 'কি ঘোষজা মশাই এবার দোল করবেন ত?' অমনি উত্তর—'আজ্ঞে কি জানি, যা গোবিন্দের ইচ্ছা।' গোবিন্দের প্রতি নির্ভরের ভাব তাঁহার এমন স্বাভাবিক ছিল, যে, আট বৎসর বয়সে ওলাউঠারোগে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রটির কাল হইলে, তাহারই তিনচারি দিন পরে আপীসের একজন লোক জিজ্ঞাসা করিলেন—'কি ঘোষজা মশাই, ছেলেদুটো মানুষ হচ্চেত?' ঘোষজা উত্তর করিলেন 'আজ্ঞে দুটো আর কই? এখন ত একটি, কেবল বড়টিই আছে।' প্রশ্নকর্ত্তা বিস্মিত হইয়া কহিলেন 'সে ছেলেটির কি হল?' ঘোষজা উত্তর করিলেন—'আজ্ঞে গোবিন্দ সেটিকে নিয়েছেন।' .... তিনি সাধ করিয়া নাতি নাতনী-দিগের নাম রাখিয়াছিলেন। পুত্রের সর্ব্বজ্যেষ্ঠা কন্যা হইলে তাহার নাম রাধারাণী রাখিলেন। ...... সর্ব্বজ্যেষ্ঠা রাধারাণী তাঁহার প্রথম আদরের ধন ছিল। 'রাধে! রাজনন্দিনি! গরবিনি! শ্যাম-সোহাগিনি!' বলিয়া যখন ডাকিতেন, তখন এক বৎসরের বালিকা রাধারাণী অচিরোদ্গত-দন্তাবলীশোভিত মুখচন্দ্রে একটু হাসিয়া, ঝাঁপাইয়া, তাঁহার ক্রোড়ে গিয়া পড়িত। তাহাকে বুকে চাপিয়া বলিতেন—'রাখালের সনে প্রেম করিস্‌নে রাই!' অমনি চক্ষে জলধারা বহিত।''

এদিকে শিশু কন্যা টিমিমণি, নবীনের সহিত তাঁহার ভ্রাতৃবধূর সম্বন্ধ, নবীনের রাঙামা—এগুলিও লেথক বড় সরল এবং সরস সুমিষ্টভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

লেথক ধারাবাহিক গল্পের প্রতি বড় একটা দৃষ্টিপাত করেন নাই—আমরাও গল্পের জন্য বিশেষ লালায়িত নহি। আমরা একজন রীতিমত মনুষ্যের আনন্দজনক বিশ্বাসজনক জীবন-বৃত্তান্ত চাহি;—নশিপুর গ্রামে তর্কভূষণ পরিবারের আদ্যোপান্ত বিবরণ শুনিয়া যাইতে আমাদের কিছুমাত্র শ্রান্তি বোধ হইত না, কারণ, তর্কভূষণ আমাদের হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছেন এবং লেথকও তাঁহার সূক্ষ্মদর্শিনী হাস্যবর্ষিণী কল্পনাশক্তি দ্বারা আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস আকর্ষণ করিতে পারিয়াছেন। কিন্তু লেথক দুইথানি বহির পাতা পরস্পর উল্টাপাল্টা করিয়া দিয়া এক সঙ্গে বাঁধাইয়া দপ্তরীর অন্ন মারিয়াছেন এবং পাঠকদিগের রসভঙ্গ করিয়াছেন এ আক্ষেপ আমরা কিছুতেই ভুলিতে পারিব না।

আলোচনা।

ইণ্ডিয়ান্ রিলীফ্ সোসায়েটি।

অর্থাৎ ভারত দুঃথ নিবারণ সভা। সভার নাম হইতেই তাহার উদ্দেশ্য অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই সভাটি গোপনে স্থাপিত হইয়া কিছুকাল হইতে ভারতবর্ষের হিতোদ্দেশে নানা কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া আসিতেছে। সভা যে পরিমাণে কাজ করিয়াছে সে পরিমাণে আপন নাম ঘোষণা করে নাই ইহাতে আমাদের মনে যথেষ্ট আশার সঞ্চার হয়।

সাধারণতঃ আমাদের দেশের রাজনৈতিকসভাসকল কি কি উদ্দেশ্য এবং উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে তাহা সকলেই অবগত আছেন। এ সভারও সে সকল অঙ্গের কোন ত্রুটি নাই। কিন্তু তাহা ছাড়া ইহার একটি বিশেষত্ব আছে। এ সভা উপযুক্ত বোধ করিলে লোকবিশেষ এবং সম্প্রদায়বিশেষের পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাহাদের দুঃখ দুর করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া থাকে। কারণ, সভার মতে, ভারতবর্ষকে যেমন অনুচিত আইন হইতে রক্ষা করা চাই, তেমনি তাহাকে অন্যায় শাসন হইতেও পরিত্রাণ করা আবশ্যক।

সভার এই বিশেষত্বটুকু আমাদের কাছে সব চেয়ে ভাল লাগিতেছে। তাহার বিশেষ কারণও আছে। অনুচিত আইন এবং অন্যায় শাসন যদি কোন মন্ত্রবলে ভারতবর্ষ হইতে একেবারে উঠিয়া যায়,—আইনকর্ত্তারা যদি সম্পূর্ণ অপক্ষপাত এবং অপরিসীম বিচক্ষণ ব্যক্তি হন, ও শাসনকর্ত্তারা সকলেই অভ্রান্ত ন্যায়পর ও অন্তর্য্যামী হইয়া উঠেন তবে দেশের অনেক দুঃখ দূর ও সুখ বৃদ্ধি হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাতে আমাদের জাতিগত আভ্যন্তরিক অবস্থার অধিক কিছু পরিবর্ত্তন হয় না। কেবল সুআইন এবং সুশাসনে একটা জাত বাঁধিয়া দিতে পারে না; তাহাতে রাজ-ভক্তি এবং রাজনির্ভর বাড়াইয়া দিতে পারে, কিন্তু স্বজাতিভক্তি এবং আত্মনির্ভর তাহাতে বাড়ে না। অথচ সেই স্বজাতিবন্ধনই দেশের সমস্ত স্থায়ী মঙ্গলের মূল ভিত্তি।

গবর্মেণ্টকে কোন প্রকার শিক্ষা দিবার পূর্ব্বে, স্বজাতি এবং স্বজাতির কর্ত্তব্য কাহাকে বলে এই শিক্ষা দেশের লোককে দেওয়া বিশেষ আবশ্যক। এ শিক্ষা কেবল বই পড়াইয়া বা বক্তৃতা দিয়া হইতে পারে না, এ শিক্ষা কেবল প্রত্যক্ষ উদাহরণের দ্বারা হইয়া থাকে।

যখন একজন সামান্য চাষা দেখিতে পাইবে তাহাকে বিজাতি-কৃত অন্যায় হইতে রক্ষা করিবার জন্য নিঃস্বার্থ স্বদেশীর দল অগ্রসর হইতেছে, এমন কি, পরের বিপদ দূর করিতে গিয়া অনাবশ্যক নিজের বিপদ আহ্বান করিয়া লইতেছে তখন সে অন্তরের সহিত অনুভব করিবে স্বজাতি কাহাকে বলে; তখন সে ক্রমে ক্রমে বুঝিতে পারিবে কেবল ভাইবন্ধু তাহার আপন নহে, সমস্ত স্বজাতি তাহার আপন।

অনেক অন্যায় কেবল অবহেলাবশতঃ ঘটিয়া থাকে। যখন জানা থাকে যে, দুর্ব্বল ব্যক্তির অন্যায় প্রতিকারের কোন ক্ষমতা নাই এবং অন্যায়কে সে আপন অদৃষ্টের লিখন জ্ঞান করিয়া তেমন সুতীব্রভাবে অনুভব করে না, তখন তাহার প্রতি সূক্ষ্মভাবে ন্যায়াচরণ করিতে তেমন একান্ত সতর্কতা জন্মে না। তখন তাহার হীনতা উপলব্ধি করিয়া তাহার সুখ দুঃখের প্রতি কথঞ্চিৎ অবজ্ঞা জন্মিয়াই থাকে। কিন্তু যখন প্রত্যেক লোক তাহার স্বজাতির বলে বলী, তখন সে নিজেই অন্যায়ের প্রতি অসহিষ্ণু হইয়া উঠে এবং অন্যেও তাহার প্রতি নির্ব্বিচারে অন্যায় করিতে সাহসী হয় না। কাঁদাকাটি করিয়া পরকে ন্যায়পর করিয়া তুলিবার চেষ্টা করা অপেক্ষা একত্র হইয়া নিজেকে বলশালী করিবার চেষ্টা করাই সঙ্গত।

রিলীফ সোসাএটি যখন ব্যক্তিবিশেষ অথবা সম্প্রদায় বিশেষকে অন্যায় হইতে রক্ষা করিতে অগ্রসর হইবে তখন স্বজাতির নিকটে স্বজাতির মূল্য অনেক বাড়াইয়া দিবে। ইহা অপেক্ষা মহৎ উদ্দেশ্য আর কি হইতে পারে? যে অন্যায় নিবারণের জন্য তাঁহারা চেষ্টা করিবেন সে অন্যায় নিবারণে তাঁহার সক্ষম না হইতে পারেন কিন্তু সেই নিষ্ফল চেষ্টাতেও তাঁহারা যে ফল লাভ করি-

বেন, তাহা, কোন বিশেষ অন্যায় প্রতিকারের অপেক্ষা অনেক গুরুতর।

অন্যায় আইন রহিত করিয়া ভাল আইন প্রচলিত করা এবং ভারতবাসীদের স্বত্বাধিকার বিস্তার করার জন্য কন্‌গ্রেস্ যে চেষ্টা করিতেছেন সে চেষ্টা পরম হিতকর সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহার মুখ্য ফলের অপেক্ষা গৌণ ফল আমাদের নিকট অনেক বেশি মূল্যবান বলিয়া বোধ হয়। ভারতবর্ষীয় ভিন্ন জাতির একত্র সম্মিলন এবং পরস্পর হৃদয় বিনিময়—ইহাই আমাদের পরম লাভ,-ইংরাজের রাজসভায় আসন লাভ করার অপেক্ষা ইহা অনেক সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ। এবং এই কারণেই, রিলীফ্ সোসাএটির অন্যান্য সকল কর্ত্তব্য অপেক্ষা পূর্ব্বোক্ত বিশেষ কর্ত্তব্যটি আমাদের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা আদরণীয় বলিয়া বোধ হয়। অবস্থাবিশেষে পরের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতে হয়, কিন্তু সকল অবস্থাতেই নিজের স্বাধীন বলবৃদ্ধির চেষ্টাই শ্রেয়।

উদ্দেশ্য সংক্ষেপ ও কর্ত্তব্য বিস্তার।

অনেক সময় বৃহৎ উদ্দেশ্য লইয়া বসিলে অল্পই কাজ হয় এবং উদ্দেশ্য খাটো করিলে ফল বেশি পাওয়া যায়। বিশেষতঃ আমাদের অর্থ এবং সামর্থ্য উভয়ই স্বল্প—এই জন্য যথার্থ নিজের কর্ত্তব্য পালন করিবার ইচ্ছা থাকিলে সে কর্ত্তব্যকে আপন সাধ্যসীমার মধ্যে আনিতে হইবে।

বড় বড় স্বাধীন দেশে প্রায় অধিকাংশ শুভকার্য্যের ভূমিপত্তন হইয়া আছে। এই জন্য কোন একটা ফলাও কাজে প্রবৃত্ত হওয়া তাহাদের পক্ষে সহজ। কিন্তু আমাদের দেশে সকল প্রকার দেশহিতকর কাজ একেবারে গোড়া হইতে আরম্ভ করিতে

হয়। অতএব বহুদূরে না গিয়া নিকট হইতে কাজ সুরু করাই আবশ্যক।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, যাহারা সহজে কর্ম্মপ্রিয় নহে তাহাদিগকে কর্ম্মে উৎসাহিত করিতে হইলে খুব একটা বৃহৎ সংকল্পের উত্তেজনা সর্ব্বদা সম্মুখে রাখিতে হয়। ছোট কাজ হইতে বড় কাজে যাওয়া, না, বড় কাজ হইতে ছোট কাজে আসা কোন্‌টা স্বাভাবিক পথ সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন ছোট কাজের নদীপ্রবাহ বাহিয়া বড় কাজের সমুদ্রে গিয়া অবতীর্ণ হইতে হয়। আবার কেহ কেহ বলেন, বড় কাজের গুঁড়ি অবলম্বন করিয়া ছোট কাজের শাখা-প্রশাখায় উত্তীর্ণ হওয়াই সঙ্গত।

আসল কথাটা এই, দেশে যখন একটা নূতন ভাবের আবির্ভাব হয় তখন প্রথমে সেটার দ্বারা আপন কল্পনাকে পরিপূর্ণ করিয়া লইতে হয়;—প্রথমে তাহার সমগ্র বৃহত্ত্বটা সম্মুখে রাখিয়া তাহার সম্যক্ পরিচয় গ্রহণ করিতে হয়;—প্রথমে সেই ভাবটাকে সাধারণতঃ দেশের আব্‌-হাওয়ার সঙ্গে মিশাইয়া লইতে হয়,—তাহার পরে তাহার গূঢ় প্রভাব ছোট বড় নানা কাজে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিতে আরম্ভ করে।

সেই জন্য, এক সময়ে বঙ্গসাহিত্যে যে সকল ভারত-জাগান গানের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল এখন তাহাকে অনেকে পরিহাসচক্ষে দেখিয়া থাকেন; কারণ, দেশহিতৈষণার সাধারণ ভাবটা এখন শিক্ষিতসাধারণের নিকট সুপরিচিত হইয়া গিয়াছে; এখন সাধারণ কথার অপেক্ষা বিশেষ কথার প্রয়োজন বেশি। এখন কোন লোককে জাগিতে বলিলে সে বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠে, আরে বাপু, আমি অনেকক্ষণ জাগিয়া বসিয়া আছি এখন কি করিতে হইবে বল দেখি!

যেমন ভাবের সম্বন্ধে তেমনি কাজের সম্বন্ধেও। এখনও আমাদের দেশহিতৈষিণী সভাগুলি অত্যন্ত বৃহৎ ব্যাপক উদ্দেশ্যের মধ্যে আপনাদিগকে দিশাহারা করিয়া রাখিয়াছেন। সে সকল সভার দ্বারা অনেক শুভফল ফলিতেছে সন্দেহ নাই কিন্তু সেই সঙ্গে এমন কতকগুলি সভার আবশ্যক যাঁহারা উদ্দেশ্যের পরিধি সংক্ষিপ্ত করিয়া যথার্থ কর্ত্তব্যের পরিধি বিস্তৃত করিবেন। অর্থাৎ যাঁহারা কেবল আন্দোলন না করিয়া কাজে হাত দিবেন।

আমাদের প্রথমেই মনে হয় সমস্ত ভারতবর্ষের জন্য বিস্তর সভাসমিতির সৃষ্টি হইয়াছে, এক্ষণে কোন সভা যদি কেবলমাত্র সমস্ত বাঙ্গলা দেশের দুঃখ অভাব মোচনের জন্য কৃতসংকল্প হন তবে সম্ভবতঃ কতকটা বেশি কাজ করিতে পারেন। আমাদের লোকবল, অর্থবল এবং চরিত্রবল যেরূপ, তাহাতে সমস্ত ভারতের হিতসাধনোদ্দেশে আমরা কেবল দরখাস্ত করিতে পারি—কিন্তু কেহ কেহ যদি কেবল বাঙ্গলাদেশের মধ্যেই আপন হিতৈষণার উদ্যম বদ্ধ করেন তবে সম্ভবতঃ কতকটা পরিমাণে কাজ করিতে পারেন—এবং ক্রমে সেই উপায়ে সমস্ত ভারতবর্ষের উন্নতির পাকা ভিত্তি পত্তন করিতে পারেন।

একটা দৃষ্টান্ত দিই। এখন, অধিকাংশ রাজনৈতিক আন্দোলন ইংরাজিতেই হইয়া থাকে; তাহার কারণ, সমস্ত ভারতবর্ষ এবং সমস্ত ভারতবর্ষের রাজাকে কোন কথা নিবেদন করিতে হইলে অগত্যা ইংরাজি ভাষা অবলম্বন করিতে হয়। কিন্তু তাহার ফল হয় এই যে, কেবল শিক্ষিতের নিকট শিক্ষা ছড়ানো হয়। ইংরাজ যে সর্ব্বদাই খোঁটা দিয়া থাকে যে, আমাদের দেশের পোলিটিকাল আন্দোলন কেবল ইংরাজিশিক্ষিতদিগের কৃত্রিম আন্দোলন, সেই নিন্দাবাদের কোন যথার্থ প্রতিকার করা হয় না। পুলিস্ বিল্,

চৌকিদারী বিল্, প্রভৃতি আইন সম্বন্ধে আমাদের আপত্তি আমরা বিদেশীভাষায় টাউন্‌হলে প্রকাশ করিয়া থাকি, তদ্দ্বারা সে সকল বিল্ সংশোধন হইতেও পারে কিন্তু বিল্ সংশোধন অপেক্ষা দেশ-সংশোধন ঢের বড় কাজ। এই সকল বিলে দেশের যে প্রজা-সাধারণের শুভাশুভ নির্ভর করিতেছে, সেই প্রজাদিগকে বিল্-গুলির উদ্দেশ্য এবং আমাদের সকলের কর্ত্তব্য বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক। তাহারা কি অধিকার পাইল এবং তাহাদের নিকট হইতে কি অধিকার প্রত্যাহরণ করা হইল ইহা তাহাদিগকে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিলে যে উপকার হইবে ইংরাজ রাজসভায় দরবার করিয়া সে পরিমাণ উপকার হইবে না!

কেবল ইহাই নয়—দেশের রোগনিবারণ শিক্ষাবিস্তার ধন-বৃদ্ধি, শান্তিরক্ষা, অন্যায়প্রতিকার প্রভৃতি সমস্ত কাজে ঢের বেশি তন্ন তন্ন করিয়া মনোযোগ দেওয়া যাইতে পারে। গবর্মেণ্টকে কর্ত্তব্যশিক্ষা দান করিবার বিস্তৃত আয়োজনে সমস্ত উদ্যম নিয়োগ না করিয়া নিজেদের অদূরবর্ত্তী কর্ত্তব্যপালনের জন্য কিছু অবশিষ্ট রাখা একান্ত আবশ্যক হইয়াছে।

উৎসবে ব্যসনেচৈব দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে
রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ।

দারিদ্র্যে, দুর্ভিক্ষে এবং রাজদ্বারে আমরা আপন দেশের লোকের সাহায্যে আপনারা উপস্থিত থাকিয়া স্বজাতিই স্বজাতির সর্ব্বপ্রধান বান্ধব ইহাই প্রমাণ করা আমাদের প্রধান কাজ। পার্লামেণ্টের সহিত বন্ধুত্বস্থাপনচেষ্টাও মন্দ কাজ নহে—কিন্তু দেশের লোকের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনের ন্যায় ফল তাহাতে পাইব না।

হিন্দু ও মুসলমান।

আমাদের একটা মস্ত কাজ আছে হিন্দুমুসলমানে সখ্যবন্ধন দৃঢ় করা। অন্যদেশের কথা জানি না কিন্তু বাঙ্গলাদেশে যে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সৌহার্দ্দ্য ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বাঙ্গলায় হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা বেশি এবং হিন্দু মুসলমানে প্রতি-বেশিসম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ। কিন্তু আজকাল এই সম্বন্ধ ক্রমশঃ শিথিল হইতে আরম্ভ করিয়াছে। একজন সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী মুসলমান বলিতে-ছিলেন বাল্যকালে তাঁহারা তাঁহাদের প্রতিবেশী ব্রাহ্মণ পরিবারদের সহিত নিতান্ত আত্মীয়ভাবে মেশামেশি করিতেন; তাঁহাদের মা মাসীগণ ঠাকুরাণীদের কোলে পিঠে মানুষ হইয়াছেন। কিন্তু আজ-কাল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে নূতন হিন্দুয়ানী অকস্মাৎ নারদের ঢেঁকি অবলম্বন করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছে। তাঁহারা নবোপার্জ্জিত আর্য্য অভিমানকে সজারুর শলাকার মত আপনাদের চারিদিকে কণ্টকিত করিয়া রাখিয়াছেন; কাহারো কাছে ঘেঁসিবার যো নাই। হঠাৎবাবুর বাবুয়ানার মত তাঁহাদের হঠাৎহিঁদুয়ানি অত্যন্ত অস্বা-ভাবিক উগ্রভাবে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। উপন্যাসে নাটকে কাগজেপত্রে অকারণে বিধর্ম্মীদের প্রতি কটাক্ষপাত করা হইয়া থাকে। আজকাল অনেক মুসলমানেও বাঙ্গলা শিখিতেছেন এবং বাঙ্গলা লিখিতেছেন—সুতরাং স্বভাবতই এক পক্ষ হইতে ইঁট এবং অপরপক্ষ হইতে পাটকেল্ বর্ষণ আরম্ভ হইয়াছে। কোথায় তুর্কীর সুল্‌তান তিনশত পাচক রাখিয়াছেন ইহা লইয়া ম্লেচ্ছদিগকে তির-স্কার ও হিঁদুয়ানির বড়াই করিয়া আপন পাড়ার প্রতিবেশিদের সহিত বিরোধের সূত্রপাত করিলে তাহাতে হিন্দুদের, মাহাত্ম্য নহে, পরন্তু ক্ষুদ্রতারই পরিচয় দেওয়া হয়। যদি আমাদের ধর্ম্মের

এমন কোন গুণ থাকে যাহাতে আমাদের পুরাতন পাড়ার লোক-কেও আপন করিয়া লইতে বাধা দেয় তবে সে বর্ম্মের জন্য অহঙ্কার করিবার কারণ কিছুই দেখি না।

কন্‌গ্রেসে বিদ্রোহ।

কন্‌গ্রেসে নর্টন্‌কে লইয়া যে বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল সে সম্বন্ধে আমাদের মত আমরা পূর্ব্বেই ব্যক্ত কারয়াছিলাম। আমরা এই কথা বলিয়াছিলাম, যে ব্যক্তি সমাজে পতিত, সে যে অকৃত্রিম হিতৈষণাসত্বেও ভারতহিতব্রতে যোগ দিতে পারিবে না আমরা এরূপ জুলুমের কোন অর্থ বুঝিতে পারি না। মনে করা যাক্ হঠাৎ বর্ষায় নদী বাড়িয়া উঠিতেছে, হয় ত এক রাত্রেই জলপ্লাবনে দেশ নষ্ট হইতে পারে; কতকগুলি লোক বাঁধ বাঁধিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে; এমন সময় যদি কোন পাপী লোক আসিয়াও পরের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে চাহে, নৈপুণ্যের সহিত সেই দুষ্কর কার্য্যে সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হয়—তবে কি তাহাকে বলিতে হইবে, আমরা সকলে সাধু এবং তুমি পাপী; অতএব তোমার নৈপুণ্য এবং তোমার হিতৈষণাবৃত্তি লইয়া তুমি চলিয়া যাও তুমি বাঁধ বাঁধিতে পাইবে না? তখন কি ইহা দেখিব না, যাহার যথার্থ হিতেচ্ছা আছে হিত-কর্ম্মে তাহার অধিকার আছে—এবং তাহার অন্য অপরাধ স্মরণ করিয়া তাহাকে ভাল কাজ করিতে বাধা দিলে কেবল তাহাকেই বাধা দেওয়া হয় না, সে কাজকেও বাধা দেওয়া হয়? আমরা এই কথা বলি, দুঃসময়ে যে লোক বাঁধ বাঁধিতে আসিয়াছে, তাহার বাড়িতে নিমন্ত্রণ খাইতে না যাইতে পারি, তাহার সহিত কন্যার বিবাহ না দিতে পারি—কিন্তু তাহাকে বাঁধ বাঁধিতে বাধা দিতে পারি না। আমাদের মধ্যে এমন নিষ্কলঙ্ক সাধু অতি অল্পই আছেন

যাঁহারা অকৃত্রিম সদনুষ্ঠান হইতে কোন পাপীকে নিরস্ত করিবার অধিকার অসঙ্কোচে লইতে পারেন?

আমরা একটি সংক্ষিপ্ত উপমা অবলম্বন করিয়া পূর্ব্বোক্তরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছিলাম। সঞ্জীবনী সেই উপমা প্রয়োগে বিষম বিচলিত হইয়া আমাদের প্রতি অত্যন্ত স্থূল গোছের একটা রসিকতা নিক্ষেপ করিয়াছেন। আমরা উপমা প্রয়োগ করিয়াছিলাম সে অপরাধ স্বীকার করিতেই হইবে কিন্তু কাহারও প্রতি গালি প্রয়োগ করি নাই। সঞ্জীবনীর মত কাগজ, যাঁহাকে বিস্তর প্রচলিত মতের সহিত সর্ব্বদা বিরোধ করিতে হয়, তিনি যে আজও মতের অনৈক্যে ধৈর্য্যরক্ষা করিতে শিক্ষা করিলেন না ইহাতে আমরা বিস্মিত হইয়াছি।

রাষ্ট্রীয় ব্যাপার।

আমাদের কোন বন্ধু গত মাসের সাধনায় পলিটিক্স্ শব্দের ব্যবহার দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন পলিটিক্স শব্দের স্থানে রাষ্ট্রীয় ব্যাপার শব্দ প্রয়োগ করা যাইতে পারে কি না?

বাঙ্গলায় পলিটিক্সের পরিবর্ত্তে রাজনীতি শব্দ প্রচলিত হইয়া গেছে। কিন্তু রাজনীতি শব্দটি পুরাতন, পলিটিক্স আমাদের পক্ষে নূতন। আমাদের দেশে যখন রাজনীতি ছিল তখন ঠিক্ আধুনিক পলিটিক্স ছিল না। সুতরাং উভয় শব্দের মধ্যে অর্থের কিছু ইতর-বিশেষ আছেই। বোধ করি তাহারই প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমাদের বন্ধু রাষ্ট্রীয় ব্যাপার শব্দটি ব্যবহার করিতে ইচ্ছুক।

যখন পূর্ব্বকার রাজার সহিত এখনকার রাজার অনেক তফাৎ হইয়া গেছে তখন রাজনীতি হইতে রাজা শব্দটাই বাদ দেওয়া দরকার। অতএব রাজনীতি না বলিয়া রাষ্ট্রনীতি বলিলে কথাটা

আরও পরিস্কার হয় বটে। কারণ, রাষ্ট্রে রাজা থাকিতেও পারে, না থাকিতেও পারে। যেমন অ্যামেরিকার সম্মিলিত রাষ্ট্রে রাজা নাই, সেখানে রাজনীতি নাই, রাষ্ট্রনীতি আছে। এই হিসাবে রাষ্ট্রনীতি শব্দ রাজনীতি শব্দের অপেক্ষা অধিকতর ব্যাপক।

পলিটিক্স জিনিষটা আমরা ইংরাজের নিকট হইতে পাইয়াছি; অতএব ঐ শব্দটা ইংরাজি আকারে ব্যবহার করিতে আমাদের কোন আপত্তি নাই, তাহাতে উহার ইতিহাসও রক্ষা হয় ভাবও রক্ষা হয়। সেই সঙ্গে যদি একটা বাঙ্গলা প্রতিশব্দ থাকে ত থাক্। রাজনীতি শব্দটি প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। অনেক পুরাতন শব্দ কালক্রমে অর্থ পরিবর্ত্তন করে এস্থলেও তাহা খাটিতে পারে। অপর পক্ষে রাষ্ট্রনীতি শব্দটিও দুরূহ নহে, এবং অধিকতর সঙ্গত।

ভালবাসা।

কি আর বুঝাবে বল, জানি যে ও সব!
কিবা ভালবাসাধর্ম্ম, শুনেছিত তার মর্ম্ম,
পড়েছি কতই তার ব্যাখ্যা অভিনব;—
ভালবাসা স্বর্গসুধা, মিটে সংসারের ক্ষুধা,
যে করে বারেক পান সে হয় অমর,—
ভালবাসা প্রহেলিকা শুনেছি বিস্তর।

ভালবাসা অপার্থিব কত লোকে কয়,
আত্ম বলিদান দিলে তবে ভালবাসা মিলে,

প্রেমিক বাসিয়া ভাল, প্রেম নাহি চায়,
সে চাহে না প্রতিদান, সে করে না অভিমান,
ভালবাসা বিনিময়ে ঘৃণা যদি পায়,
সে দিকে চাহে না সেত, কি ক্ষতি তাহায়!

শুনেছি এ সব তবু, বুঝি নাই কেন!
কেমন এ ক্ষুদ্র প্রাণ পেতে চায় প্রতিদান
পদে পদে অভিমান বাধা পায় যেন;
আমি ভালবাসি যায়, সে কভু না ফিরে চায়
চরণে ধরিলে তার ঠেলে সেই পায়,
এ কথা ভাবিলে তবু বুক ফেটে যায়!

হায় রে, এ ভালবাসা নূতন প্রকার,
ভাল বাসি বলে তাই আপন করিতে চাই'
আত্ম বলিদান নাই, সকলি আমার;
তাহারে আপন করি, পরাণে লইব হরি,
কেন সদা পেতে চাই এই অধিকার,
বুঝিবেনা ভালবাসা নূতন ধারার!

গ্রন্থ সমালোচনা।

নূরজাহান। শ্রীবিপিনবিহারী ঘোষ দ্বারা প্রণীত ও প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

গ্রন্থখানি নাটক। এই নাটকের কি গদ্য, কি পদ্য, কি ঘটনা-সংস্থান, কি চরিত্র চিত্র, কি আরম্ভ, কি পরিণাম সকলি অদ্ভুত

হইয়াছে। ভাষাটা যেন বাঁকা বাঁকা, নিতান্তই বিদেশীর বাঙ্গলার মত এবং সমস্ত গ্রন্থখানিই যেন পাঠকদের প্রতি পরিহাস বলিয়া মনে হয়। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে, স্থানে স্থানে ইহাতে নাট্যকলা এবং কবিত্বের আভাস নাই যে তাহাও নহে কিন্তু পরক্ষণেই তাহা প্রলাপে পরিণত হইয়াছে ;—তাই এক এক সময়ে মনে হয় লেখকের ক্ষমতা আছে কিন্তু সে ক্ষমতা যেন প্রকৃতিস্থ অবস্থায় নাই।

শুভ পরিণয়ে।

বন্ধুর শুভ পরিণয়ে কোন প্রচ্ছন্ননামা লেখক এই ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন। ইহা পাঠকসাধারণের জন্য প্রকাশিত হয় নাই, এই কারণে আমাদের পত্রিকায় এ গ্রন্থের সমালোচনা অনাবশ্যক বোধ করি।

ভ্রমসংশোধন।

ফাল্গুনের সাধনায় ৩০০ পৃঃ শেষ প্যারাগ্রাফের শেষে এই কয় লাইন বসিবেঃ—

"কিন্তু মানুষের মনের কোন অবস্থার সমগ্র চিত্র প্রদর্শন করিতে হইলে দ্বিতীয় প্রণালী আবশ্যক।"

সাধনা।

মানভঞ্জন।

রমানাথ শীলের ত্রিতল অট্টালিকায় সর্ব্বোচ্চ তলের ঘরে গোপীনাথ শীলের স্ত্রী গিরিবালা বাস করেন। শয়ন কক্ষের দক্ষিণ দ্বারের সম্মুখে ফুলের টবে গুটিকতক বেলফুল এবং গোলাপফুলের গাছ;—ছাতটি উচ্চ প্রাচীর দিয়া ঘেরা—বহির্দৃশ্য দেখিবার জন্য প্রাচীরের মাঝে মাঝে একটি করিয়া ইঁট ফাঁক দেওয়া আছে। শোবার ঘরে নানা বেশ এবং বিবেশ-বিশিষ্ট বিলাতী নারীমূর্ত্তির বাঁধানো এন্‌গ্রেভিং টাঙ্গানো রহিয়াছে; কিন্তু প্রবেশদ্বারের সম্মুখবর্ত্তী বৃহৎ আয়নার উপরে ষোড়শী গৃহস্বামিনীর যে প্রতিবিম্বটি পড়ে, তাহা দেয়ালের কোন ছবি অপেক্ষা সৌন্দর্য্যে ন্যূন নহে।

গিরিবালার সৌন্দর্য্য অকস্মাৎ আলোকরশ্মির ন্যায়, বিস্ময়ের ন্যায়, নিদ্রাভঙ্গে চেতনার ন্যায় একেবারে চকিতে আসিয়া আঘাত করে এবং এক আঘাতে অভিভূত করিয়া দিতে পারে। তাহাকে দেখিলে মনে হয় ইহাকে দেখিবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। চারিদিকে এবং চিরকাল যেরূপ দেখিয়া আসিতেছি এ একেবারে হঠাৎ তাহা হইতে অনেক স্বতন্ত্র।

গিরিবালাও আপন লাবণ্যোচ্ছ্বাসে আপনি আদ্যোপান্ত তরঙ্গিত হইয়া উঠিয়াছে। মদের ফেনা যেমন পাত্র ছাপিয়া পড়িয়া যায়, নবযৌবন এবং নবীন সৌন্দর্য্য তাহার সর্ব্বাঙ্গে তেমনি

ছাপিয়া পড়িয়া যাইতেছে,—তাহার বসনে ভূষণে গমনে, তাহার বাহুর বিক্ষেপে, তাহার গ্রীবার ভঙ্গীতে, তাহার চঞ্চল চরণের উদ্দাম ছন্দে, নূপুর নিক্কনে, কঙ্কণের কিঙ্কিনিতে, তরল হাস্যে, ক্ষিপ্রভাষায়, উজ্জ্বল কটাক্ষে একেবারে উচ্ছৃঙ্খল ভাবে উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছে।

আপন সর্ব্বাঙ্গের এই উচ্ছ্বলিত মদিররসে গিরিবালার একটা নেশা লাগিয়াছে। প্রায় দেখা যাইত, একখানি কোমল রঙীন্ বস্ত্রে আপনার পরিপূর্ণ দেহখানি জড়াইয়া সে ছাতের উপরে অকারণে চঞ্চল হইয়া বেড়াইতেছে। যেন মনের ভিতরকার কোন এক অশ্রুত অব্যক্ত সঙ্গীতের তালে তালে তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নৃত্য করিতে চাহিতেছে। আপনার অঙ্গকে নানা ভঙ্গীতে উৎক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত প্রক্ষিপ্ত করিয়া তাহার যেন বিশেষ কি এক আনন্দ আছে;—সে যেন আপন সৌন্দর্য্যের নানা দিকে নানা ঢেউ তুলিয়া দিয়া সর্ব্বাঙ্গের উত্তপ্ত রক্তস্রোতে অপূর্ব্ব পুলক সহকারে বিচিত্র আঘাত প্রতিঘাত অনুভব করিতে থাকে। সে হঠাৎ গাছ হইতে পাতা ছিঁড়িয়া দক্ষিণ বাহু আকাশে তুলিয়া সেটা বাতাসে উড়াইয়া দেয়—অমনি তাহার বালা বাজিয়া উঠে, তাহার অঞ্চল বিস্রস্ত হইয়া পড়ে, তাহার সুললিত বাহুর ভঙ্গীটি পিঞ্জরমুক্ত অদৃশ্য পাখীর মত অনন্ত-আকাশে মেঘরাজ্যের অভিমুখে উড়িয়া চলিয়া যায়। হঠাৎ সে টব হইতে একটা মাটির ঢেলা তুলিয়া অকারণে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়; চরণাঙ্গুলির উপর ভর দিয়া উচ্চ হইয়া দাঁড়াইয়া প্রাচীরের ছিদ্র দিয়া বৃহৎ বহির্জগৎটা একবার চট্ করিয়া দেখিয়া লয়—আবার ঘুরিয়া আঁচল ঘুরাইয়া চলিয়া আসে, আঁচলের চাবির গোচ্ছা ঝিন্ ঝিন্ করিয়া বাজিয়া উঠে। হয় ত আয়নার সম্মুখে গিয়া খোঁপা খুলিয়া ফেলিয়া অসময়ে চুল বাঁধিতে বসে; চুল

বাঁধিবার দড়ি দিয়া কেশমূল বেষ্টন করিয়া সেই দড়ি কুন্দদন্ত-পংক্তিতে দংশন করিয়া ধরে, দুইবাহু উর্দ্ধে তুলিয়া মস্তকের পশ্চাতে বেণীগুলিকে দৃঢ় আকর্ষণে কুণ্ডলায়িত করে—চুল বাঁধা শেষ করিয়া হাতের সমস্ত কাজ ফুরাইয়া যায়—তখন সে আলস্য-ভরে কোমল বিছানার উপরে আপনাকে পত্রান্তরালচ্যুত একটি জ্যোৎস্নালেখার মত বিস্তীর্ণ করিয়া দেয়।

তাহার সন্তানাদি নাই, ধনীগৃহে তাহার কোন কাজকর্ম্মও নাই—সে কেবল নির্জ্জনে প্রতিদিন আপনার মধ্যে আপনি সঞ্চিত হইয়া শেষকালে আপনাকে আর ধারণ করিয়া রাখিতে পারিতেছে না। স্বামী আছে কিন্তু স্বামী তাহার আয়ত্তের মধ্যে নাই। গিরিবালা বাল্যকাল হইতে যৌবনে এমন পূর্ণবিকশিত হইয়া উঠিয়াও কেমন করিয়া তাহার স্বামীর চক্ষু এড়াইয়া গেছে।

বরঞ্চ বাল্যকালে সে তাহার স্বামীর আদর পাইয়াছিল। স্বামী তখন ইস্কুল পালাইয়া তাহার সুপ্ত অভিভাবকদিগকে বঞ্চনা করিয়া নির্জ্জন মধ্যাহ্নে তাহার বালিকা স্ত্রীর সহিত প্রণয়ালাপ করিতে আসিত। এক বাড়িতে থাকিয়াও সৌখীন চিঠির কাগজে স্ত্রীর সহিত চিঠিপত্র লেখালেখি করিত। ইস্কুলের বিশেষ বন্ধুদিগকে সেই সমস্ত চিঠি দেখাইয়া গর্ব্ব অনুভব করিত। তুচ্ছ এবং কল্পিত কারণে স্ত্রীর সহিত মান অভিমানেরও অসদ্ভাব ছিল না।

এমন সময় বাপের মৃত্যুতে গোপীনাথ স্বয়ং বাড়ির কর্ত্তা হইয়া উঠিল। কাঁচা কাঠের তক্তায় শীঘ্র পোকা ধরে—কাঁচা বয়সে গোপীনাথ যখন স্বাধীন হইয়া উঠিল তখন অনেকগুলি জীবজন্তু তাহার স্কন্ধে বাসা করিল। তখন ক্রমে অন্তঃপুরে তাহার গতি-বিধি হ্রাস হইয়া অন্যত্র প্রসারিত হইতে লাগিল।

দলপতিত্বের একটা উত্তেজনা আছে; মানুষের কাছে মানু-

ষের নেশাটা অত্যন্ত বেশি। অসংখ্য মনুষ্যজীবন এবং সুবিস্তীর্ণ ইতিহাসের উপর আপন প্রভাব বিস্তার করিবার প্রতি নেপোলিয়নের যে একটা প্রবল আকর্ষণ ছিল—একটি ছোট বৈঠকখানার ছোট কর্ত্তাটিরও নিজের ক্ষুদ্র দলের নেশা অল্পতর পরিমাণে সেই এক জাতীয়। সামান্য ইয়ার্কিবন্ধনে আপনার চারিদিকে একটা লক্ষ্মীছাড়া ইয়ারমণ্ডলী সৃজন করিয়া তুলিলে তাহাদের উপর আধিপত্য এবং তাহাদের নিকট হইতে বাহবা লাভ করা একটা প্রচণ্ড উত্তেজনার কারণ হইয়া দাঁড়ায়-সে জন্য অনেক লোক বিষয় নাশ, ঋণ, কলঙ্ক সমস্তই স্বীকার করিতে প্রস্তুত হয়।

গোপীনাথ তাহার ইয়ার সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষ হইয়া ভারি মাতিয়া উঠিল। সে প্রতিদিন ইয়ার্কির নব নব কীর্ত্তি নব নব গৌরব লাভ করিতে লাগিল। তাহার দলের লোক বলিতে লাগিল—শ্যালকবর্গের মধ্যে ইয়ার্কিতে অদ্বিতীয় খ্যাতিলাভ করিল গোপীনাথ; সেই গর্ব্বে সেই উত্তেজনায় অন্যান্য সমস্ত সুখদুঃখকর্ত্তব্যের প্রতি অন্ধ হইয়া হতভাগ্য ব্যক্তিটি রাত্রি দিন আবর্ত্তের মত পাক খাইয়া খাইয়া বেড়াইতে লাগিল।

এদিকে জগজ্জয়ী রূপ লইয়া আপন অন্তঃপুরের প্রজাহীন রাজ্যে, শয়ন-গৃহের শূন্য সিংহাসনে গিরিবালা অধিষ্ঠান করিতে লাগিল। সে নিজে জানিত বিধাতা তাহার হস্তে রাজদণ্ড দিয়াছেন—সে জানিত, প্রাচীরের ছিদ্র দিয়া যে বৃহৎ জগৎখানি দেখা যাইতেছে, সেই জগৎটিকে সে কটাক্ষে জয় করিয়া আসিতে পারে—অথচ বিশ্বসংসারের মধ্যে একটি মানুষকেও সে বন্দী করিতে পারে নাই।

গিরিবালার একটি সুরসিকা দাসী আছে তাহার নাম, সুধো, অর্থাৎ সুধামুখী। সে গান গাহিত, নাচিত, ছড়া কাটিত,

প্রভুপত্নীর রূপের ব্যাখ্যা করিত, এবং অরসিকের হস্তে এমন রূপ নিষ্ফল হইল বলিয়া আক্ষেপ করিত। গিরিবালার যখন-তখন এই সুধোকে নহিলে চলিত না। উল্‌টিয়া পাল্‌টিয়া সে নিজের মুখের শ্রী, দেহের গঠন, বর্ণের উজ্জলতা সম্বন্ধে বিস্তৃত সমালোচনা শুনিত ; মাঝে মাঝে তাহার প্রতিবাদ করিত, এবং পরম পুলকিত চিত্তে সুধোকে মিথ্যাবাদিনী চাটুভাষিণী বলিয়া গঞ্জনা করিতে ছাড়িত না ;—সুধো তখন শত শত শপথ সহকারে নিজের মতের অকৃত্রিমতা প্রমাণ করিতে বসিত, গিরিবালার পক্ষে তাহা বিশ্বাস করা নিতান্ত কঠিন হইত না।

সুধো গিরিবালাকে গান শুনাইত—"দাসখত দিলাম লিখে শ্রীচরণে" ;—এই গানের মধ্যে গিরিবালা নিজের অলক্তাঙ্কিত অনিন্দ্য সুন্দর চরণপল্লবের স্তব শুনিতে পাইত এবং একটি পদ-লুণ্ঠিত দাসের ছবি তাহার কল্পনায় উদিত হইত—কিন্তু হায়, দুটি শ্রীচরণ মলের শব্দে শূন্য ছাতের উপরে আপন জয়গান ঝঙ্কৃত করিয়া বেড়ায় তবু কোন স্বেচ্ছাবিক্রীত ভক্ত আসিয়া দাসখৎ লিখিয়া দিয়া যায় না।

গোপীনাথ যাহাকে দাসখৎ লিখিয়া দিয়াছে, তাহার নাম লবঙ্গ—সে থিয়েটারে অভিনয় করে—সে ষ্টেজের উপরে চমৎকার মূর্চ্ছা যাইতে পারে—সে যখন সানুনাসিক কৃত্রিম কাঁদুনীর স্বরে হাঁপাইয়া হাঁপাইয়া টানিয়া টানিয়া আধ-আধ উচ্চারণে "প্রাণনাথ প্রাণেশ্বর" করিয়া ডাক ছাড়িতে থাকে, তখন পাৎলা ধুতির উপর ওয়েষ্ট্‌কোট্‌-পরা, ফুল্‌মোজামণ্ডিত দর্শকমণ্ডলী "এক্সেলেণ্ট্‌" "এক্সেলেণ্ট" করিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে।

এই অভিনেত্রী লবঙ্গের অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতার বর্ণনা গিরিবালা ইতিপূর্ব্বে অনেকবার তাহার স্বামীর মুখেই শুনিয়াছে। তখনও

তাহার স্বামী সম্পূর্ণরূপে পলাতক হয় নাই। তখন সে তাহার স্বামীর মোহাবস্থা না জানিয়াও মনে মনে অসূয়া অনুভব করিত। আর কোন নারীর এমন কোন মনোরঞ্জনী বিদ্যা আছে যাহা তাহার নাই ইহা সে সহ্য করিতে পারিত না। সাসূয় কৌতূহলে সে অনেকবার থিয়েটার দেখিতে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিত কিন্তু কিছুতেই স্বামীর মত করিতে পারিত না। অবশেষে সে একদিন টাকা দিয়া সুধোকে থিয়েটার দেখিতে পাঠাইয়া দিল— সুধো আসিয়া নাসাকুঞ্চিত করিয়া রামনাম উচ্চারণ পূর্ব্বক অভিনেত্রীদিগের ললাটদেশে সম্মার্জ্জনীর ব্যবস্থা করিল—এবং তাহাদের কদর্য্যমূর্ত্তি ও কৃত্রিম ভঙ্গীতে যে সমস্ত পুরুষের অভিরুচি জন্মে তাহাদের সম্বন্ধেও সেই একই রূপ বিধান স্থির করিল। শুনিয়া গিরিবালা বিশেষ আশ্বস্ত হইল।

কিন্তু যখন তাহার স্বামী বন্ধন ছিন্ন করিয়া গেল, তখন তাহার মনে সংশয় উপস্থিত হইল। সুধোর কথায় অবিশ্বাস প্রকাশ করিলে সুধো গিরির গা ছুঁইয়া বারম্বার কহিল বস্ত্রখণ্ডাবৃত দগ্ধ-কাষ্ঠের মত তাহার নীরস এবং কুৎসিৎ চেহারা। গিরি তাহার আকর্ষণী শক্তির কোন কারণ নির্ণয় করিতে পারিল না এবং নিজের অভিমানে সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হইয়া জ্বলিতে লাগিল।

অবশেষে এক দিন সন্ধ্যাবেলায় সুধোকে লইয়া গোপনে থিয়েটার দেখিতে গেল। নিষিদ্ধ কাজের উত্তেজনা বেশি। তাহার হৃৎপিণ্ডের মধ্যে যে এক মৃদু কম্পন উপস্থিত হইয়াছিল সেই কম্পনাবেগে এই আলোকময়, লোকময়, বাদ্যসঙ্গীতমুখরিত, দৃশ্য-পটশোভিত রঙ্গভূমি তাহার চক্ষে দ্বিগুণ অপরূপতা ধারণ করিল। তাহার সেই প্রাচারবেষ্টিত নির্জ্জন নিরানন্দ অন্তঃপুর হইতে এ

কোন্ এক সুসজ্জিত সুন্দর উৎসবলোকের প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইল! সমস্ত স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

সে দিন মানভঞ্জন অপেরা অভিনয় হইতেছে। যখন ঘণ্টা বাজিল, বাদ্য থামিয়া গেল, চঞ্চল দর্শকগণ মুহূর্ত্তে স্থির নিস্তব্ধ হইয়া বসিল, রঙ্গমঞ্চের সম্মুখবর্ত্তী আলোকমালা উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল, পট উঠিয়া গেল, এক দল সুসজ্জিত নটী ব্রজাঙ্গনা সাজিয়া সঙ্গীত-সহযোগে নৃত্য করিতে লাগিল, দর্শকগণের করতালি ও প্রশংসাবাদে নাট্যশালা থাকিয়া থাকিয়া ধ্বনিত কম্পিত হইয়া উঠিল, তখন গিরিবালার তরুণ দেহের রক্তলহরী উন্মাদনায় আলোড়িত হইতে লাগিল। সেই সঙ্গীতের তানে, আলোক ও আভরণের ছটায়, এবং সম্মিলিত প্রশংসাধ্বনিতে সে ক্ষণকালের জন্য সমাজ সংসার সমস্তই বিস্মৃত হইয়া গেল—মনে করিল, এমন এক জায়গায় আসিয়াছে যেখানে বন্ধনমুক্ত সৌন্দর্য্যপূর্ণ স্বাধীনতার কোন বাধা-মাত্র নাই।

সুধো মাঝে মাঝে আসিয়া ভীতস্বরে কানে কানে বলে, বৌ-ঠাকরুণ, এই বেলা বাড়ি ফিরিয়া চল; দাদাবাবু জানিতে পারিলে রক্ষা থাকিবে না। গিরিবালা সে কথায় কর্ণপাত করে না। তাহার মনে এখন আর কিছুমাত্র ভয় নাই।

অভিনয় অনেক দূর অগ্রসর হইল। রাধার দুর্জ্জয় মান হইয়াছে;—সে মানসাগরে কৃষ্ণ আর কিছুতেই থই পাইতেছে না;—কত অনুনয় বিনয় সাধাসাধি কাঁদাকাঁদি—কিছুতেই কিছু হয় না! তখন গর্ব্বভরে গিরিবালার বক্ষ ফুলিতে লাগিল। কৃষ্ণের এই লাঞ্ছনায় সে যেন মনে মনে রাধা হইয়া নিজের অসীম প্রতাপ নিজে অনুভব করিতে লাগিল। কেহ তাহাকে কখন এমন করিয়া সাধে নাই; সে অবহেলিত অবমানিত পরিত্যক্ত স্ত্রী, কিন্তু তবু সে এক অপূর্ব্ব

মোহে স্থির করিল, যে, এমন করিয়া নিষ্ঠুরভাবে কাঁদাইহার ক্ষমতা তাহারও আছে। সৌন্দর্য্যের যে কেমন দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ তাহা সে কানে শুনিয়াছে অনুমান করিয়াছে মাত্র—আজ দীপের আলোকে, গানের সুরে, সুদৃশ্য রঙ্গমঞ্চের উপরে তাহা সুস্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করিল। নেশায় তাহার সমস্ত মস্তিষ্ক ভরিয়া উঠিল।

অবশেষে যবনিকা পতন হইল, গ্যাসের আলো ম্লান হইয়া আসিল, দর্শকগণ প্রস্থানের উপক্রম করিল; গিরিবালা মন্ত্রমুগ্ধের মত বসিয়া রহিল। এখান হইতে উঠিয়া যে বাড়ি যাইতে হইবে একথা তাহার মনে ছিল না। সে ভাবিতেছিল, অভিনয় বুঝি ফুরাইবে না, যবনিকা আবার উঠিবে, রাধিকার নিকট শ্রীকৃষ্ণের পরাভব, জগতে ইহা ছাড়া আর কোন বিষয় উপস্থিত নাই। সুধো কহিল, বৌঠাকুরুণ, কর কি, ওঠ, এখনি সমস্ত আলো নিবাইয়া দিবে।

গিরিবালা গভীর রাত্রে আপন শয়নকক্ষে ফিরিয়া আসিল। কোণে একটি দীপ মিট্‌মিট্‌ করিতেছে—ঘরে একটি লোক নাই, শব্দ নাই—গৃহপ্রান্তে নির্জ্জন শয্যার উপরে একটি পুরাতন মশারি বাতাসে অল্প অল্প দুলিতেছে; তাহার প্রতিদিনের জগৎ অত্যন্ত বিশ্রী বিরস এবং তুচ্ছ বলিয়া ঠেকিতে লাগিল। কোথায় সেই সৌন্দর্য্যময় আলোকময় সঙ্গীতময় রাজ্য যেখানে সে আপনার সমস্ত মহিমা বিকীর্ণ করিয়া দিয়া জগতের কেন্দ্রস্থলে বিরাজ করিতে পারে—যেখানে সে অজ্ঞাত অবজ্ঞাত তুচ্ছ সাধারণ নারীমাত্র নহে!

এখন হইতে সে প্রতি সপ্তাহেই থিয়েটারে যাইতে আরম্ভ করিল। কালক্রমে তাহার সেই প্রথম মোহ অনেকটা পরিমাণে হ্রাস হইয়া আসিল—এখন সে নটনটীদের মুখের রং চং, সৌন্দর্য্যের অভাব, অভিনয়ের কৃত্রিমতা সমস্ত দেখিতে পাইল, কিন্তু তবু

তাহার নেশা ছুটিল না। রণসঙ্গীত শুনিলে যোদ্ধার হৃদয় যেমন নাচিয়া উঠে, রঙ্গমঞ্চের পট উঠিয়া গেলেই তাহার বক্ষের মধ্যে সেইরূপ আন্দোলন উপস্থিত হইত। ঐ যে, সমস্ত সংসার হইতে স্বতন্ত্র সুদৃশ্য সমুচ্চ সুন্দর বেদিকা, স্বর্ণলেখায় অঙ্কিত, চিত্রপটে সজ্জিত, কাব্য এবং সঙ্গীতের ইন্দ্রজালে মায়ামণ্ডিত, অসংখ্য মুগ্ধ-দৃষ্টির দ্বারা আক্রান্ত, নেপথ্য ভূমির গোপনতার দ্বারা অপূর্ব্ব রহস্য-প্রাপ্ত, উজ্জ্বল আলোকমালায় সর্ব্বসমক্ষে সুপ্রকাশিত,– বিশ্ববিজয়িনী সৌন্দর্য্যরাজ্ঞীর পক্ষে এমন মায়া-সিংহাসন আর কোথায় আছে ?

প্রথমে যে দিন সে তাহার স্বামীকে রঙ্গভূমিতে উপস্থিত দেখিল, এবং যখন গোপীনাথ কোন নটীর অভিনয়ে উন্মত্ত উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিতে লাগিল, তখন স্বামীর প্রতি তাহার মনে প্রবল অবজ্ঞার উদয় হইল। সে জর্জ্জরিত চিত্তে মনে করিল যদি কখন এমন দিন আসে যে, তাহার স্বামী তাহার রূপে আকৃষ্ট হইয়া দগ্ধ-পক্ষ পতঙ্গের মত তাহার পদতলে আসিয়া পড়ে, এবং সে আপন চরণ নখরের প্রান্ত হইতে উপেক্ষা বিকীর্ণ করিয়া দিয়া অভিমান-ভরে চলিয়া যাইতে পারে তবেই তাহার এই ব্যর্থ রূপ ব্যর্থ যৌবন সার্থকতা লাভ করিবে।

কিন্তু সে শুভদিন আসিল কই? আজ কাল গোপীনাথের দর্শন পাওয়াই দুর্লভ হইয়াছে। সে আপন প্রমত্ততার ঝড়ের মুখে ধূলিধ্বজের মত একটা দল পাকাইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে কোথায় চলিয়া গিয়াছে তাহার আর ঠিকানা নাই।

একদিন চৈত্রমাসের বাসন্তী পূর্ণিমায় গিরিবালা বসন্তীরঙ্গের কাপড় পরিয়া দক্ষিণ বাতাসে অঞ্চল উড়াইয়া ছাতের উপর বসিয়াছিল। যদিও ঘরে স্বামী আসে না তবু গিরি উল্টিয়া

পাল্টিয়া প্রতিদিন বদল করিয়া নূতন নূতন গহনায় আপনাকে সুসজ্জিত করিয়া তুলিত। হীরামুকুতার আভরণ তাহার অঙ্গে প্রত্যঙ্গে একটি উন্মাদনা সঞ্চার করিত, ঝল্‌মল্ করিয়া ঝুনুঝুনু বাজিয়া তাহার চারিদিকে একটি হিল্লোল তুলিতে থাকিত। আজ সে হাতে বাজুবন্ধ এবং গলায় একটি চুণী ও মুক্তার কণ্ঠী পরিয়াছে এবং বাম হস্তের কনিষ্ঠ অঙ্গুলীতে একটি নীলার আংটি দিয়াছে। সুধো পায়ের কাছে বসিয়া মাঝে মাঝে তাহার নিটোল-কোমল রক্তোৎপল পদপল্লবে হাত বুলাইতেছিল—এবং অকৃত্রিম উচ্ছ্বাসের সহিত বলিতেছিল, আহা বৌঠাকুরুণ আমি যদি পুরুষ মানুষ হইতাম তাহা হইলে এই পা দুখানি বুকে লইয়া মরিতাম। গিরিবালা সগর্ব্বে হাসিয়া উত্তর দিতেছিল, বোধ করি বুকে না লইয়াই মরিতে হইত—তখন কি আর এমন করিয়া পা ছড়াইয়া দিতাম? আর বকিস্‌নে; তুই সেই গানটা গা!

সুধো সেই জ্যোৎস্নাপ্লাবিত নির্জ্জন ছাদের উপর গাহিতে লাগিল—

দাসখৎ দিলেম লিখে শ্রীচরণে,
সকলে সাক্ষী থাকুক্ বৃন্দাবনে।

তখন রাত্রি দশটা। বাড়ির আর সকলে আহারাদি সমাধা করিয়া ঘুমাইতে গিয়াছে। এমন সময় আতর মাখিয়া উড়ানী উড়াইয়া হঠাৎ গোপীনাথ আসিয়া উপস্থিত হইল—সুধো অনেক খানি জিব কাটিয়া সাত হাত ঘোমটা টানিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

গিরিবালা ভাবিল আজ তাহার দিন আসিয়াছে। সে মুখ তুলিয়া চাহিল না। সে রাধিকার মত গুরুমানভরে অটল হইয়া

বসিয়া রহিল। কিন্তু দৃশ্যপট উঠিল না—শিখিপুচ্ছচূড়া পায়ের কাছে লুটাইল না—কেহ কাফি রাগিণীতে গাহিয়া উঠিল না—

কেন, পূর্ণিমা আঁধার কর লুকায়ে বদন শশি!

সঙ্গীতহীন নীরসকণ্ঠে গোপীনাথ বলিল—একবার চাবিটা দাও দেখি! এমন জ্যোৎস্নায় এমন বসন্তে এতদিনের বিচ্ছেদের পরে এই কি প্রথম সম্ভাষণ! কাব্যে নাটকে উপন্যাসে যাহা লেখে তাহার আগাগোড়াই মিথ্যা কথা! অভিনয়মঞ্চেই প্রণয়ী গান গাহিয়া পায়ে আসিয়া লুটাইয়া পড়ে—এবং তাহাই দেখিয়া যে দর্শকের চিত্ত বিগলিত হইয়া যায়, সেই লোকটি বসন্ত নিশীথে গৃহছাদে আসিয়া আপন অনুপমা যুবতী স্ত্রীকে বলে, ওগো একবার চাবিটা দাও দেখি! তাহাতে না আছে রাগিণী না আছে প্রীতি, তাহাতে কোন মোহ নাই মাধুর্য্য নাই, তাহা অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর!

এমন সময়ে দক্ষিণে বাতাস জগতের সমস্ত অপমানিত কবিত্বের মর্ম্মান্তিক দীর্ঘনিঃশ্বাসের মত হুহু করিয়া বহিয়া গেল—টবভরা ফুটন্ত বেলফুলের গন্ধ ছাদময় ছড়াইয়া দিয়া গেল—গিরিবালার চূর্ণ অলক চোখে মুখে আসিয়া পড়িল এবং তাহার বসন্তীরঙের সুগন্ধি আঁচল অধীরভাবে যেখানে সেখানে উড়িতে লাগিল। গিরিবালা সমস্ত মান বিসর্জ্জন দিয়া উঠিয়া পড়িল। স্বামীর হাত ধরিয়া বলিল, চাবী দিব এখন, তুমি ঘরে চল।—আজ সে কাঁদিবে কাঁদাইবে, তাহার সমস্ত নির্জ্জন কল্পনাকে সার্থক করিবে, তাহার সমস্ত ব্রহ্মাস্ত্র বাহির করিয়া বিজয়ী হইবে, ইহা সে দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়াছে। গোপীনাথ কহিল, আমি বেশি দেরী করিতে পারিব না—তুমি চাবি দাও।—গিরিবালা কহিল—আমি চাবি দিব এবং চাবির মধ্যে যাহা কিছু আছে সমস্ত দিব—কিন্তু আজ

রাত্রে তুমি কোথাও যাইতে পারিবে না।—গোপীনাথ বলিল—সে হইবে না। আমার বিশেষ দরকার আছে।—গিরিবালা বলিল—তবে আমি চাবি দিব না!—গোপী বলিল দিবে না বৈ কি? কেমন না দাও দেখিব! বলিয়া সে গিরিবালার আঁচলে দেখিল চাবি নাই। ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া তাহার আয়নার বাক্সর দেরাজ খুলিয়া দেখিল তাহার মধ্যেও চাবি নাই। তাহার চুল বাঁধিবার বাক্স জোর করিয়া ভাঙ্গিয়া খুলিল—তাহাতে কাজললতা, সিঁদুরের কৌটা, চুলের দড়ি প্রভৃতি বিচিত্র উপকরণ আছে—চাবি নাই। তখন সে বিছানা ঘাঁটিয়া গদি উঠাইয়া আল্‌মারি ভাঙ্গিয়া নাস্তানাবুদ্‌ করিয়া তুলিল। গিরিবালা প্রস্তরমূর্ত্তির মত শক্ত হইয়া দরজা ধরিয়া ছাদের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ব্যর্থমনোরথ গোপীনাথ রাগে গর্‌গর্‌ করিতে করিতে আসিয়া বলিল—চাবি দাও বলিতেছি নহিলে ভাল হইবে না। গিরিবালা উত্তরমাত্র দিল না। তখন গোপী তাহাকে চাপিয়া ধরিল এবং তাহার হাত হইতে বাজুবন্ধ, গলা হইতে কণ্ঠী, অঙ্গুলি হইতে আংটি ছিনিয়া লইয়া তাহাকে লাথি মারিয়া চলিয়া গেল।

বাড়ির কাহারও নিদ্রাভঙ্গ হইল না, পল্লীর কেহ কিছুই জানিতে পারিল না, জ্যোৎস্নারাত্রি তেমনি নিস্তব্ধ হইয়া রহিল, সর্ব্বত্র যেন অখণ্ড শান্তি বিরাজ করিতেছে। কিন্তু অন্তরের চীৎকারধ্বনি যদি বাহিরে শুনা যাইত তবে সেই চৈত্র মাসের সুখসুপ্ত জ্যোৎস্নানিশীথিনী অকস্মাৎ তীব্রতম আর্ত্তস্বরে দীর্ণ বিদীর্ণ হইয়া যাইত। এমন সম্পূর্ণ নিঃশব্দে এমন হৃদয়-বিদারণ ব্যাপার ঘটিয়া থাকে!

অথচ সে রাত্রিও কাটিয়া গেল। এমন পরাভব এত অপমান গিরিবালা সুধোর কাছেও বলিতে পারিল না। মনে করিল,

আত্মহত্যা করিয়া, এই অতুল রূপ যৌবন নিজের হাতে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া সে আপন অনাদরের প্রতিশোধ লইবে। কিন্তু তখনি মনে পড়িল, তাহাতে কাহারও কিছু আসিবে যাইবে না—পৃথিবীর যে কতখানি ক্ষতি হইবে তাহা কেহ অনুভবও করিবে না। জীবনেও কোন সুখ নাই, মৃত্যুতেও কোন সান্ত্বনা নাই।

গিরিবালা বলিল, আমি বাপের বাড়ি চলিলাম।—তাহার বাপের বাড়ি কলিকাতা হইতে দূরে। সকলেই নিষেধ করিল—কিন্তু বাড়ির কর্ত্রী নিষেধও শুনিল না কাহাকে সঙ্গেও লইল না। এদিকে গোপীনাথও সদলবলে নৌকাবিহারে কত দিনের জন্য কোথায় চলিয়া গিয়াছে কেহ জানে না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

গান্ধর্ব্ব থিয়েটারে গোপীনাথ প্রায় প্রত্যেক অভিনয়েই উপস্থিত থাকিত। সেখানে মনোরমানাটকে লবঙ্গ মনোরমা সাজিত এবং গোপীনাথ সদলে সম্মুখের সারে বসিয়া তাহাকে উচ্চৈঃস্বরে বাহবা দিত এবং ষ্টেজের উপর তোড়া ছুঁড়িয়া ফেলিত। মাঝে মাঝে এক এক দিন গোলমাল করিয়া দর্শকদের অত্যন্ত বিরক্তিভাজন হইত। তথাপি রঙ্গভূমির অধ্যক্ষগণ তাহাকে কখন নিষেধ করিতে সাহস করে নাই।

অবশেষে একদিন গোপীনাথ কিঞ্চিৎ মত্তাবস্থায় গ্রীন্‌রুমের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভারি গোল বাধাইয়া দিল। কি এক সামান্য কাল্পনিক কারণে সে আপনাকে অপমানিত জ্ঞান করিয়া কোন নটীকে গুরুতর প্রহার করিল—তাহার চীৎকারে, এবং গোপীনাথের গালিবর্ষণে সমস্ত নাট্যশালা চকিত হইয়া উঠিল। সেদিন

অধ্যক্ষগণ আর সহ্য করিতে না পারিয়া গোপীনাথকে পুলিসের সাহায্যে বাহির করিয়া দেয়।

গোপীনাথ এই অপমানের প্রতিশোধ লইতে কৃতনিশ্চয় হইল। থিয়েটারওয়ালারা পূজার একমাস পূর্ব্ব হইতে নূতন নাটক মনোরমার অভিনয় খুব আড়ম্বরসহকারে ঘোষণা করিয়াছে। বিজ্ঞাপনের দ্বারা কলিকাতা সহরটাকে কাগজে মুড়িয়া ফেলিয়াছে;—রাজধানীকে যেন সেই বিখ্যাত গ্রন্থকারের নামাঙ্কিত নামাবলী পরাইয়া দিয়াছে।

এমন সময় গোপীনাথ তাহাদের প্রধান অভিনেত্রী লবঙ্গকে লইয়া বোটে চড়িয়া কোথায় অন্তর্দ্ধান হইল তাহার আর সন্ধান পাওয়া গেল না।

থিয়েটারওয়ালারা হঠাৎ অকূলপাথারে পড়িয়া গেল। কিছু দিন লবঙ্গের জন্য অপেক্ষা করিয়া অবশেষে এক নূতন অভিনেত্রীকে মনোরমার অংশ অভ্যাস করাইয়া লইল—তাহাতে তাহাদের অভিনয়ের সময় পিছাইয়া গেল।

কিন্তু বিশেষ ক্ষতি হইল না। অভিনয় স্থলে দর্শক আর ধরে না। শত শত লোক দ্বার হইতে ফিরিয়া যায়। কাগজেও প্রশংসার সীমা নাই।

সে প্রশংসা দূরদেশে গোপীনাথের কানে গেল। সে আর থাকিতে পারিল না। বিদ্বেষে এবং কৌতূহলে পূর্ণ হইয়া সে অভিনয় দেখিতে আসিল।

প্রথম পট উৎক্ষেপে অভিনয়ের আরম্ভ ভাগে মনোরমা দীনহীন বেশে দাসীর মত তাহার শ্বশুর বাড়িতে থাকে—প্রচ্ছন্ন বিনম্র সঙ্কুচিতভাবে সে আপনার কাজ কর্ম্ম করে—তাহার মুখে কথা নাই, এবং তাহার মুখ ভাল করিয়া দেখাই যায় না।

অভিনয়ের শেষাংশে মনোরমাকে পিতৃগৃহে পাঠাইয়া তাহার স্বামী অর্থ লোভে কোন এক লক্ষপতির একমাত্র কন্যাকে বিবাহ করিতে উদ্যত হইয়াছে। বিবাহের পর বাসরঘরে যখন স্বামী নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল তখন দেখিতে পাইল—এও সেই মনোরমা,—কেবল সেই দাসীবেশ নাই—আজ সে রাজকন্যা সাজিয়াছে—তাহার নিরুপম সৌন্দর্য্য, আভরণে ঐশ্বর্য্যে মণ্ডিত হইয়া দশদিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। শিশুকালে মনোরমা তাহার ধনী পিতৃগৃহ হইতে অপহৃত হইয়া দরিদ্রের গৃহে পালিত হইয়াছে। বহুকাল পরে সম্প্রতি তাহার পিতা সেই সন্ধান পাইয়া কন্যাকে ঘরে আনাইয়া তাহার স্বামীর সহিত পুনরায় নূতন সমারোহে বিবাহ দিয়াছে।

তাহার পরে বাসর ঘরে মানভঞ্জনের পালা আরম্ভ হইল।

কিন্তু ইতিমধ্যে দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে ভারি এক গোলমাল বাধিয়া উঠিল। মনোরমা যতক্ষণ মলিন দাসীবেশে ঘোমটা টানিয়া ছিল ততক্ষণ গোপীনাথ নিস্তব্ধ হইয়া দেখিতেছিল। কিন্তু যখন সে আভরণে ঝলমল করিয়া, রক্তাম্বর পরিয়া, মাথার ঘোমটা ঘুচাইয়া, রূপের তরঙ্গ তুলিয়া বাসর ঘরে দাঁড়াইল এবং এক অনির্ব্বচনীয় গর্ব্বে গৌরবে গ্রীবা বঙ্কিম করিয়া সমস্ত দর্শকমণ্ডলীর প্রতি এবং বিশেষ করিয়া সম্মুখবর্ত্তী গোপীনাথের প্রতি চকিত বিদ্যুতের ন্যায় অবজ্ঞাবজ্রপূর্ণ তীক্ষ্ণকটাক্ষ নিক্ষেপ করিল—যখন সমস্ত দর্শকমণ্ডলীর চিত্ত উদ্বেলিত হইয়া প্রশংসায় করতালিতে নাট্যস্থলী সুদীর্ঘকাল কম্পান্বিত করিয়া তুলিতে লাগিল—তখন গোপীনাথ সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া গিরিবালা গিরিবালা করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। ছুটিয়া ষ্টেজের উপর লাফ দিয়া উঠিবার চেষ্টা করিল—বাদকগণ তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। এই অকস্মাৎ

রসভঙ্গে মর্ম্মান্তিক ক্রুদ্ধ হইয়া দর্শকগণ, ইংরাজিতে বাঙ্গলায়, দূর করে দাও, বের করে দাও, বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল।

গোপীনাথ পাগলের মত ভগ্নকণ্ঠে চীৎকার করিতে লাগিল, আমি ওকে খুন করব, ওকে খুন করব!

পুলিস আসিয়া গোপীনাথকে ধরিয়া টানিয়া বাহির করিয়া লইয়া গেল। সমস্ত কলিকাতা সহরের দর্শক দুই চক্ষু ভরিয়া গিরিবালার অভিনয় দেখিতে লাগিল—কেবল গোপীনাথ সেখানে স্থান পাইল না।

লোরিকের গান।

সেবার গয়া জেলায় প্রবাস কালে আমরা বিখ্যাত পণ্ডিত গৃয়ারসন্ সাহেব মহোদয়কে "লোরিকের গান" গুলি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন—"It will be a most useful contribution to the study of folklore." সে প্রায় দশ বৎসরের কথা। যতদূর জানা গিয়াছে, গানগুলি এখনও প্রকাশিত হয় নাই।

দুর্ভাগ্যবশতঃ তখন আমি গানগুলির নকল রাখি নাই। সংগ্রহ বৃহৎ পুঁথিতে পরিণত হওয়ায় সে চেষ্টায় বিরত হইয়াছিলাম। গৃয়ারসনের অনুরোধ ছিল, গানগুলি সচরাচর যে ভাবে মাঠে ঘাটে গীত হইয়া থাকে, তাহাই অবিকল যেন সংগৃহীত হয়। গায়ক গোয়ালারা নিজেদের চলিত ভাষায় যে "দেল্‌থেল্‌," "থেল্‌কেন" প্রভৃতি বাক্য ব্যবহার করে, সংগ্রহে সুতরাং তাহাই স্থান পাইয়াছিল। এই বেহারী আহীর গোপদের নিকট

হইতে যেরূপে "লোরিক মল্‌কা সাত খণ্ড" গান আদায় করি, তার একটু বৃত্তান্ত পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধিৎসু বন্ধুগণের কাযে আসিতে পারে। শ্যামল শৈলপ্রাচীরতলে দূরবিস্তৃত প্রান্তর, ছোট্‌কি বউড়ি ও মাঝোলি নামে ক্ষুদ্র আভীরপল্লীযুগল তাহার এক প্রান্তে পড়িয়া আছে। পাহাড় হইতে হরিণের দল প্রভাতে আসিয়া অনন্যমনে চরিতেছে, কচিৎ সচকিত হরিণযূথ বিদ্যুৎবেগে ছুটিয়া পলাইতেছে, গ্রাম দুখানির কথা মনে পড়িলে এই দৃশ্য আমার চক্ষের সমক্ষে ভাসিয়া উঠে। মনে পড়িতেছে একদিন আমায় হরিণের দৌড় দেখাইবার জন্য এক চারি বৎসরের গোপশিশু তাহার পিতার সঙ্গে কেমন ছুটিয়া গিয়াছিল। ক্ষুদ্র নগ্ন দেহ-খানি লইয়া অবলীলাক্রমে সে হরিণের পালের পশ্চাতে ছুটিয়া চলিল এবং যতক্ষণ তাহারা পাহাড়ে না উঠিল, ততক্ষণ সমানে সেই পলায়নপর মৃগযূথের অনুগমন করিল।

সেই আভীরপল্লী দুখানি লোরিকের গানের জন্য বিখ্যাত। সন্ধ্যার পর মহুয়া ফলের তৈলরচিত মশাল জ্বালাইয়া গায়কদের একত্রিত করিতে হইত। তাহারা গাহিয়া চলিয়াছে, ও দিকে "পাটোয়ারি"রা অবিশ্রান্ত লিখিয়া লইতেছে। এক প্রহরের কমে এক "খণ্ড" গান গাওয়া শেষ হয় না। সাত খণ্ড শেষ করিতে এক সপ্তাহের উপর লাগিয়াছিল। শত শত বৎসর ধরিয়া সহস্র সহস্র আহীর গোপের সন্তান সন্ততি এই লোরিক গান গাহিয়া আসিয়াছে, সম্ভবতঃ এমন ভাগ্যবিপর্য্যয় ইহার আর কখন হয় নাই। এবং হিসাবে কুশাগ্রবুদ্ধি কায়স্থ সন্তান পাটো-য়ারিজীরাও অনুমান করি এমন কাব্যরসের বিষম অগ্নিপরীক্ষায় আর কখন পড়েন নাই।

লোরিকের গানের গল্পাংশ এইরূপ। লোরিক মল গৌড়ে জন্ম-

২

গ্রহণ করে। তার বাপের নাম বুড়্ বাঁইয়া, মার নাম বুড়্ খুলেন। চানায়ান্ গৌড় দেশের রাজা মাহারার কন্যা। প্রথমতঃ সেওধারী আহীরের সঙ্গে তাহার বিবাহ হয়। সেওধারী স্ত্রীকে দেখিতে পারিত না। চানায়ান পরমাসুন্দরী ছিল, কিন্তু "পার্ব্বতী জীউর" শাপে তাহাদের বিবাহ সুখের হইল না। তাহার ফলে নবদম্পতির চির-বিচ্ছেদ ঘটিল। চানায়ান পিতৃগৃহে ফিরিয়া আসিলে লোরিক মলের সঙ্গে তাহার প্রণয় জন্মিল। উত্তরে হর্দি নগরে গেল। লোরিক হরদি রাজার সরকারে পালোয়ান নিযুক্ত হইল। যে তাহার সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, সেই আহত হইয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। দেখিয়া শুনিয়া রাজা সশঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। অথচ লোরিককে ঘাঁটাইতে সাহস হয় না। বরং একদিন বলিলেন, তুমি অত বড় বীর, এ রাজ্য তোমারই প্রাপ্য। আমি তোমার হাতে রাজ্য সমর্পণ করিয়া বন বাস করিব। ভিতরে ভিতরে ষড়যন্ত্র করিলেন, তাঁহার ভাগিনেয় রাজা হারোয়ার কাছে পাঠাইয়া লোরিকের সংহার সাধন করিবেন। হারোয়া নেওরাপুরের রাজা এবং খুব একজন শূরবীর। মাতুলের চিঠি লইয়া লোরিক ভাগিনেয়ের কাছে গেল। উভয়ের মধ্যে কলহ বাধিয়া গেল। হারোয়া লোরিক হস্তে নিহত হইলেন। মৃত রাজার মাথা কাটিয়া লইয়া লোরিক হর্দি নগরে ফিরিয়া গেল। দেখিয়া হরদির রাজা ভয়ে লোরিকমলকে রাজ্য ছাড়িয়া দিলেন। এখান হইতে লোরিক চানায়ন সঙ্গে ঠক্পুর নামক স্থানে গেল। সেখানে রাজা জাতিতে দোসাদ্ এবং রাজা প্রজা সকলেই ঠক্ জুয়াচোর। তাহারা পাশক্রীড়ায় লোরিককে হারাইয়া প্রায় সর্ব্বস্বান্ত করিল, এমন কি চানায়নকেও জিতিয়া লইল। বাকী রহিল কেবল তিনটী সোণার পেটারা এবং চানায়নের পদাঙ্গুষ্ঠের অলঙ্কার। বিজয়ী

দোসাদ রাজা পাল্কী বেহারা লোকজন পাঠাইয়া সুন্দরী চানায়নকে প্রাসাদে লইয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। চানায়ন রাজাকে বলিল এখনও আমার তিন সোণার পেটারা, পায়ের ঘুমুর বাকী। আমার স্বামী বীর পুরুষ যুদ্ধ করিতে জানেন, পাশা খেলার কি বোঝেন? ভাল, খেলায় আমায় হারাও দেখি! তা হলে তোমার ঘরে যাইব।" চানায়ানের সঙ্গে খেলায় রাজা ও তাঁহার দলের হার হইল এবং চানায়ন সব ফিরিয়া পাইল। তখন লোরিক খড়্গ হস্তে লইয়া রাজার সমস্ত সৈন্য সামন্ত মারিয়া ফেলিল এবং রাজাকে. বাঁধিয়া হর্দিতে পাঠাইয়া দিল। লোরিক তার পর ঠক্‌পুরে একটী রাজ্য স্থাপন করিয়া কৈলরপুরের দিকে গেল। সেখানকার রাজা করিঙ্গা বড় বীর। লোরিক রাজার এক উদ্যানে বাসা লইল। হাওয়া খাইতে আসিয়া রাজা এক দিন চানায়নকে দেখিলেন এবং তাহার রূপে মোহিত হইলেন। তার পর চানায়নের জন্য তাঁর সঙ্গে লোরিকের লড়াই বাধিল। লোরিক হারিয়া রাজার কাছে বন্দী হইল। কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাজার অনুচরেরা তাহার কপালে ও দেহের নানাস্থানে লোহার কাঁটা ঠুকিয়া দিল। কিন্তু দুর্গা সহায় ছিলেন, চানায়ানের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া স্বয়ং লোরিকমলকে কারামুক্ত করিয়া দিলেন। রাজার সঙ্গে লোরিকের সাত দিন সাত রাত্রি অবিশ্রান্ত যুদ্ধ হইল। করিঙ্গার রাজাকে বধ করিয়া লোরিক সেখানে এক বৎসর কাল রাজত্ব করিল। এক দিন চানায়ন স্বামীকে বলিল—"তোমার প্রসাদে অনেক দেশ দেখিলাম। ত্রিহুত একবার দেখাও।" সেখানে গিয়া দেশের অধিপতি হিউনি নবাবের সঙ্গে লোরিক যুদ্ধ করিল। এবং হারিয়া গিয়া লোহার কুঠরিতে আবদ্ধ হইল। নিরুপায় হইয়া চানায়ান দেবর সওয়াকে চিঠি লিখিল। সওয়া ভারি বীর—

লোরিকের চেয়েও অধিক বল ধরিত। সে আসিয়া নবাবকে পরাজিত এবং ভাইকে উদ্ধার করিল। তখনকার দিনে কেবল ত্রিহুতেই তামাকের চাষ হইত। রাজভাণ্ডার তামাকে পরিপূর্ণ। সওয়া সে সব লুটিয়া লইল এবং ভাই ও ভ্রাতৃজায়াকে হরদিতে ফিরাইয়া আনিল। কিছু দিন গেলে লৌরিক ভাবিল যে সব মুল্লুকইত আমি দখল করিয়াছি, কেবল অতিরছা মুল্লুক এখনও বাকী। দুর্গাদেবী বলিলেন, "অতিরছা মুল্লুক আমি আমার বহিনকে দান করিয়াছি, সে দেশে গেলে আমি তোমার সহায় হইব না। দম্ভে লোরিক বলিল—"তুমি সহায় হও আর নাই হও, আমি সে দেশ জিতিয়া লইব।" লোরিক মল নিজের ঘোড়-কাটর নামক অশ্বে আরোহণ করিয়া চানায়ান ও পুত্র চন্দ্রাজিৎ সঙ্গে অতিরছা অভিমুখে অগ্রসর হইল। কিন্তু সে দেশে বিস্তর বীর, পুরীতে হেলিতে পারিল না। যুদ্ধে চানায়ান চন্দ্রজিৎ ও ঘোড়া মরিল। স্বয়ং লোরিক ভয়ে কীটের রূপ ধরিয়া গাছে লুকাইয়া তবে বাঁচিল। লোরিকের এক বিবাহিতা স্ত্রী ছিল—নাম মাজর। সে স্বপ্নে স্বামীর বিপদ বুঝিতে পারিল। এই স্বপ্ন দুর্গা দিয়াছিলেন। মাজর আগে ইন্দ্রাসনের পরী ছিল। সে ভগবানের কাছে কাঁদিল—"আপনি আমায় ধরিত্রীতে পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু আমার সিন্দুর হরণ করিলে আমি বাঁচি কি রূপে ?" বিধাতার দয়া হইল। মাজরকে নিজের সবুজ রংয়ের ঘোড়া দিয়া বলিলেন, এই নাও অমৃত বারি। ইহা ছিটাইয়া সকলকে গিয়া বাঁচাও। আমার বরে লোরিক মল "আড়াই ঘড়ির" জন্য অতিরছা দেশ দখল করিবে।" তাহাই হইল। "হরিয়র" ঘোড়ায় চড়িয়া লোরিকমল আড়াই ঘড়ির জন্য অতিরছা দখল করিল এবং পরে স্ত্রী পুত্র সঙ্গে গৃহে ফিরিয়া আসিল।

পাঁচ খণ্ড গান ইহাতেই সমাপ্ত। বাকী দুই খণ্ডের গল্প লেখকের জানা নাই। সম্ভবতঃ তাহাতে লোরিকমলের গয়া-বিজয় প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত আভীরপল্লীদ্বয়ের প্রায় ষোল মাইল পূর্ব্ব দক্ষিণে "দুবৌর" নামে গবর্ণমেণ্টের এক খাস মহাল আছে। এখানে দুর্ব্বাসা মুনির আশ্রম ছিল। স্থানটী ক্ষুদ্র শ্যামল শৈলে বেষ্টিত এবং এক ধনার্য্যা নদী সাত স্থানে ইহাকে বেষ্টন করিয়া ভীম অজগরবৎ বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। দক্ষিণের শৈল-শীর্ষে দুর্ব্বাসার আশ্রম-ভূমি এখনও এদেশের তীর্থস্থান—অদূরে শৈলান্তরে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির আশ্রম। কথিত আছে, সে কালে এই স্থান হইতে রাজগৃহ বা রাজগির পর্য্যন্ত—প্রায় ত্রিশক্রোশের ব্যবধান—এক বিস্তৃত সুড়ঙ্গ পথ ছিল। এই "দুবৌর মাহালের" প্রবেশ পথে বড়কি বউড়ি নামে গ্রাম। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৈলের কাছে লইয়া গিয়া আহীর গোপেরা লোরিকমলের কয়টী স্মৃতিচিহ্ন দেখাইয়া দেয়। একটা মাঝারি রকমের প্রস্তর খাত দেখাইয়া বলে, এই খাতে লোরিক সিদ্ধি ঘুঁটিয়া খাইত। পাহাড়ের গায়ে একটা পরিষ্কার কর্ত্তনের দাগ দেখাইয়া গল্প করে ইহা লোরিকের অস্ত্রাঘাত নৈপুণ্যের পরিচায়ক। গৃয়ারসন্ সাহেব এক দিন সস্ত্রীক এই স্মৃতিচিহ্নগুলি দেখিতে দেখিতে প্রজাদের কাছে লোরিকের গল্প শুনিতেছিলেন, আমি সঙ্গে ছিলাম। অবসর পাইয়া দুইজন প্রজা একটা ব্যয়সাপেক্ষ বাঁধ নির্ম্মাণের প্রস্তাব করিল। সাহেব হাসিয়া বলিলেন—"সরকার বাহাদুর এই পাহাড়ের মত!" প্রজারা সমস্বরে বলিল "খোদাবন্দ, আমরা ত সেই পাহাড়কেই দেবতা বলিয়া জানি!"

এখন লোরিকের গানের কথা। সপ্ত খণ্ড গান বাঙ্গালায় অনুবাদিত হইলে আর একখানা রামায়ণ হইতে পারে বটে, কিন্তু মজুরি

পোষায় না। অনেক স্থান রক্ষার অযোগ্য। আমরা মাঝে মাঝে গানের নমুনা দিতে চেষ্টা করিব।

লোরিকের সঙ্গে চানায়ানের পরিচয় হইয়াছে। চানায়ান রাজার বেটী হইলেও গাই চরাইতে যায়—কেন না সে গোপকন্যা, গোচারণের মাঠে "সখী সব মেলি" চানায়ান কি ভাবে কাটাইত, গাভী ও "বাছারু"দের তৃণ ভোজনের অবসরে কেমন ঘুটিং (গান গোটী) খেলিত, আজ্ কেবল তাহার কথাই বলিব——

গাই চরাওয়ে হাম সখি সব গেঁলু।
বধিয়ামে হেরি হরি হুব॥
চল সখি হাম্ আগু পিছু যায়ব।
চরে লাগল মোরে ধেনু ধেনু গইয়া॥
চরে দেহ সখি ধেনু ধেনু গইয়া।
জাহ গঙ্গেটী হাম্‌রা গান গোটী খেলি॥
গইয়া যে চরে হরি হরি হুবিয়া।
বাছারু চরে চারি ঘাট॥
গইয়া না ছোড়ে সখি হরি হরি হুবিয়া।
খেলাতে খেলাতে সখি ভেলা কুবেরা॥
রোষ করে সখি শুনি মোর বাতিয়া।
ভুখ্‌লাগে সখি হের ঘর্‌কে বাটিয়া॥
উঠ সখি সব খেল বিসর।
হের ঘরকো বাটিয়া॥
কই সখি ঢুঁরে ধেনু ধেনু বাছারু।
কই সখি লেলে হাতোয়ামে সেলি॥
আগু আগু চলে ধেনু মোর গইয়া।
সে কর পিছু চলে বাছারু॥

চল সখি সব বায়ব ঘরে।
চলত চলত মোরে সাঁঝ ভইল॥

মারাঠী ও বাঙ্গলা।

আজ কাল ভারতবর্ষের এক প্রদেশের লোক অন্য প্রদেশের ভাষা শিক্ষা ও তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন—ইহা একটী শুভ চিহ্ন বলিতে হইবে। ভারতবাসীদিগের মধ্যে একতা স্থাপিত হইবার পক্ষে যতগুলি বাধা দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে ভাষার বাধাও বড় একটী কম নহে। সচরাচর, ভারতবর্ষকে একটী দেশ বলিয়া ধরা হয়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহাকে একটী মহাদেশ অথবা বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। য়ুরোপ-খণ্ডের মধ্যে যেরূপ ইংরাজী, ফরাসী, জর্ম্মণ প্রভৃতি ভাষা, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে সেইরূপ বাঙ্গলা, মারাঠী, গুজরাটী প্রভৃতি বিবিধ ভাষা প্রচলিত। আজকাল, রেল-পথের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দূরত্বের বাধা ক্রমশই অপসারিত হইতেছে এবং আমাদিগের রাষ্ট্রীয়-সভার অধিবেশন উপলক্ষ্যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশবাসী-দিগের পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ও আত্মীয়তা ক্রমশই বৃদ্ধি হই-তেছে। কিন্তু উহাদিগের মধ্যে ভাষার বন্ধন ও একতা না থাকা প্রযুক্ত তেমন আশানুরূপ ফল লাভ হইতেছে না। ইংরাজী ভাষায় একরূপ কাজ চলিয়া যাইতেছে বটে, কিন্তু এই নিতান্ত পরকীয় ভাষার অবলম্বনে আমরা পরস্পরের হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে পারি না। ভাষা-সম্বন্ধে আমাদের নিকট একজন

ইংরাজও যেরূপ, একজন মহারাষ্ট্রীয় হিন্দুও সেইরূপ। উভয়েরই সহিত ইংরাজী ভাষায় আমাদিগের কথাবার্তা চালাইতে হয়। ইহা কম অসুবিধার কথা নহে। এই ভাষার বাধা একেবারে অপসারিত হইবারও কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। গণনা করিয়া দেখিলে, আমাদিগের প্রাদেশিক ভাষার সংখ্যা, বোধ করি, দ্বাদশেরও অধিক হইবে। এক বোম্বাই অঞ্চলের মধ্যেই তো কতকগুলি ভাষা। এই সমস্ত ভাষা আয়ত্ত করিতে হইলে আমাদের প্রত্যেকের এক একটী "সার উইলিয়ম জোন্‌স্" না হইলে চলে না। তবে এই পর্য্যন্ত করা যাইতে পারে—যাহার যতটুকু সাধ্য, আপনার ভাষা ছাড়া, আরও দুই একটী প্রাদেশিক ভাষা শিখিবার চেষ্টা করা;—তাহা হইলেও কতকটা কাজ হয়। বিশেষতঃ, যে উ ভাষাগুলির মধ্যে নৈকট্য সম্বন্ধ বর্ত্তমান—প্রাকৃত হইতে যাহাদিগের উৎপত্তি—সেই সকল ভাষার অনুশীলনে, আর কিছু না হউক, অন্ততঃ নিজ নিজ ভাষার ব্যুৎপত্তি বিষয়ে অধিকতর জ্ঞান লাভ হইতে পারে। মারাঠী ও বাঙ্গলার মধ্যে এইরূপ নিকট-সম্বন্ধ বর্ত্তমান—উভয়ই এক জননী হইতে প্রসূত। সুতরাং মারাঠী ভাষার আলোচনায়, বাঙ্গলা ভাষারও কতকটা উপকার হইতে পারে। গত পৌষ মাসের "সাধনা"য় "মহারাষ্ট্রীয় ভাষা" এই নামে যে একটী সুলিখিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তাহাতে লেখক মহাশয় মারাঠী ভাষার উৎপত্তি এবং বাঙ্গলা ও মারাঠী শব্দের ঐক্যানৈক্য সম্বন্ধে বিশদরূপে বিবৃত করিয়াছেন। তাহারই অনুবৃত্তি স্বরূপ, দুই চারিটী কথা বলা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

মারাঠী ও বাঙ্গলা ভাষার গঠনে দুই একটী মূলগত প্রভেদ লক্ষিত হয়। মারাঠী ভাষায় তিন লিঙ্গ;—পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ। এই লিঙ্গভেদ প্রকরণ সকল সময়ে স্বাভাবিক নিয়মানু-

সারে নিষ্পন্ন হয় না। "দউত" (দোয়াৎ) শব্দ, "বাট" (পথ) শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ; "বাস" (গন্ধ) শব্দ পুংলিঙ্গ; "মাঞ্জর" (মার্জ্জার-বিড়াল) শব্দ ক্লীবলিঙ্গ; "কুত্রা" (কুকুর) শব্দ পুংলিঙ্গ; "মনুষ্য" শব্দ কখনও পুংলিঙ্গ, কখনও ক্লীবলিঙ্গ। "বাট" শব্দ কেন স্ত্রীলিঙ্গ, এবং "মাঞ্জর" শব্দ কেন ক্লীবলিঙ্গ হইল, ইহার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নির্দ্দেশ করা যায় না। চিরপ্রচলিত ব্যবহারই ইহার একমাত্র কারণ। নাম ও সর্ব্বনামের লিঙ্গ অনুসারে, স্থল-বিশেষে, ক্রিয়াপদের বিভক্তিতে রূপান্তর উপস্থিত হয়। বক্তা স্ত্রীলোক হইলে, "মী করিত্যে" (আমি করি) এবং পুরুষ হইলে "মী করিতো" এইরূপ প্রয়োগ হয়। এ গেল, কর্ত্তরী প্রয়োগ। আবার কর্ম্মণী প্রয়োগের সময়, কর্ত্তা যে লিঙ্গেরই হউক না, তাহার লিঙ্গ অনুসারে ক্রিয়াপদ পরিবর্ত্তিত না হইয়া, কর্ম্মপদের লিঙ্গ অনুসারে ক্রিয়াপদের রূপান্তর হয়। যথা, "মী কাম কেলে" (আমি কাজ করেছি—অথবা আমরা কর্ত্তৃক কাজ কৃত হয়েছে) "মী বাট পাহিলী" (আমি পথ দেখেছি—অথবা আমা কর্ত্তৃক পথ দেখা হইয়াছে) এই দুই বাক্যের মধ্যে "কাম" ক্লীবলিঙ্গ বলিয়া "কেলে" এই ক্রিয়াপদ একারান্ত হইল এবং "বাট" শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ বলিয়া "পাহিলী" এই ক্রিয়াপদ ঈকারান্ত হইল। ইহা কতকটা হিন্দী ভাষার অনুরূপ। আর এক প্রভেদ; বাঙ্গলায়, বহুবচনে ক্রিয়ার বিভক্তিতে কোন রূপান্তর হয় না, কিন্তু মারাঠী ভাষায় তাহা হইয়া থাকে। যথা,—"সে করে," "তাহারা করে";—এই দুই বাক্যগত ক্রিয়াপদের রূপ একই; কিন্তু মারাঠী ভাষায় এই স্থলে "তো করিতো", "তে করিতাত" এইরূপ হইয়া থাকে। আরও কিছু কিছু প্রভেদ আছে। তাহা এখানে বলা অনাবশ্যক।

এই সকল কারণে,—বিশেষতঃ লিঙ্গভেদের কোন নিয়ম না

থাকায়, কোন বৈদেশিকের পক্ষে মারাঠী ভাষায় শুদ্ধরূপে কথা কহা বড়ই কঠিন। পদে পদে তাঁহার ভ্রম হইবার সম্ভাবনা। বাঙ্গলায় লিঙ্গভেদের কোন কড়াক্কড় নিয়ম নাই—এক প্রকার ভালই হইয়াছে বলিতে হইবে। আমরা ভাষার সৌন্দর্য্য ও উপযোগিতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, স্থলবিশেষে কখন বা "সুন্দরী ললনা" কখন বা "সুন্দর মেয়েটী" এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতে পারি। এবিষয়ে মারাঠী ভাষায় আবার একটু স্বতন্ত্র নিয়ম। যে বিশেষ্য শব্দগুলি খাস মারাঠি, বিশেষ্যের লিঙ্গ অনুসারে সেই সকল বিশেষণ পদের লিঙ্গভেদ হইয়া থাকে—কিন্তু যে সকল বিশেষণ পদ খাস সংস্কৃত তাহার কোন পরিবর্ত্তন হয় না। মারাঠী "চাঙ্গলা" (ভাল-সুন্দর) শব্দ যখন স্ত্রী সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়, তখন "চাঙ্গলী" এইরূপ প্রয়োগ হয়—কিন্তু "সুন্দরী" এই শব্দ, কোন স্ত্রীলিঙ্গবাচক বিশেষ্য পদের পূর্ব্বে বসে না। "চাঙ্গলী বায়কো" (ভাল স্ত্রী) ও "সুন্দর স্ত্রী" এইরূপ প্রয়োগ হয়—কিন্তু "সুন্দরী স্ত্রী" এইরূপ প্রয়োগ কখনই হয় না। বাঙ্গলায় এই বিষয়ে আমাদের বিলক্ষণ স্বাধীনতা আছে। আমার বোধ হয়, কোন ভাষার মধ্যে কৃত্রিম নিয়মের যতই বাঁধাবাঁধি ও আঁটাআঁটি, ভাবস্ফূর্ত্তির পক্ষে ততই ব্যাঘাত ঘটে। কিন্তু মারাঠী ভাষায় এরূপ কৃত্রিম বাধাসত্তেও, মারাঠী কবি মোরপন্ত কর্ত্তৃক ১০৮ প্রকারের পদ্য রামায়ণ রচিত হইয়াছে। ইহা সামান্য বাহাদুরী নহে। মোরোপন্তরচিত একটী রামায়ণের নাম "পরন্তু রামায়ণ"—অর্থাৎ, ইহার প্রত্যেক শ্লোকে "পরন্তু" এই শব্দটী কোন প্রকারে ঘটানো হইয়াছে। এই শব্দ-মল্ল কবিদিগের রচনায় ভাব অপেক্ষা কথার কৌশলই অধিক। ফরাসী ভাষার মধ্যে এইরূপ লিঙ্গভেদের কৃত্রিমতা লক্ষিত হয় কতকটা এই কারণে

হয় তো ইংরাজী কবিতা ফরাসী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে। কবিতাতে কতকটা বন্ধন আবশ্যক বটে, কিন্তু অতিবন্ধনও দোষাবহ। এই বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের জন্যই অমিত্রাক্ষর ছন্দের সৃষ্টি হইয়াছে। সে যাহোক্, ভাষায় লিঙ্গভেদ রাখা যে একেবারেই দোষের; আমি এ কথা বলি না। তবে, মারাঠী ও ফরাসী ভাষার ন্যায় অতটা কৃত্রিম বাড়াবাড়ি ভাল নহে। লিঙ্গ ভেদে ভাষার কতকটা সুবিধাও আছে। সর্ব্বনামের মধ্যে লিঙ্গভেদ থাকায়, অনেক সময়, ভাষার অস্পষ্টতা নিবারণ হয় এবং বারম্বার নামের পুনরুক্তি করিতে হয় না। বাঙ্গলা ভাষায় এইরূপ লিঙ্গভেদ না থাকায়, সর্ব্বনাম ব্যবহার না করিয়া আসল নামই, অনেক সময়, পুনরাবৃত্তি করিতে বাধ্য হই। ইহাতে ভাষার জোরও কতকটা কমিয়া যায়।

বাঙ্গলা ভাষা অপেক্ষা, মারাঠী ভাষায় নাম ও সর্ব্বনামের বহুবচন অতি শোভন ও সহজ ভাবে নিষ্পন্ন হয়। বাঙ্গলায়, "তোমার" এই পদের বহু বচনে "তোমাদের" বলিতে হইবে। সেই স্থলে মারাঠীতে "তুম্‌চা"-র বহু বচনে "তুম্‌চে" এইরূপ প্রয়োগ হয়। তা ছাড়া, বাঙ্গলা ভাষায় বস্তুবাচক নাম কিম্বা সর্ব্বনামের বহুবচন নিষ্পন্ন করিতে হইলে "সকল," "সমূহ" প্রভৃতি কথা জুড়িয়া দিতে হয়। "হেঁ"র বহু বচনে যেখানে "হীঁ" বলিলেই চলে, বাঙ্গলায় সেই স্থলে "এই"—র বহু বচনে "এই-সকল" বলিতে হয়। ফল কথা, ব্যাকরণের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে, বাঙ্গলা অপেক্ষা মারাঠী ভাষার গঠন যে অধিকতর পরিপুষ্ট তাহাতে সন্দেহ নাই।

আর এক কথা, বাঙ্গলা অপেক্ষা মারাঠী জোরালো। তাহার প্রধান কারণ, বাঙ্গলা অপেক্ষা মারাঠী ভাষায় রূঢ়িক ক্রিয়াপদ

অধিক আছে। বাঙ্গলা ভাষায়, বিশেষ্য ও বিশেষণ শব্দের সহিত 'কৃ' ও 'ভূ'-ধাতুনিষ্পন্ন ক্রিয়াপদ যোগ করিয়া অধিকাংশ ক্রিয়াপদ সংগঠিত। এইরূপ যৌগিক ক্রিয়াপদের প্রয়োগে ভাষার জোর কমিয়া যায়। আমাদের কবিবর মাইকেল মধুসূদন, কবিতার ভাষায় বলবিধান করিবার জন্যই অনেক রূঢ়িক ক্রিয়াপদ রচনা করিয়া স্বীয় কবিতা মধ্যে প্রয়োগ করেন। এই সকল অভিনব ক্রিয়াপদের প্রয়োগ, সেই সময়ে, অনেকেরই অসহ্য মনে হইয়াছিল। পদ্যেই যখন এইরূপ—গদ্যের তো কথাই নাই। ফল কথা, এই প্রকার প্রয়োগ অধিক পরিমাণে আমাদের ভাষায় চলে না—ইহা বাঙ্গলার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। আমরা বাঙ্গলা গদ্যে, "রুষিছে" কিম্বা "লাজিছে"—এইরূপ বাক্য, কখনই প্রয়োগ করিতে পারি না। কিন্তু মারাঠী ভাষায় এইরূপ রূঢ়িক ক্রিয়াপদের প্রচুর ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

বাঙ্গলা অপেক্ষা মারাঠী যে জোরালো, তাহা এই উভয় ভাষার উচ্চারণেই কতকটা প্রকাশ পায়। মারাঠীর উচ্চারণ অনেকটা সংস্কৃতের অনুরূপ। যদিও মারাঠী অপেক্ষা বাঙ্গলা ভাষায় সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ অধিক, তথাপি কোন মারাঠীর সম্মুখে বাঙ্গলা ভাষায় কথা কহিলে, তাহার মধ্যে যে কোন সংস্কৃত শব্দ আছে, এরূপ তাঁহার অনুভবই হয় না। আমাদের বিকৃত উচ্চারণই ইহার একমাত্র কারণ। আমাদিগের সংস্কৃতাভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ যতই দিগ্‌গজ পণ্ডিত হউন না কেন, এই উচ্চারণের দোষে তাঁহারা অন্য প্রদেশীয় লোকদিগের নিকট হাস্যাস্পদ হইয়া থাকেন। সংস্কৃত, হিন্দী, মারাঠী প্রভৃতি ভাষায় উচ্চারণের মুখ্য গতি যেরূপ খোলা আকারের দিকে, বাঙ্গলা ভাষার উচ্চারণপ্রবণতা সেইরূপ বোজা ও-কারের দিকে। আমার বোধ হয়, শারীরিক দুর্ব্ব-

লতাই ইহার মূল-কারণ। বাঙ্গালী অপেক্ষা মারাঠীদিগকে দেখিতে যেরূপ মজবুৎ, উহাদের ভাষাতেও সেইরূপ অধিক বলের পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের দেহ যেরূপ ক্ষীণ ও সুকুমার, আমাদের ভাষাও সেইরূপ।

পক্ষান্তরে 'বাঙ্গলা ভাষা মারাঠী অপেক্ষা অনেক পরিমাণে সুললিত ও পরিমার্জ্জিত। মারাঠী ভাষার জোর, যেন একটু রূঢ়তার সীমায় গিয়া উপনীত হইয়াছে। 'ড়', 'ঢ', 'ণ', এই সকল কাঠ-খোট্টা কঠিন বর্ণ সকল মারাঠী ভাষায় বারম্বার শুনিতে পাওয়া যায়। মারাঠী ভাষা প্রথম শুনিলে মনে হয় যেন উহা উড়িয়া ও হিন্দী এই দুই ভাষার সংমিশ্রণে উৎপন্ন। মারাঠী ভাষার উচ্চারণে 'ড়', 'ঢ়' প্রভৃতি অক্ষর যেরূপ ক্রমাগত আমাদের কাণে আইসে, বাঙ্গালা ভাষার উচ্চারণে সেইরূপ 'চ', 'ছ', অক্ষর মারাঠীদিগের কাণে বারম্বার উপস্থিত হয়। মারাঠী ভাষায় দুই চারিটী বর্ণের উচ্চারণেও একটু বিশেষত্ব আছে—উহা সংস্কৃতের অনুরূপ নহে। মারাঠীতে 'ল' এই অক্ষরের উচ্চারণ দুই প্রকার ;—এক, সাদাসিধা ল-য়ের মত ; আর এক, কতকটা আমাদের 'ড়'-এর মত। মারাঠীদিগের 'ড়'-এর উচ্চারণ অনেকটা 'ড'-ঘেঁসিয়া। উহাদের মধ্যে চ, ছ, ঝ,—এই অক্ষরগুলিরও দুই প্রকার উচ্চারণ শুনিতে পাওয়া যায়। এক উচ্চারণ, আমাদের ন্যায় ; আর এক উচ্চারণ, কতকটা আমাদের পূর্ব্ববঙ্গীয়দিগের ন্যায়। এই সকল বিভিন্ন উচ্চারণের স্বতন্ত্র লিপিচিহ্ন-পদ্ধতি আমাদের মধ্যে প্রবর্ত্তিত হওয়া নিতান্ত বাঞ্ছনীয়। বিশেষতঃ, ইংরাজী শব্দ বাঙ্গলা অক্ষরে লিখিবার সময় এই সম্বন্ধে অসুবিধা বিলক্ষণ অনুভব করা যায়। মহারাষ্ট্রীয়েরা তবু, এ বিষয়ে আমাদিগের অপেক্ষা একটু অগ্রসর। ইংরাজী স্বরবর্ণের বিভিন্ন উচ্চারণ-

প্রকাশক দুই একটী চিহ্ন তাঁহারা পুস্তকাদি ছাপাইবার সময় প্রয়োগ করিয়া থাকেন। ইটালিক্‌স্" এর স্থলে একটু বড় ও মোটা অক্ষর ব্যবহৃত হয়। ইংরাজী v অক্ষর মরাঠীতে লিখিবার সময় "হ্ব" এই যুক্তাক্ষর তাঁহারা ব্যবহার করিয়া থাকেন। "গভর্ণমেণ্ট" না লিখিয়া তাঁহারা "গহ্বর্ণমেণ্ট"লিখেন। এইরূপ লিখিলে, ইংরাজী v অক্ষরের অনেকটা কাছাকাছি শুনায়।

বাঙ্গলা ভাষায় যদি একটী ভাল অভিধান প্রস্তুত করিতে হয়—যদি প্রচলিত দেশজ শব্দগুলির ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করা আবশ্যক হয়, তবে মারাঠী প্রভৃতি প্রাকৃতের অপভ্রষ্ট ভাষাগুলির অনুশীলন করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। ইহার একটী দৃষ্টান্ত—যথা,—আমাদের 'আনাড়ি" শব্দ—এই শব্দের ব্যুৎপত্তি কি? মারাঠী ভাষাতে আড়ানী বলিয়া একটি শব্দ আছে উহার প্রায় একই অর্থ। হইতে পারে "আড়ানী" বলিয়া একটী শব্দ উল্টাইয়া "আনাড়ি" শব্দে পরিণত হইয়াছে। যাহা সরল ও সহজ নহে, "আড়" শব্দে তাহাই বুঝায়। যে অশোভন ও আড়ষ্টভাবে কাজ করে, তাহাকেই আনাড়ি বলা যায়। অনুসন্ধান করিলে, এরূপ আরও দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইতে পারে।

মহারাষ্ট্রীয় ভাষার অনুশীলনে আর একটী উপকার আছে। আজকাল আমরা ইংরাজী বিদ্যা ও সাহিত্যের সংশ্রবে অনেক নূতন কথা ও নূতন ভাব অর্জ্জন করিতেছি। এই সকল ভাব আমাদের দেশ-ভাষায় প্রকাশ করা আবশ্যক হওয়ায়,কি মারহাট্ট, কি বাঙ্গালী আমরা উভয়েই এই সকল কথা ও ভাবের অনুরূপ শব্দ রচনা ও সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমাদের উভয়েরই সাধারণ শব্দ-ভাণ্ডার—সংস্কৃত ভাষা। অতএব আমাদের উভয়ের রচিত ও সংগৃহীত প্রতিশব্দগুলি যদি পরস্পর মিলাইয়া দেখি, তাহা হইলে

বুঝিতে পারিব সেগুলি যথাযথ হইতেছে কি না। যদি তাহাদিগের মধ্যে অমিল দেখি, তাহা হইলে আমাদিগের মনে স্বভাবতঃই সংশয় উপস্থিত হয়, এবং তখন, কোন্ প্রতিশব্দটী ঠিক্, তাহা আর একবার আমরা বিচার করিয়া দেখিতে পারি। দৃষ্টান্ত যথা, দুটী ইংরাজী শব্দ "nerve" ও "muscle"। ইহাদের প্রতিশব্দ কি? আমরা "nerve"কে স্নায়ু বলি। মারাঠীতে "muscle"কে স্নায়ু বলে ও "nerve"কে মজ্জাতন্তু বলে। চরক প্রভৃতি পুরাতন আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে স্নায়ুর যেরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় তাহা অতি অস্পষ্ট, তাহা হইতে প্রকৃত তথ্য নির্ণয় করা সুকঠিন। ইংরাজী "sinews" শব্দের সহিত "স্নায়ু" শব্দের কতকটা সাদৃশ্য আছে। এই জন্য মনে হয়, স্নায়ু "muscle" শব্দের প্রতিশব্দ হইলেও হইতে পারে। "মহারাষ্ট্রীয় ভাষা"য় লেখক মহাশয় ইতিপূর্ব্বে মারাঠী ও বাঙ্গলা প্রতিশব্দের তুলনা করিয়া কতকগুলি দৃষ্টান্ত দিয়াছিলেন। আমিও আর কতকগুলি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

রাষ্ট্রীয় সভা (National Congress) রাষ্ট্রীয় স্তোত্র (National Anthem) সংস্থা (Institution) অনুক্রম-পত্র (Programme) আবৃত্তি (Edition) পদবীদান-সমারম্ভ (Convocation) স্থানিক স্বরাজ্য (Local self-government) ব্যবস্থাপক মণ্ডলী অথবা অন্তরঙ্গ সভা (Executive committee) অধ্যক্ষ (President) উপাধ্যক্ষ (Vice president) প্রমুখ (Chairman) মন্ত্রী (Secretary) দেশ-বান্ধব (Fellow-countryman) স্বাগত-সভা (Reception committee) মৃত্যু-পত্র (Will) আরোপী (Accused) প্রেক্ষক (Visitor) সাংস্থানিক (Native states) ভূত-দয়া (Humanity.)

উপরোক্ত শব্দগুলি বাঙ্গলা প্রতিশব্দের সহিত মিলাইয়া দেখিলে, উহার মধ্যে কোন কোন শব্দ, বাঙ্গলা অপেক্ষা সুরচিত বলিয়া

মনে হয়। "জাতীয় সভা" অপেক্ষা "রাষ্ট্রীয় সভা" আখ্যাটী অধিকতর উপযুক্ত; কেননা, যে সভার অন্তর্ভূত হিন্দু, মুসলমান, পারসী প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির লোক, তাহাকে জাতীয় সভা না বলিয়া "রাষ্ট্রীয় সভা" বলাই সঙ্গত। "দেশ-বান্ধব" কথাটী মন্দ নয়। Institution শব্দের বাঙ্গলা কোন প্রতিশব্দ প্রচলিত আছে কি না বলিতে পারি না; কখন কখন, অনুষ্ঠান-শব্দ প্রয়োগ করিতে দেখিয়াছি, কিন্তু উহা ঠিক্ নহে। বরং "প্রতিষ্ঠা" কিম্বা "প্রতিষ্ঠান" এই অর্থে ব্যবহার করা যাইতে পারে। মারাঠী "সংস্থা" শব্দ কি বাঙ্গলায় গ্রহণ করা যায় না? Edition এই শব্দের মারাঠী প্রতিশব্দ "আবৃত্তি" ও বাঙ্গলা প্রতিশব্দ "সংস্করণ"; এই উভয়ের মধ্যে কোন্‌টি ঠিক্? অনুক্রম-পত্র (Programme) ইহার স্থলে "অনুক্রমণিকা" বলিলে কি চলে না? "রাষ্ট্রীয় স্তোত্র" National anthemএর সুন্দর প্রতিশব্দ।

আর কতকগুলি ইংরাজী পারিভাষিক শব্দের মারাঠী প্রতিশব্দ নিম্নে দেওয়া যাইতেছে —

উত্তর ধ্রুব (North Pole) গুরুত্ব-মধ্য (Centre of gravity) বর্গ (Class) "চতুর্থ ইয়ত্তা" (Fourth Standard) বাতাবরণ (Atmosphere) ভূশির (Cape) দ্বীপকল্প (Peninsula) দীর্ঘ-বর্ত্তুল (Ellipse) উপপদ (Article) সিদ্ধ বা অব্যুৎপন্ন শব্দ (Primitive word) সাধিত বা ব্যুৎপন্ন (Derivative word) উভয়ান্বয়ী (Conjunction) শব্দযোগী (Post-position) কেবল প্রয়োগী অথবা উদ্গারবাচী (Interjection) দর্শক সর্ব্বনাম (Demonstrative Pronoun) স্বল্প-বিরাম চিহ্ন (Comma) অর্দ্ধ-বিরাম চিহ্ন (Semicolon) অপূর্ণ-বিরাম চিহ্ন (Colon) পূর্ণ-বিরাম চিহ্ন (Full Stop) করণ-রূপ (Positive form) অকরণরূপ (Negative form)

আখ্যাতরূপ (Conjugation) উদ্গার-চিহ্ন (Sign of admiration) শক্যার্থ (Potential mood) স্বার্থ (Indicative mood) সংকেতার্থ (Conditional mood) প্রয়োজক ক্রিয়াপদ (Causal verb) পক্ষান্তর বাচক (Alternative) স্নায়ুবন্ধন (Tendon) মজ্জাতন্তু (Nerve) কর্ণিকা (Auricle) মধ্যপর্দ্দা (Diaphragm পরশু (Rib) কূর্চ্চাস্থি (Cartilage) জীবনেন্দ্রিয় শাস্ত্র (Physiology) দ্বাদশাঙ্গুলান্ত্র (Duodemum) দ্বিশির স্নায়ু (Biceps) অস্থিবন্ধন (Ligament) মনঃপ্রেরণা (Mental transmission) রক্তাভিসরণ (Circulation of blood) রক্ত পিত্ত (Corpuscle) রক্তসঙ্কলন (Congestion) রক্তদ্রব (Serum) অন্তর্মিশ্রণ (Assimilation) আর্দ্রত্বচ (Mucus membrane) দুগ্ধবাহিনী (Lactile) পরাবর্ত্তন (Reflection) বক্রীভবন (Refraction) ব্যাপ্য-ব্যাপক অনুমান অথবা ব্যাপকানুমান (Induction) ব্যাপক-ব্যাপ্য অনুমান অথবা ব্যাপ্যানুমান (Deduction) সন্ধায়ক (Copula) ত্র্যবয়ব অনুমান-বাক্য (Sylegism) ব্যাপ্যানুমান বিষয়ী ন্যায় (Deductive Logic) জাতিবর্গ (Genus) অন্তর্জাতি (Species) কাদাচিৎক (Incidental) বিধায়ক বাক্য (Positive proposition) নিষেধকবাক্য (Negative proposition) কাট কোণ (Right angle) বিশাল কোণ (Obtuse angle) লঘু কোণ (Acute angle) বায়ুভার মাপক (Barometre) উষ্ণতামাপক (Thermometre) বর্গীকরণ (Classification) সমুদায়ীকরণ (Generalization) কার্য্যানুক্রম (Process) নিরোধ (Resistance.)

উল্লিখিত পারিভাষিক শব্দের মধ্যে দুই চারিটী কথা আমরা বোধ হয় গ্রহণ করিতে পারি। ইহার মধ্যে কতকগুলি শব্দ আমাদের মধ্যেও প্রচলিত আছে। Induction ও Deduction ইহাদের প্রতিশব্দ বাঙ্গলায় আছে কি না জানি না। যদি না

থাকে, তবে আমরা "ব্যাপকানুমান" ও "ব্যাপ্যানুমান" এই দুইটী শব্দ বোধ হয় গ্রহণ করিতে পারি। বাঙ্গলা "অন্তরীপ" অপেক্ষা "ভূশির" আমার বোধ হয়, Capeএর ঠিক প্রতিশব্দ। কেননা "অন্তরীপ" অর্থে দ্বীপ বুঝাইলেও বুঝাইতে পারে। আমাদিগের "উপদ্বীপ" অপেক্ষা মারাঠী "দ্বীপকল্প" শব্দটী Peninsula-র ঠিক্ প্রতিশব্দ। কেননা, উপদ্বীপ শব্দে ক্ষুদ্র দ্বীপও বুঝাইতে পারে। বিদ্যালয়ের "ক্লাস"কে আমরা "শ্রেণী" বলিয়া থাকি, তদপেক্ষা "বর্গ" শব্দটী উপযুক্ত বলিয়া মনে হয়। বিদ্যালয়ের Standard শব্দের কোন প্রতিশব্দ বাঙ্গালায় আছে কি না জানি না। মারাঠী "ইয়ত্তা" শব্দটী কি গ্রহণ করা যাইতে পারে না? Sign of admiration-এর মারাঠী প্রতিশব্দ "উদ্‌গার-চিহ্ন"। বাঙ্গালায় ইহার কোন কথা আছে কি না জানি না। বাঙ্গলায় বরং ইহাকে "উদ্‌গীর্ণ উক্তি" বলা যাইতে পারে—কিন্তু এই অর্থে "উদ্গার" শব্দ বাঙ্গলায় অচল। কেননা, ইহা ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত। এইরূপ ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত সংস্কৃত শব্দের দৃষ্টান্ত ইতিপূর্ব্বে "মহারাষ্ট্র ভাষা"র লেখক অনেকগুলি দিয়াছেন। আমিও আর কতকগুলি দিতেছি:—

(প্রথমে মারাঠী—তাহার পর বাঙ্গলা) অনুভব—অভিজ্ঞতা। অনুভবী—অভিজ্ঞ। প্রামাণিকপণা—খাঁটী ব্যবহার (honesty) শিক্ষা—দণ্ড। শিক্ষণ—শিক্ষা। অপবাদ—নিয়মের ব্যতিক্রম (exception) প্রান্ত—প্রদেশ। পারদর্শক—স্বচ্ছ (Transparent), স্বচ্ছ—পরিষ্কৃত। ভব্য—উন্নতকায়, মহৎ (noble, grand)। সূচনা—প্রস্তাব। প্রয়োগ—পরীক্ষা। বন্ধু - সহোদর ভ্রাতা। ইত্যাদি।

বাঙ্গলায় এক কথায় honestyর কোন প্রতিশব্দ আছে কি না জানি না। বাঙ্গলায় আমরা "examination" ও "experiment"

এই উভয় অর্থেই "পরীক্ষা" শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকি; কিন্তু exepriment এর একটী স্বতন্ত্র প্রতিশব্দ থাকা আবশ্যক। আমার বোধ হয়, "experiment"কে "প্রয়োগ-পরীক্ষা" বলিলে মন্দ হয় না।

বাঙ্গলা অপেক্ষা মারাঠী ভাষায় অনেকগুলি যাবনিক শব্দ পাওয়া যায়। "মহারাষ্ট্র ভাষা"র লেখক মহাশয় তাহার কারণও দেখাইয়াছেন। যবন-সংসর্গই তাহার কারণ। দেড় শতাব্দি পূর্ব্বে, পেষোয়ার দফ্‌তরখানার লেখা-পড়ার কাজ সমস্তই পারস্য ভাষায় সম্পন্ন হইত। উক্ত লেখক মহাশয়ের মতে, এই সকল যাবনিক শব্দ প্রবেশ লাভ করিয়া মহারাষ্ট্র ভাষা যেন একটু অধোগতি প্রাপ্ত হইয়াছে। আমাদের অনভ্যস্ত কানে, সংস্কৃত শব্দের পাশাপাশি, এই সকল যাবনিক শব্দ খারাপ শুনায় বটে; কিন্তু আমার বোধ হয় সে কেবল অভ্যাসের কথা। বাঙ্গলা ভাষায় যে সকল যাবনিক শব্দ মিশিয়া গিয়াছে, তাহা তো আমাদের কাণে খারাপ লাগে না। বরং স্থলবিশেষে তাহা সংস্কৃত শব্দ অপেক্ষা ভাবব্যঞ্জক। যথা, "জোর" এই যাবনিক শব্দ আর "বল" এই সংস্কৃত শব্দ। যেখানে "জোর" শব্দ বসে, সেখানে বল শব্দ কিছুতেই প্রয়োগ করা যায় না। যেমন, "কথার উপর জোর দেওয়া"। যে সকল চলিত বৈদেশিক কথা ভাষার মধ্যে মিশিয়া গিয়াছে, তাহার স্থলে নূতন সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ করা বিড়ম্বনা মাত্র। এই কারণেই, শিবাজী, মহারাষ্ট্রীদিগের উপর অসীম আধিপত্য থাকা সত্ত্বেও, তাঁহার পণ্ডিতগণের রচিত শব্দগুলি মহারাষ্ট্র ভাষার মধ্যে প্রচলিত করিতে সম্যক্‌রূপে সমর্থ হয়েন নাই। চলিত কথার মধ্যে এইরূপ অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিলে নিতান্ত হাস্যাস্পদ হইতে হয়। যদি এখন আমরা "চাদর"-এর স্থলে "প্রাবরণী,"

"গোলাপের" স্থলে "মকরন্দ," "কারখানার" স্থলে "সম্ভারগৃহ"— "ফতুয়ার" স্থলে "পাহু-কঞ্চুক" এবং "চৌকির" স্থলে "আসন্দিকা" ব্যবহার করি, তাহা হইলে কিরূপ শুনিতে হয়?

আর এক কথা, সংস্কৃত আমাদের গৃহ-ভাণ্ডার—উহার দ্বার আমাদিগের নিকট সততই উন্মুক্ত। যখন ইচ্ছা, আমরা সংস্কৃত ভাষা হইতে শব্দ সংগ্রহ করিয়া ভাষার পুষ্টি সাধন করিতে পারি। কিন্তু বৈদেশিক শব্দ, কোন ভাষার মধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে হইলে কাল ও ঘটনার অপেক্ষা করে। যদি সৌভাগ্যক্রমে, ঘটনাচক্রে কতকগুলি বৈদেশিক শব্দ ভাষার মধ্যে মিশিয়া গিয়া থাকে, সে তো আমাদিগের উপরি লাভ। তাহার জন্য আক্ষেপ কেন? এখন আবার মহারাষ্ট্র ভাষার মধ্যে সংস্কৃত শব্দ সকল প্রবিষ্ট হইতেছে। প্রায় ২০ বৎসর অতীত হইল, মহারাষ্ট্র পণ্ডিত মৃত মহাত্মা বিষ্ণুশাস্ত্রী চিপ্‌লোঙ্কার, তাঁহার লেখায় প্রচুর সংস্কৃত শব্দ প্রথম ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন—ইনিই, বলিতে গেলে, মহারাষ্ট্র গদ্য-সাহিত্যের গতি ফিরাইয়া দিয়াছেন। ইনি মহারাষ্ট্র দেশে, মহারাষ্ট্রীয় "মেকলে" বলিয়া প্রখ্যাত। ইহাঁর প্রণীত "নিবন্ধ মালা" মহারাষ্ট্র গদ্যের আদর্শ স্থল। আধুনিক লেখকেরা এখন ইহাঁরই পদানুসরণ করিতেছেন। সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারের দিকে ইহাঁদিগের প্রবণতা দেখা যাইতেছে। তা ছাড়া, আজকাল প্রসিদ্ধ ইংরাজী বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক গ্রন্থ সকল মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় অনুবাদিত হইতেছে—সুতরাং অনেক শব্দ সংস্কৃত হইতে সংগৃহীত ও বিরচিত হইয়া উত্তরোত্তর ভাষার পুষ্টিসাধন করিতেছে।

তবে, এ কথা বলিতে হয়, মহারাষ্ট্র সাহিত্য, বাঙ্গলার তুলনায় এখনও অনেকটা পশ্চাদ্বর্ত্তী। এখনও উহার মধ্যে নবোদ্ভাবিনী প্রতিভার অভ্যুদয় হয় নাই। মারাঠী ভাষার অধিকাংশ আধুনিক

গদ্য উপন্যাস "কাদম্বরীর" ন্যায় প্রাচীন কালের আদর্শে বিরচিত। এই জন্য, মারাঠী ভাষায়, গদ্য উপন্যাস মাত্রেরই নাম "কাদম্বরী"। সম্প্রতি একটি উপন্যাস গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা অনেকটা আধুনিক ধরণের। * একটী স্ত্রীলোক তাঁহার বাল্যাবস্থার বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতেছেন—ইহাই গ্রন্থের বিষয়। বেশ স্বাভাবিক সহজ ভাষায়, ঘরের লোকদিগের কথা, ঘরকন্নার কথা, এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।

বাঙ্গলার ন্যায় বোম্বাই অঞ্চলেও নাট্যাভিনয়ের খুব ধূম। কোন মহারাষ্ট্র নাটকের অভিনয় দেখিতে গিয়া, মুণ্ডিত-মস্তক, শিখা-বিলম্বিত, তিলক-চর্চ্চিত-ললাট, প্রকাণ্ড উষ্ণীষধারী মহারাষ্ট্র শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যেও যখন "এন্‌কোর" "এন্‌কোর" ধ্বনি ও হাত-তালির চট্‌চটা শব্দ প্রথম শুনিলাম, তখন নিতান্তই বিস্মিত হইয়াছিলাম। মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধিকাংশ নাটকই পুরাতন সংস্কৃত নাটক ও ইংরাজী সেক্‌স্‌পিয়ারের নাটক অবলম্বনে রচিত। মহারাষ্ট্রীয়-দিগের মধ্যে অনেকগুলি কবিও হইয়া গিয়াছেন। "জ্ঞানেশ্বরী", একনাথকৃত রামায়ণ, মুক্তেশ্বর-কৃত চার পর্ব্ব মহাভারত, তুকারাম, নামদেব, প্রভৃতির অভঙ্গ নামক ছন্দের পদাবলী, মোরো-পন্ত-কৃত মহাভারত, ভাগবত ও রামায়ণ—এই সকল কবিতা-গ্রন্থ দাক্ষিণাত্যে প্রসিদ্ধ। ইহার মধ্যে অল্পই কবিদিগের স্বকল্পিত রচনা, অধিকাংশই রামায়ণ ও মহাভারতের ভাষান্তর। এই সকল মহারাষ্ট্র কবিতার মধ্যে বৈরাগ্য ও পারমার্থিক রসেরই প্রাদুর্ভাব। রসের বৈচিত্র্য কিছুমাত্র নাই। তুকারাম, রামদাস, ইহাঁরা কবি ও সাধু পুরুষ। তুকারামের অভঙ্গের ন্যায় ভক্তহৃদয়ের অকৃ-

* এই গ্রন্থের নাম "পণ কোণ লক্ষাত ঘেতো" অর্থাৎ—"কিন্তু কে লক্ষ্য করে"—একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী কর্ত্তৃক প্রণীত।

ত্রিম উচ্ছ্বাস আর কোথাও পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। এক বিষয়ে মহারাষ্ট্রীয়েরা ন্যায্যরূপে অহঙ্কার করিতে পারেন; তাঁহাদের মধ্যে "বখর" নামক স্বদেশীয় ইতিবৃত্ত আছে। আমরা ইতিহাসের কোন ধার ধারি না—আমাদের যাহা কিছু ঐতিহাসিক গ্রন্থ আছে, তাহার উপকরণ ইংরাজীগ্রন্থ হইতেই সংগৃহীত।

আজকাল সংবাদপত্রাদির পরিচালনে মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রভূত উদ্যম ও তৎপরতা দেখা যায়—কৃতবিদ্যমণ্ডলীর শক্তি-সামর্থ্য, বলিতে গেলে, উহাতেই পর্য্যবসিত। দুই চারিটী মাসিক প্রবন্ধ-পত্রও যোগ্যতার সহিত পরিচালিত হইতেছে। ইহার মধ্যে, একটীর নাম "ভাষান্তর"—উহাতে, প্রসিদ্ধ ইংরাজী গ্রন্থাদি ক্রমশঃ অনুবাদিত হইয়া পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়া থাকে। এইরূপে, মারাঠী ভাষায় অনেকগুলি উৎকৃষ্ট ইংরাজী গ্রন্থের অনুবাদ হইয়া গিয়াছে। মহারাষ্ট্রের কৃতবিদ্য মণ্ডলী আর একটী বৃহৎ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। ওয়েব্‌ষ্টার-কৃত সমগ্র ইংরাজী অভিধান ইহাঁরা মারাঠী ভাষায় অনুবাদ করিতেছেন। এইরূপ কৃত্রিম উপায়ে, মহারাষ্ট্র ভাষার বাস্তবিক উন্নতি হইবে কি না সে বিষয়ে বিলক্ষণ সন্দেহ আছে। যাহা হউক, ইহাতেও কতকটা উপকার হইতে পারে।

আমরা যেরূপ আজকাল মারাঠী ভাষার আলোচনা আরম্ভ করিয়াছি, মহারাষ্ট্রদেশের কৃতবিদ্য লোকেরাও সেইরূপ বাঙ্গলা ভাষা শিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহা অতীব আহ্লাদের বিষয়, সন্দেহ নাই। মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে যাঁহারা প্রার্থনা সমাজের অন্তর্ভূত, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ "ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ" ও "ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের ব্যাখ্যান" মূল হইতে পড়িবার উদ্দেশেই বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষা করেন এবং কেহবা, বাঙ্গলা ভাষায় প্রকাশিত আয়ুর্ব্বেদ-

শাস্ত্রের গ্রন্থ পড়িবার জন্য, ও কেহ বা বাঙ্গলা সংবাদ পত্র ও সাহিত্যাদির গ্রন্থ পড়িবার জন্য বাঙ্গলাভাষা শিক্ষা করিতে উৎসুক। "বধূ দর্পণ" নামক একটী মহারাষ্ট্রীয় গ্রন্থে, শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের "মেঝ বৌ" এবং অন্যান্য বাঙ্গালী লেখকদিগের প্রবন্ধ অনুবাদিত হইয়াছে। এইরূপ সাহিত্যগত ভাবের আদান প্রদানে আমাদের মধ্যে প্রভূত উপকার হইবার সম্ভাবনা, তাহা কে অস্বীকার করিবে? য়ুরোপে যেমন, ফরাসী, জর্ম্মান, প্রভৃতি আধুনিক য়ুরোপীয় ভাষা শিক্ষা করা, কৃতবিদ্য মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়, সেইরূপ হিন্দী, বাঙ্গলা, মারাঠী, গুজরাটী, প্রভৃতির মধ্যে দুই একটী ভাষা আমাদের মধ্যে সকলেরই শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। বিশ্ববিদ্যালয়, এ বিষয়ে উৎসাহ দিবেন, এরূপ আশা করা দুরাশা মাত্র। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে, আর এক দিক দিয়া, ইহার উত্তেজনা অল্প স্বল্প আরম্ভ হইয়াছে। দেশীয় লোকেরা যাঁহারা চিহ্নিত পদবীর সরকারী কর্ম্মচারী হইয়া বিলাত হইতে প্রত্যাগত হইতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ স্বপ্রদেশে নিযুক্ত না হইয়া, ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশে নিযুক্ত হইতেছেন—সুতরাং তাঁহাদিগকে ভিন্ন প্রদেশের ভাষা বাধ্য হইয়া শিক্ষা করিতে হইতেছে। এইরূপে প্রকারান্তরে দেশ-ভাষাগুলির প্রসার বৃদ্ধি হইবার উপক্রম হইয়াছে। যখন দেখিব, আমাদের সাময়িক সাহিত্যপত্রাদিতে, মারাঠী, গুজরাটী, হিন্দী প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষায় রচিত গ্রন্থ সকলের সমালোচনা প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তখনই জানিব আমরা কতকটা উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছি এবং যখন দেখিব, এক সময়ে সমস্ত য়ুরোপে যেরূপ ফরাসী ভাষায় আদর ছিল, সেইরূপ ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের লোক, বাঙ্গলার সাহিত্যসৌরভে আকৃষ্ট হইয়া, বাঙ্গলা

ভাষা আগ্রহ ও ঔৎসুক্যের সহিত শিক্ষা করিতেছেন, তখনই জানিব, বঙ্গীয় সাহিত্যগগণে গৌরবরবির উদয় হইয়াছে।

ফয়জাবাদের সমাধিমন্দির।

অযোধ্যার পৌরাণিক কীর্ত্তির কথা ছাড়িয়া দিলেও ঐতিহাসিকের নিকট একখানি সুবৃহৎ বৈচিত্র্যপূর্ণ ইতিহাস অপেক্ষা তাহা অধিক আদরণীয়। ইংরেজ রাজপ্রাসাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থপতি ওয়ারেন হেষ্টিংসের কঠোর দণ্ডাঘাতে তাহার বিপুল হর্ম্ম্যরাজি কম্পিত হইয়াছিল; তাহার পর যে দিন বৃটীশ রাজপ্রতিনিধি লর্ড ডেলহৌসীর অঙ্গুলী সঙ্কেতে অক্ষম নবাব ওয়াজিদ আলী সা তাঁহার সুবর্ণময় সিংহাসন ও রত্নমণ্ডিত উষ্ণীষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক চিরজীবনের জন্য তাঁহার পিতৃ পিতামহের আনন্দনিকেতন বিলাস-সৌধ হইতে নির্ব্বাসিত হইলেন সেই দিন সেই বৈদেশিক স্থপতির কার্য্য শেষ হইল।

কিন্তু এই রাজা ও রাজ্য পরিবর্ত্তনের সহিত একজন মুসলমান সাধ্বীর পবিত্র জীবন বিজড়িত ছিল; ইতিহাসে তাঁহার কথা অধিক উল্লেখ নাই এবং অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইয়াও তাঁহাকে যে সমস্ত অত্যাচার সহ্য করিতে হইয়াছিল, তিনি যেরূপ উৎপীড়িত হইয়াছিলেন ও মনঃপীড়া পাইয়াছিলেন সংসারে তাহার দৃষ্টান্ত অতি বিরল; কিন্তু শোকদুঃখসংক্ষুব্ধ জীবনের অবসানে তাঁহার মৃতদেহ মহিমান্বিতা সাম্রাজ্ঞীর ন্যায় অতুল সম্মান লাভ করিয়াছিল। যে সুবর্ণহর্ম্ম্যে তাঁহার মৃতদেহ সমাহিত হইয়াছিল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সৌধ তাজমহল অপেক্ষা তাহা নিকৃষ্ট নহে।—এই

রমণীরত্নের নাম শ্রীমতী আমেতু জাঁহারা বউ বেগম, এবং ফয়জাবাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৌধ তাঁহার নশ্বরদেহের বিরামমন্দির।

১৭৭৫ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার মৃত্যু হইলে আসফউদ্দৌলা সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, এবং আপনার ঐশ্বর্য্যে সন্তুষ্ট না হইয়া দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ রোহিলাদিগের রাজ্য আত্মসাৎ করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি জন্মে; কিন্তু তাঁহার তদুপযোগী অর্থবল এবং সৈন্যবল ছিল না, সুতরাং তাঁহাকে বলবান, রাজনীতিকুশল ইংরেজদিগের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইল, অনতিবিলম্বে তিনি ঋণজালেও বিজড়িত হইয়া পড়িলেন।

ভারতের নবার্জ্জিত রাজ্য তখন ইংরেজ বণিকগণের করায়ত্ত; তাহাদের অধিনায়ক হেষ্টিংস চেৎসিংহের ধনাগার লুণ্ঠন করিয়া বিশ লক্ষের অধিক টাকা প্রাপ্ত হন নাই, কিন্তু তাহাতে বণিক সম্প্রদায়ের প্রবল অর্থপিপাসা নিবারিত হইল না; আসফউদ্দৌলাকে ঋণ পরিশোধের জন্য ব্যতিব্যস্ত হইতে হইল।

আসফউদ্দৌলার মাতা ও পিতামহী—মতি বেগম এবং বৌ বেগম। ১৭৭৫ সালের ১৫ অক্টোবর একখানি একরারনামা দ্বারা ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট বউ বেগমের ধনাগার এবং জায়গীর রক্ষার্থ নবাবের প্রতিভূ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অনন্তর ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ কোম্পানী এবং নবাব—আসফউদ্দৌলা একমত হইয়া মতি বেগমকেও পূর্ব্বোক্ত প্রকার একখানি একরারনামা প্রদান করেন। কোম্পানীর, এই সদাশয়তার জন্য বেগমদ্বয় ইংরেজগণকে আসফউদ্দৌলার অঙ্গীকৃত টাকা দান করিলেন।

কিন্তু আরো অধিক টাকার প্রয়োজন, এই একরার ভঙ্গ না হইলে অর্থ সংগ্রহ দুরূহ, সুতরাং নানা প্রকার ছলনা উদ্ভাবিত হইল; তন্মধ্যে চেৎসিংহকে বেগমগণ সাহায্য করিয়াছেন ইহাই

প্রধান ছলনা, তাহার উপর আসফউদ্দৌলার ঋণ শোধের জন্য বিশেষ তাগাদা আরম্ভ হইল।

আসফউদ্দৌলা নিরুপায়, উপায় স্থির করিবার জন্য তিনি চুনারে আসিয়া হেটিংসের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, এবং উপহার অথবা উৎকোচ স্বরূপ তাঁহাকে দশলক্ষ টাকা প্রদান করিলেন; কিন্তু হেষ্টিংস একা নহেন, তাঁহার বহুসংখ্যক সহচর এবং অনুচর ছিল, তাহাদিগকে অভুক্ত অবস্থায় রাখিয়া হেষ্টিংস এই টাকা গ্রহণ করা ন্যায়সঙ্গত জ্ঞান করিলেন না, আসফউদ্দৌলার মাতা ও পিতামহীর সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন না করিলে আর উপায়ান্তর নাই। কাপুরুষ বিশ্বাসঘাতক আসফউদ্দৌলাকে সেই প্রস্তাবেই সম্মত হইতে হইল; হতভাগ্য নবাব আত্মরক্ষার জন্য আপনার বংশের গৌরব এবং সম্মান পদদলিত করিতে কুণ্ঠিত হইল না।

কিন্তু প্রকাশ্যে অনুষ্ঠানের কোন ক্রটী হইল না; ১৭৮১ খৃষ্টাব্দের ১৯এ সেপ্টেম্বর চুনারে যে সন্ধিপত্র সাক্ষরিত হইল তাহা অপক্ষপাতে ঐতিহাসিকের নিকটও অতিশয় প্রশংসা লাভের উপযুক্ত। তাহা অতি উদার এবং সুন্দর।

১৭৮২ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে মিড্‌ল্টন সাহেব ফয়জাবাদে উপস্থিত হইলেন, সঙ্গে নবাব আসফউদ্দৌলা। এই সময় হইতেই বেগমদিগের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ হইল; সে অত্যাচার ভাষায় বর্ণনা করা যায় না, এবং তাহা অতিরঞ্জিত হইবার নহে। এই অত্যাচারের প্রধান নায়ক, হায়দর বেগ খাঁ,—বৌ বেগমের কৃপায় এই ব্যক্তি সুজাউদ্দৌলার রাজত্ব কালে মন্ত্রিত্বপদ লাভ করিয়াছিল,—কৃতজ্ঞতার মস্তকে পদাঘাত করিয়া এই কৃতঘ্ন ব্যক্তি বেগমগণের দুঃসময়ে ইংরেজদিগের সহিত যোগদিয়া পরমহিতৈষিণীর সর্ব্বনাশ সাধনে প্রবৃত্ত হইল, এবং অনাথা রমণীদ্বয়ের

প্রতি কিরূপ উৎপীড়ন আরম্ভ করিল বাগ্মীশ্রেষ্ঠ এড্‌মণ্ড বর্ক মহা-সাগরের অপরপ্রান্তে দণ্ডায়মান হইয়া অগ্নিময় জ্বলন্ত ভাষায় তাহা বিবৃত করিয়াছেন; তিনি বলিয়াছেন "Mr Middleton states that they found great difficulties in getting at their treasures, that they stormed their fort successively but found great reluctance in the sepoys to make their way into the inner enclosure of the women's apartment. বিস্তীর্ণ রাজভবন বেগম ও পরিচারিকাগণের ক্রন্দনে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, চারিদিকে উচ্চ অবরোধ, সিংহদ্বারে ভীমমূর্ত্তি সশস্ত্র দৌবারিক, কিন্তু প্রাসাদের অভ্যন্তরে রাজরাণী ভিখারিণীর ন্যায় দিনপাত করিতে লাগিলেন; তাঁহাদের অবস্থা বুঝিয়া দোকানীগণ খাদ্যসামগ্রীর রোজ দিতে অসম্মত হইল, সুতরাং কোন ক্রমে কয়েকদিন অর্দ্ধাশনে অতিবাহিত হইল, তাহার পর অনশন।

কিন্তু এই দুর্দ্দিনে ইংরেজ কোম্পানী ভারতবাসীর প্রতি উৎ-পীড়ন করিলেও ভারতের ভাগ্যসূত্র কয়েকজন উন্নতমনা সাধু-হৃদয় মহাপুরুষের করধৃত ছিল; ভারতের শাসনকর্ত্তাগণকে কোর্ট অব ডিরেকটরগণের আদেশ পালন করিতে হইত। তাঁহাদের আদেশে ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে বেগমদিগের জায়গীর প্রত্যর্পিত হইল, সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের অন্নকষ্টও প্রশমিত হইল। ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে অনুতাপদগ্ধ অপদার্থ নবাব আসফউদ্দৌলা প্রাণত্যাগ করিলেন। জায়গীরের বন্দোবস্ত করায় বেগমদিগের হস্তে প্রায় এক কোটী টাকা সঞ্চিত হইল, অনেক বিবেচনার পর এই টাকা ইংরেজদিগের হস্তে গচ্ছিত রাখা হইল। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে বৌ বেগম ইহলোক ত্যাগ করিলেন; ইহজীবনে তিনি বহু যন্ত্রণা ভোগ করি-

য়াছিলেন, তাঁহার মৃত দেহের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য তাঁহার সমাধির উপর এক সুবিস্তীর্ণ সৌধ নির্ম্মিত হইল।

এই সতীর সমাধিমন্দির দর্শন করিবার জন্য আমি একবার ফয়জাবাদ গিয়াছিলাম। অযোধ্যা ও ফয়জাবাদ এই উভয় নগর পরস্পরের সন্নিকটবর্ত্তী। অযোধ্যায় রাজা রামচন্দ্রের কীর্ত্তি সন্দর্শন করা আমার অন্যতম অভিপ্রায় থাকিলেও অযোধ্যার বেগমের সমাধিস্থান আমার নিকট একটি পুণ্যতীর্থ বলিয়া বোধ হইয়াছিল।

মনে আছে, যে দিন ফয়জাবাদে উপস্থিত হইলাম সেদিন ঝুলন পূর্ণিমা, তখন বর্ষা অতীত হইয়াছিল, এবং শরৎ তাহার মনোরম শুভ্র শান্ত বেশে আকাশ ও ধরাতল পরিব্যাপ্ত করিয়াছিল। সেদিন আকাশে মেঘের অভাব ছিল না, কিন্তু তাহা অভ্রের ন্যায় স্বচ্ছ, এবং মুক্ত আকাশতলে তাহা লঘুপক্ষ বিহঙ্গমের ন্যায় উড়িয়া যাইতেছিল। সুন্দর রাত্রি, শরৎ চন্দ্রের উজ্জ্বল কিরণে ঊর্দ্ধে স্তব্ধ নক্ষত্রলোক হইতে নিম্নে অগণ্য জনকোলাহলসংক্ষুব্ধ বসুন্ধরা বিধৌত হইতেছিল, এবং বোধ হইতেছিল প্রত্যেক অট্টালিকা; পর্ণকুটীর, গৃহপ্রাঙ্গণ এবং রাজপথ সমস্তই ঝুলন উৎসবমগ্ন নরনারীবর্গের ন্যায় কৌতুকহাস্যে আচ্ছন্ন রহিয়াছে। নগর দীপমালায় সুসজ্জিত, গৃহে গৃহে, পথে পথে আনন্দ নৃত্য ও হর্ষসঙ্গীত। ইতিপূর্ব্বে বঙ্গদেশ ছাড়িয়া কখন উত্তরপশ্চিমের কোন নগরে পদার্পণ করি নাই, সুতরাং ঝুলনের এই আনন্দোৎসব আমার চক্ষে যথেষ্ট অভিনব ও বিস্ময়কর বলিয়া প্রতীত হইয়াছিল।

ফয়জাবাদে তখন উত্তরপাড়ার জমীদার আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয় সপরিবারে বাস করিতেছিলেন; পূর্ব্বেই সংবাদ দেওয়া ছিল এবং তিনি আমার

জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। যথাসময়ে তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিলাম।

ঝুলন উপলক্ষ্যে সে সময় অযোধ্যায় নানাস্থান হইতে লোকের সমাবেশ হইয়াছিল। সে দিন অযোধ্যায় মহা আনন্দ ও নৃত্য-গীত হইবার কথা; আমি সেই অপরাহ্নেই অযোধ্যায় যাইব এই-রূপ অভিপ্রায় ছিল, তাহার বন্দোবস্ত পর্য্যন্ত করা হইয়াছিল; কিন্তু অবশেষে মত পরিবর্ত্তন হইল। ফয়জাবাদ নগরের এক প্রান্তে, একখানি ক্ষুদ্র জীর্ণ কুটীরে বহুদিন হইতে একজন বিশ্বাসী সাধু বাস করিতেছিলেন, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাওয়াই প্রথম কার্য্য বলিয়া স্থির করা গেল।

অপরাহ্নে ফয়জাবাদের সুবৃহৎ বাজারের ভিতর দিয়া আমরা চলিতে লাগিলাম, এবং অবিলম্বেই সেই অনতিদীর্ঘ সুন্দর নগরের প্রান্তদেশে সন্ন্যাসীর কুটীরে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, সেই সামান্য ভগ্নপ্রায় কুটীরে এক সৌম্যমূর্ত্তি অশীতিপর বৃদ্ধ উপবিষ্ট আছেন; তিনি আমাদিগকে সমাদরে গ্রহণ করিলেন। কথাবার্ত্তা শুনিয়া বোধ হইল এই সাধু পরম পণ্ডিত, বলিতে লজ্জা নাই, আমার পাণ্ডিত্যের বিশেষ অভাব, সুতরাং উপস্থিত ক্ষেত্রে মৌন-ব্রত অবলম্বন করাই আমি শ্রেয় মনে করিলাম। রাসবিহারী বাবু তাঁহার সহিত ধর্ম্ম ও বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে অনেক ক্ষণ আলাপ করি-লেন, আমি ইতস্তত দৃষ্টি সঞ্চালন পূর্ব্বক সন্ন্যাসীর গৃহশোভা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম; আমার মনে হইল সংসারে যাঁহার এতখানি বৈরাগ্য—তাঁহার এ ভগ্ন কুটীরের বিড়ম্বনা কেন? বৃক্ষ মূলেও ত তাঁহার দিন অবাধে কাটিতে পারিত, কিন্তু এ প্রশ্নের আর কোন প্রকার মীমাংসা হইল না।

সন্ন্যাসীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া আমরা নগরের

অপর প্রান্তে বেগম সাহেবার সমাধিমন্দির দেখিতে গমন করিলাম। ফয়জাবাদ কেন, সমস্ত উত্তরপশ্চিম প্রদেশের মধ্যে এই মন্দির একটি প্রধান দর্শনীয় বস্তু। তাজমহলের সহিত ইহার তুলনা হয় না বটে—কিন্তু কোন বিষয়েই ইহা তাজমহল হইতে অপকৃষ্ট নহে বলিয়া অনুমান হয়। তাজমহল শ্বেত প্রস্তরে নির্ম্মিত এবং তাহাতে যে শিল্পনৈপুণ্য আছে তাহা অতুলনীয়, ক্ষুদ্র মানব কালের পরিবর্ত্তনশীল অঙ্কে অপরিবর্ত্তনীয় ভাবে তাহার অসামান্য ক্ষমতার চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে এবং এই বিপুল সৌধ প্রাচ্য জগতের গৌরব স্থানীয় হইয়া ঐশ্বর্য্যগর্ব্বিতা রাজেন্দ্রানীর ন্যায় আপনার মহিমায় বিরাজিত রহিয়াছে। বৌ বেগমের এই সমাধি মন্দির সম্পূর্ণরূপে শ্বেতপ্রস্তরমণ্ডিত নহে, ইহার স্থানে স্থানে শ্বেত প্রস্তর সজ্জিত আছে, অভ্যন্তরেও তাজমহলের ন্যায় কারুকার্য্য নাই বটে—কিন্তু বহির্দেশ হইতে দেখিলে ইহাকে তাজমহল অপেক্ষাও মহান্ এবং গৌরবপূর্ণ বলিয়া বোধ হয়।

এই সমাধিমন্দিরের গঠনকৌশল অতি সুন্দর, ইহা তাজমহল অপেক্ষা বৃহৎ এবং এখনও অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তাজমহল দেখিলে মনে হয় অতি অল্প স্থানের মধ্যে ভারতের অতুল বিভব, অনন্ত ঐশ্বর্য্য স্তূপীকৃত রহিয়াছে কিন্তু ফয়জাবাদের এই সমাধিমন্দির আপনার নীরব সৌন্দর্য্যে একটী প্রস্ফুটিত পুষ্পদামের মত বিরাজিত আছে। গঠনকৌশলে উভয়েই সমতুল্য। তাজমহল রক্ষার জন্য ইংরেজ রাজ যে প্রকার বন্দোবস্ত করিয়াছেন, এই সমাধি মন্দির রক্ষার জন্য বন্দোবস্ত তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক। বৌ বেগম ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের হস্তে যে কোটী টাকা গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন তাহার আয় হইতে বেগমের পরিবারবর্গ মাসিকবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, মন্দির রক্ষার ব্যয়ও তাহা হইতে নির্ব্বাহ হয়।

এই মন্দিরের চতুর্দ্দিকে প্রকাণ্ড উপবন। তাহার পারিপাট্য রক্ষার জন্য অনেক লোক নিযুক্ত আছে। সিংহদ্বারে প্রকাণ্ড নহবৎখানা। সেখানে প্রতিদিন যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে নহবৎ বাজে। শুনিলাম উত্তরপশ্চিম প্রদেশে এ প্রকার সুন্দর নহবৎ আর নাই; আমার নহবৎ শুনিতে অত্যন্ত ইচ্ছা হইল, শুনিলাম সন্ধ্যাকালে নহবৎ বাজিবে। আমি সৌধশোভা সন্দর্শন করিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া উপবনে ভ্রমণ করিলাম, অবশেষে সন্ধ্যার প্রারম্ভে সিংহদ্বারের নিকটে একখানি কাষ্ঠাসনে উপবেশন পূর্ব্বক বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। সূর্য্য তখন অস্ত গমন করিয়াছিল কিন্তু অস্তগত তপনের লোহিত রাগ এই শোকমন্দিরের সমুন্নত শুভ্র শিখরদেশে স্বর্ণকান্তি প্রস্ফুট করিতেছিল, শারদ সন্ধ্যার পশ্চিম গগনবিলম্বিত রঞ্জিত মেঘখণ্ডগুলি কল্পনারাজ্যের মধুর দর্শন বিহঙ্গকুলের ন্যায় গগনের অনন্ত বিস্তৃতির মধ্যে ভাসিয়া যাইতেছিল এবং সেই সুদৃশ্য সুসজ্জিত উপবন প্রদেশ পক্ষীকুলের সান্ধ্য কাকলীতে ধ্বনিত হইতেছিল; সহসা "দৃম্ দৃম্ ভোঁ" শব্দে নহবৎখানায় নহবৎ বাজিয়া উঠিল। সে কি করুণ কি মধুর রাগিণী! সন্ধ্যাসমাগমে ক্ষুব্ধ পৃথিবীর বিচিত্র কোলাহল নিবৃত্ত হইয়াছে, সমস্ত দিনের রৌদ্রতাপদগ্ধ ধরণীর ব্যথিত অঙ্গে সান্ধ্যসমীরণ ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে, উদার আকাশ অবনত নেত্রে করুণ দৃষ্টিতে বসুন্ধরার দিকে চাহিয়া আছে এবং মূক পৃথিবীও স্তব্ধ! আকাশের মধ্যে একটি বিমল শান্তিধারা ঢালিবার জন্যই বুঝি নহবৎ তাহার কোমল কণ্ঠ উন্মুক্ত করিল; সে সুর মানবের শ্রমক্লিষ্ট অবসন্ন হৃদয়ের সম্পূর্ণ অনুকূল, তাহাতে যে রাগিণী ধ্বনিত হইতেছিল তাহা মনের মধ্যে চাঞ্চল্য, একটি মহৎ আকাঙ্ক্ষা কিম্বা সংসারসংগ্রামে লিপ্ত হইবার জন্য অদম্য উৎসাহ এবং

আগ্রহ জাগাইয়া তুলে না, তাহাতে হৃদয়কে নির্ব্বাপিত করিয়া দেয়।

আমি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নহবৎ শুনিতে লাগিলাম; এমন কখন শুনি নাই, আর কখন শুনিব সে আশাও বড় অল্প! স্বপ্নশ্রুত সঙ্গীতের শেষ তানের ন্যায় তাহা সুমধুর, আমার "ক্ষুধিত তৃষিত তাপিত চিত্ত" তাহাতে পরিতৃপ্ত হইল। বোধ হইতে লাগিল আকাশের ঐ ঊর্দ্ধ দেশ হইতে নক্ষত্ররাজি বিস্ময়দৃষ্টিতে চাহিয়া এই সঙ্গীত শ্রবণ করিতেছে এবং এই বিস্তীর্ণ অট্টালিকার অন্তর্বিন্যস্ত সংসারতাপক্লিষ্টা একটি ব্যথিতা রমণীর দেহাবশিষ্টে যেন ধীরে ধীরে প্রাণ সঞ্জীবিত হইয়া উঠিতেছে!

দেখিতে দেখিতে পূর্ব্ব গগন উদ্ভাসিত করিয়া কৃষ্ণা তৃতীয়ার চন্দ্র উদিত হইল, এবং তাহার ঈষৎ ম্লান আলোকে নিস্তব্ধ উপবন, শ্বেত অট্টালিকা ও উন্মুক্ত প্রান্তর আলোকিত হইয়া উঠিল। নহবৎ থামিয়া গেল, আমরাও ধীরে ধীরে সে স্থান হইতে উঠিলাম এবং বাপীতটে একটি শিলাতলে বসিয়া অযোধ্যার অতীত গৌরবের ধ্বংসাবশেষের দিকে চাহিয়া রহিলাম; সকলই রহস্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। অযোধ্যার নবাবের গৌরবকাহিনী, তাঁহাদের অতৃপ্ত বিলাসিতার কথা, তাহার পর সেই আলোকদীপ্ত, পুষ্পরাজিসমাকীর্ণ শোভনীয় নাট্যশালার এই শোচনীয় পরিণাম—এই সমস্ত বিষয় চিন্তা করিতে করিতে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া গৃহে ফিরিলাম। চন্দ্রালোক আরো উজ্জ্বল হইয়া উঠিল এবং পশ্চাতে চিত্রপটের ন্যায় পরিস্ফুট পশ্চাদ্বর্ত্তী সুন্দর উপবন ও প্রশস্ত অট্টালিকা ক্রমে দূরতর হইতে লাগিল।

চড়ক সংক্রান্তি।

চৈত্রমাসে বসন্ত ও গ্রীষ্মের এই সন্ধিস্থলে পল্লীগ্রামের কৃষক জীবনে অনেকখানি প্রীতি বিকশিত হয়। গম, যব, ছোলা, অরহর প্রভৃতি রবিশস্যগুলি পাকিয়া উঠে, সুতরাং দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত আহারাভাবে শীর্ণদেহ ক্ষুধাতুর কৃষক পরিবারকে শস্য-সমাগমে আনন্দোৎফুল্ল দেখা যায়। এ সময় তরিতরকারীরও অভাব নাই; বাগানে গাছে গাছে কচি আম, গৃহপ্রাঙ্গনে সজিনা গাছে দুল্যমান অগণ্য সজনে খাড়া, পুকুরের পাড়ে বেড়ার ধারে নিবিড়পত্র ডুমুরগাছে থোকা থোকা যগডুমুর এবং সংকীর্ণকায়া মৃদুগামিনী তটিনীর উভয় তীরে, যেখানে বালুকারাশি ভেদ করিয়া ছোট ছোট ঝরণা উঠিয়াছে এবং ছোট ছেলে মেয়ের দল তাহাদের ক্ষুদ্রহস্তে বালির বাঁধ দিয়া প্রাণপণ শক্তিতে সেই ঝরণার জল আটকাইতে চাহে—ক্ষুদ্র শিশুহস্তরচিত সেই সকল আইলের আশেপাশে রাশি রাশি সবুজ শুশুনির শাক গ্রাম্য কৃষক পরিবারের তরকারীর অভাব দূর করে। সকলের ঘরেই ময়দা, খেজুরে গুড়, যবের ছাতু, বুটেরডাল সঞ্চিত আছে। যে সকল কৃষকের অবস্থা ভাল তাহাদের দুগ্ধবতী গোরুরও অভাব নাই; তাহারা কিম্বা সচ্ছল অবস্থাসম্পন্ন গোয়ালারা গোদুগ্ধ হইতে সঞ্চিত ননি জাল দিয়া ঘৃত পর্য্যন্ত সংস্থান করিয়া রাখে, সুতরাং যখন কোন গোপ কিম্বা কৃষকরমণী তাহার ক্ষুদ্র শিশুর কালো কুচকুচে শরীর প্রচুর তৈলে এবং অল্পজলে অভিষিক্ত করিয়া ও তাহা সযত্নে মুছাইয়া তাহাকে ঘুম পাড়াইবার জন্য অনুচ্চ স্বরে সুর করিয়া বলে—

"খোকা যাবে মোষ চরাতে খেয়ে যাবে কি
আমার শিকের উপর গোমের রুটি তবলাভরা ঘি।"

তখন এই ছড়া শুনিতে শুনিতে মাতৃক্রোড়শায়ী সেই কৃষক-শিশুর রসনেন্দ্রিয় উপাদেয় গোমের রুটি এবং তবলাভরা সদ্যোজাত ঘি আস্বাদনের জন্য ব্যাকুল হোক না হোক আমরা কিন্তু এই ছড়ার সুরে ও তাহার প্রত্যেক কম্পনে শুধু যে সেই অশিক্ষিত অসভ্য পরিবারে একটি সুকোমল মাতৃ হৃদয়ের স্নেহমধুর উচ্ছ্বাসের পরিচয় পাই তাহা নহে, তাহাদের পারিবারিক জীবনের একটি অমলসুন্দর শান্তিপূর্ণ গ্রাম্যচ্ছবি নয়নসমক্ষে সুস্পষ্টরূপে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।

অতএব আনন্দের এই পূর্ণ উচ্ছাসকালে পল্লীগ্রামের নিম্ন-শ্রেণীর লোক কয়েকদিনের জন্য একটা উৎসব উপলক্ষে একত্র সম্মিলিত হইয়া যে অনেকখানি আমোদ করিবে ইহা খুব স্বাভাবিক। নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুগণ শিবোপাসনার অধিকারী, সুতরাং চৈত্রমাসের অর্দ্ধেক গত হইতে না হইতে চড়কের ঢাক সজোরে সাধারণের নিকট সেই উৎসবের আবাহন কাহিনী ঘোষনা করে। চড়ক নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর সর্ব্বপ্রধান উৎসব।

আগে আগে চৈত্রের পনেরই তারিখ হইতেই চড়কের ঢাক বাজিয়া উঠিত; এবং সেই সময় হইতে পল্লীবাসী কৃষক, রাখালের দল, ঘরামী, মজুর প্রভৃতি শ্রমজীবীগণ নিজ নিজ কাজ ছাড়িয়া গাজনের হুজুগে মাতিত। আজকাল জীবনযাত্রাটা কিছু সঙ্গীন হইয়া উঠাতে চড়ক সংক্রান্তির এত আগে উৎসব মগ্ন হওয়া আর তাহাদের পোষায় না; এখন সাধারণতঃ সংক্রান্তির ন দশদিন আগে হইতে উৎসবের আয়োজন হয়।

প্রত্যেক গ্রামেই তিন চারিটি করিয়া দল থাকে; গ্রাম বড়

হইলে দলের সংখ্যা আরো বেশী হয়। প্রত্যেক দলের একজন করিয়া দলপতি আছে, তাহাকে "মূলসন্ন্যাসী" বলে। মূলসন্ন্যাসীর জাত্যংশে শ্রেষ্ঠ হওয়া নিতান্ত আবশ্যকীয় নহে, কৈবর্ত্ত গোয়ালা বণিক, গণ্ডক প্রভৃতি যে কোনজাতি মূল সন্ন্যাসী হইতে পারে, কিন্তু তাহার পরিণতবয়স্ক হওয়া দরকার। শিবের সিংহাসন টানিয়া বেড়ান, নিয়মিতরূপে শিবপূজা করা, দলস্থ অন্যান্য সন্ন্যাসীকে পরিচালিত করা মূল সন্ন্যাসীর কাজ, এতদ্ভিন্ন তাহার আরো দুই একটি কাজ আছে সে কথা আমরা পরে বলিব।

চৈত্র সংক্রান্তির দশদিন পূর্ব্বে মূল সন্ন্যাসী ক্ষৌরকর্ম্মের দ্বারা পবিত্র হইয়া ক্ষুদ্র কাষ্ঠসিংহাসনে একটি শিবলিঙ্গ সংস্থাপন পূর্ব্বক নিজ নিজ গাজনতলায় আখড়া জমকাইয়া বসে। মহাদেবের এই সকল নৈমিত্তিক সেবক এই সময় স্বস্ব বাড়ীতে থাকে না, কোন বৃক্ষতলে বা বনান্তরালে ইহাদের এক এক আড্ডা আছে তাহাকেই 'গাজনতলা' বলে। এক এক পাড়ায় এক একটি নির্দ্দিষ্ট গার্জন তলা আছে, যেবৎসর যে লোকই মূল সন্ন্যাসী হোক—সেই সকল গাজন তলাতে তাহাদের আড্ডা ফেলিতেই হইবে।

'গাজনতলা' গুলির চারিদিকের দৃশ্য অতি সুন্দর। নিকটে কোথাও জনমানবের ঘরবাড়ী নাই, চারিদিকে স্যাওড়া এবং ভাঁট বন, ভাঁট ফুলের সুগন্ধে জঙ্গলটি পরিপূর্ণ, নিকটে দীর্ঘশীর্ষ নারিকেল গাছের সারি, দুই একটি তমাল ও বেল গাছ বা বাঁসের ঝাড়; সমস্ত বৎসর এখানে মনুষ্য সমাগম হয় না। কেবল এই সময় যথানির্দ্দিষ্ট স্থানটি পরিষ্কার করিয়া সন্ন্যাসীর দল খেজুর পাতায় ছাওয়া ক্ষুদ্র কুটীর তুলিয়া সেখানে শিবস্থাপনা করে এবং সন্নিকটবর্ত্তী বট পাকুড় অথবা তেতুল গাছের প্রচ্ছন্ন ছায়ায় আড্ডা পাতিয়া লয়।

ক্ষৌর কর্ম্মের দ্বারা আপনাকে পবিত্র করিয়া মূল সন্ন্যাসী পৈতা গলায় দেয়। এই পৈতা ব্রাহ্মণের উপবীতের ন্যায় নহে, ইহা শুধু তাহাদের গলায় ঝুলিতে থাকে, পৈতাগুলি হরিদ্রারঞ্জিত, এবং তাহাতে একটি করিয়া পিতলের আঙ্গটি ঝুলিতে দেখা যায়।

মূল সন্ন্যাসীর সঙ্গে আরো অনেকে দাড়ি গোঁফ কামাইয়া সন্ন্যাসী হয়; চড়ক সংক্রান্তির দশদিন আগে যাহারা কামায় তাহাদের কামানোর নাম "দশের কামান"—এইরূপ কামানোর দিন অনুসারে সাতের কামান, পাঁচের কামান, তিনের কামান নাম হইয়াছে। তিনের কামানই শেষ কামান। কামানোর পর এবং উৎসব শেষ হইবার পূর্ব্বে সন্ন্যাসীদের কোন গৃহকর্ম্মে যোগ দিবার যো নাই, শুধু দলের সঙ্গে ঘুরিয়া ভিক্ষা করা এবং গাজন-তলায় রাত্রিযাপন করাই ব্যবস্থা; সুতরাং যাহারা খুব কাজের লোক, অথচ একটু সখের বাতিকও আছে তাহারা আগে না কামাইয়া শেষ দিন অর্থাৎ তিনের কামানের দিন কামায়। অনেকে মোটেই কামায় না, সংক্রান্তির দিন সন্ন্যাসীর দলে মিশিয়া খানিক আমোদ করিয়া আসে।

কি মূল সন্ন্যাসী কি তাহার অনুচরবর্গ সকলের হাতেই বেতের একরকম ছড়ি দেখা যায়, চার পাঁচ গাছ সরু বেত একত্র করিয়া ঝাঁটার মত বাঁধিয়া এই ছড়ি তৈয়ারী হয়, সংক্রান্তির পূর্ব্বদিন ইহা তাহাদিগের হাতে থাকে।

সংক্রান্তি যতই নিকট হইয়া আসে ঢাকের বাদ্য ততই উচ্চ হয় এবং সন্ন্যাসীদিগের "বলো শিবো মহাদেব দেব" ইত্যাকার কণ্ঠধ্বনি ঘনঘন শুনিতে পাওয়া যায়। ছোট ছোট ছেলের দল ঢক্কাধ্বনি শুনিয়া তাহার অনুকরণে সুর করিয়া বলে "চড়ক চড়ক ড্যাডাং ড্যাং পাবদামাছের দুটো ঠ্যাং"। সন্ন্যাসীরা সংক্রান্তির

পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত লোকের বাড়ী সিংহাসন সমেত শিব মাথায় করিয়া ভিক্ষা করে—যত গোয়ালা ও কৈবর্ত্তের ছেলে পায়ে নূপুর বাঁধিয়া ভাল কাপড় পরিয়া বাজনার তালে তালে নাচিতে নাচিতে গ্রামস্থ গৃহস্থ ও ভদ্রলোকের বাড়ীতে উপস্থিত হয়। লোকে ইহাদিগকে ঠিক ভিক্ষুকের হিসাবে দেখে না, সুতরাং ইহাদিগের ভিক্ষার থালীতে অধিক পরিমাণে চাল ডা'ল দান করে। ভিক্ষা করিয়া ইহারা যাহা পায়, সন্ধ্যাকালে স্নান করিয়া আসিয়া তাহাই রাঁধে এবং একত্র আহারাদি করে।

সংক্রান্তির দুই তিনদিন পূর্ব্ব হইতে গ্রামে আমোদের বড় ধুম পড়িয়া যায়। অপরাহ্নে প্রত্যেক গাজন তলাতেই অনেকগুলি ঢাক বাজিয়া আকাশ ফাটাইয়া দেয়। সন্ন্যাসীদলের অবিশ্রান্ত নৃত্যে মাটি কাঁপিতে থাকে, পাড়ার ছোট ছোট ছেলে মেয়ে হইতে আরম্ভ করিয়া বৃদ্ধ বৃদ্ধাপর্য্যন্ত গাজনতলার চারিদিকে সমবেত হইয়া ইহাদিগের এই প্রমোদনৃত্য নিরীক্ষণ করে; অনেক কুলবধূ জল আনিবার ছলে কলসীকাঁকে লইয়া গাজনতলা দিয়া নদীতে যায় এবং অন্তরালে দাঁড়াইয়া ঘোমটা ঈষৎ উন্মুক্ত করিয়া কৌতুকপ্রদীপ্ত চক্ষে এই দৃশ্য দেখিয়া লয় কিন্তু বড়জা, শ্বাশুড়ী ও ননদীদের ভয়ে তাহারা বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিতে পারে না।

নাচিতে নাচিতে কোন কোন সন্ন্যাসীর অতিরিক্ত ভাবোদয় হয়; তাহারা মাটির উপর উবু হইয়া পড়িয়া যায় এবং অবনত মুখে ঢাকের বাজনার তালে তালে সবেগে মাথা নাড়িতে থাকে—ইহাকে "বয়াল খাটা" বলে। ভাবোন্মত্ত সন্ন্যাসীগণ শুধু বয়াল খাটিয়াই ছাড়ে না, এই রকম করিয়া মাথা নাড়িতে নাড়িতে হামা দিয়া অনেক দূরে চলিয়া যায় এবং কখন কখন বনের মধ্যে কি গর্ত্তে গিয়া পড়ে। শুনিয়াছি যখনই ইহাদের উপর মহাদেবের

ভর হয় তখন ইহারা সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়ে, তখন ঢাক আরো বেশী জোরে বাজিয়া উঠে এবং অন্যান্য সন্ন্যাসীদের "বলো শিবো মহাদেব দেব" ধ্বনি ঘন ঘন উচ্চারিত হয়। তাহার পর তাহারা সেই ভরপ্রাপ্ত সন্ন্যাসীকে হাতসাঁই করিয়া তুলিয়া লইয়া যায় এবং তাহার চৈতন্য সম্পাদনের চেষ্টা করে।

সংক্রান্তির পূর্ব্বদিন অপরাহ্নে গ্রামের সমস্ত সন্ন্যাসী সমবেত হইয়া দলবাঁধিয়া নদীকূলে যায়; তাহার পর তাহাদের বেত্রদণ্ড হাতে লইয়া নদীর জলে নামিয়া চড়ক গাছের অনুসন্ধান করে। পূর্ব্বে পিট বা হাত ফুঁড়াইয়া চড়কে পাক খাওয়ার নিয়ম ছিল, কিন্তু ইদানীং পিনাল কোডের চোটে তাহা উঠিয়া গিয়াছে, এবং তদবধি চড়ক গাছ মহাশয় নদীর জলে গা ঢাকা দিয়া পেন্সন ভোগ করিতেছেন। সম্বৎসরের পরে এই দিনে সন্ন্যাসীরা এই সুদীর্ঘ চড়ক গাছ নদীতীরে টানিয়া তোলে এবং তাহার যথা-রীতি পূজা করিয়া আবার জলের মধ্যে ঠেলিয়া রাখিয়া আসে। ছেলেবেলায় শুনা যাইত এই চড়কগাছ বড় জীবন্ত দেবতা; ইনি সমস্ত বৎসর নদীতে নদীতে ঘুরিয়া ঠিক এই সময়টিতে পূজার লোভে নিজের পীঠস্থানে আসিয়া হাজির হন।

চড়কের পূজা শেষ হইলে সন্ন্যাসীগণ ঢাক বাজাইয়া পূর্ব্ববৎ নাচিতে নাচিতে নিজ নিজ গাজন তলায় ফিরিয়া আসে। এই দিন অন্নাহার নিষেধ, এদিন রাত্রে ফলভক্ষণ করিতে হয়; ফলা-হারের ব্যাপারটি বিশেষ আয়োজনেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। দিবসে ভিক্ষা করিবার সময় এই দিন ইহারা অনেক ফল ভিক্ষা পায়; তদ্ভিন্ন গাছ হইতে সুপক্ক নোনা, বেল, পেপে, পিয়ারা পাড়িয়া আনে, পল্লীগ্রামে নারিকেল গাছের অভাব নাই, দু চার কাঁদি নারিকেলও বৃক্ষস্বামীর অসাক্ষাতে চাহিয়া আনে। ফল

ভক্ষণের সময় অনেক বাহিরের লোক আসিয়া ইহাদের সঙ্গে যুটিয়া যায়—ইহাতে সন্ন্যাসীদের কোন আপত্তি নাই।

এই দিন সমস্ত রাত্রি ঢাকের বাজনা আর "বলো শিবো মহাদেব দেব" শব্দে সমস্ত গ্রাম প্রতিধ্বনিত হয়। অনেক রাত্রে ইহারা আগুণ জ্বালিয়া এবং কণ্টকময় কুলের ডাল জড় করিয়া তাহার উপর দিয়া যাতায়াত করে, এই ব্যাপার স্বচক্ষে দেখিবার কোন দিন সুযোগ হয় নাই, তবে শুনিয়াছি এই আগুণের উপর দিয়া যখন তাহারা চলে তখন অগ্নির দাহিকাশক্তি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়, ভস্মাবশেষ ভিন্ন তাহাতে আর কিছু থাকে না এবং কুলের ডালগুলি যতদূর সম্ভব নিস্কণ্টক করিয়া ফেলা হয়।

রাত্রি শেষে 'কাকবলী' দিবার নিয়ম। কাকবলী জিনিষটার সঙ্গে বোধ করি অধিক পাঠকের পরিচয় নাই। সন্ন্যাসীরা চড়ক পূজার সময় শিবেরই উপাসনা করিয়া থাকে, অতএব শিবের অনুচর ভূতগণের প্রতি কিঞ্চিৎ সদাচার না করিলে পাছে সেই সকল অপদেবতা অসন্তুষ্ট হয় এই ভয়ে সন্ন্যাসীরা এই দিন রাত্রে ভূতের প্রীত্যর্থে যৎকিঞ্চিৎ আহারের যোগাড় করে। এবং ভাত শোলমাছের ঝোল ও অম্বল রাঁধিয়া একটা মাল্‌সাতে লইয়া শেষরাত্রে ভূত মহাশয়ের সন্ধানে যায়। রাত্রি তিন চারিটার সময় সর্ব্বাপেক্ষা সাহসী এবং শুদ্ধাচারী মূলসন্ন্যাসী সেই মালসাটি লইয়া নদীর দিকে অগ্রসর হয়; পাঁচ সাত জন বলবান সন্ন্যাসী তাহাকে বাহুদ্বারা দৃঢ়রূপে বেষ্টন করিয়া চলে। এইরূপে চলিতে চলিতে তাহারা নদীর জলে নামে, জল যখন এক বুক হয় তখন সেই মালসা ভাসাইয়া দেয়, এবং সাগ্রহে ভূতগণকে আহ্বান করিয়া সেই খাদ্য দ্রব্য গ্রহণ করিতে অনুরোধ করে। শুনিয়াছি ক্ষুৎকাতর ভূত কখন কখন সেইমালসা মূলসন্ন্যাসীর হাত হইতে

ছোঁ মারিয়া লইয়া চলিয়া যায়; এমন কি সন্ন্যাসীগণ মূলসন্ন্যাসীকে সবলে আটকাইয়া না রাখিলে ভূত তাহাকে শুদ্ধ টানিয়া লইয়া যায় এবং সেই জন্যই এরূপ সতর্কতা অবলম্বিত হয়। বাল্যকালে প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যাইত, অমুক মূলসন্ন্যাসী কাকবলী দিতে গিয়াছিল, ভূতেরা মহা ঝড় তুলিয়া আসিয়া তাহাদের খাদ্য দ্রব্য এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে পর্য্যন্ত টানিয়া লইয়া গিয়াছে; অন্যান্য সন্ন্যাসীগণ তাহাকে আট্‌কাইয়া রাখিতে পারে নাই। পরদিন খুজিতে খুজিতে মূলসন্ন্যাসীকে দুই তিন ক্রোশ দূরে নদীতীরে, বা কোন বৃক্ষতলে অথবা কোন শ্মশানের কাছে অজ্ঞান অবস্থায় পাওয়া যাইত। শুনিয়াছি মূলসন্ন্যাসী সম্পূর্ণরূপ শুদ্ধাচারে না থাকিলে ভূত মহাশয়েরা তাহাকে এইরূপে বিপন্ন করে; কিন্তু আজ কাল ভূতের আর এরকম লোমহর্ষণ দৌরাত্ম্যের কথা শুনিতে পাওয়া যায় না।

চড়ক সংক্রান্তির দিন সন্ন্যাসীদিগের সাজসজ্জার দিকে মনোযোগ কিছু অতিরিক্ত মাত্রার বৃদ্ধি হয়। অপরাহ্ণে 'ধুপবান' খেলিতে হইবে, তাহারই আয়োজনে ইঁহারা বিশেষ ব্যস্ত হইয়া উঠে। সকল সন্ন্যাসীই স্বস্ব পরিচিত অবস্থাপন্ন ভদ্র প্রতিবেশীর নিকট হইতে তাঁহাদের স্ত্রী কন্যাদিগের, পট্টবস্ত্র, শান্তিপুরে ডুরে, গুলবাহার প্রভৃতি সাড়ী এবং গোঠ, চন্দ্রহার, চিক, পাঁচনর, বাজু, বালা, তাবিজ প্রভৃতি গহনা চাহিয়া আনিয়া তদ্দারা স্বস্ব দেহ সজ্জিত করে, এই সমস্ত বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত হইলে এই সকল কৃষ্ণকায় চাষার ছেলেদের কিম্ভূতকিমাকার দেখিতে হয়। তাহার পর ইহারা ধুনো কিনিয়া আনিয়া তাহা উত্তমরূপে পিষিয়া মালসা পূর্ণ করে ও তৈলে বস্ত্রখণ্ড ভিজাইয়া রাখে; এই ধুপ এবং তৈলে অভিষিক্ত বস্ত্রখণ্ড 'ধুপবাণ' খেলার প্রধান উপকরণ।

এদিকে কে কি রকম সঙ বাহির করিবে তাহা নির্দ্ধারিত করিবার জন্য পাড়ায় পাড়ায় মিটিং বসিয়া যায়।

বেলা শেষ হইতে না হইতে চারিদিক হইতে তুমুল বেগে ঢাক বাজিয়া উঠে। সন্ন্যাসীগণ বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত হইয়া এক একটি বান লইয়া নদী তীরে সমাগত হয়। এই বানগুলি দেখিতে অনেকটা সেকরাদের সাঁড়াসীর মত, কিন্তু অপেক্ষাকৃত দীর্ঘতর, তাহার দন্তদ্বয়ের অগ্রভাগ সূচ্যগ্র তীক্ষ্ণ এবং মাথার দিকটা ঠোঁট বাহির করা, তাহারই নিকট একটা করিয়া লোহার শিকলী লাগান থাকে। মূলসন্ন্যাসীগণকে কখন বাণ ফুড়িয়া খেলা করিতে দেখা যায় না, ইহারা নদীতীরে শিবের সিংহাসন বহিয়া আনে। নদীকূলে সেই সিংহাসন নামাইয়া শিব পূজা করা হয়; অনেকে ধোপাদের কাপড় কাচিবার পাটের মত এক এক খানা পাট ঘাড়ে করিয়া যায়, তাহাকে যথারীতি সিন্দুর রঞ্জিত করিয়া পূজা করে। তাহার পর মূলসন্ন্যাসী অন্যান্য সন্ন্যাসীদিগের চক্ষু পানের পাতা দিয়া ঢাকিয়া বাণের তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ দুই পাঁজরের মাংসে বিঁধাইয়া দেয়, এবং গলদেশে পূর্ব্বকথিত শিকলী বাঁধিয়া বাণগাছটা বেশ আটকাইয়া রাখে; ইহাতে এই ফল হয় যে দুই হাত তুলিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া যখন তাহারা সবেগে নৃত্য করে তখন বাণ খুলিয়া পড়িতে পায় না। ছোট ছোট ছেলেরা সখ করিয়া বাণ ফুড়িতে চায় কিন্তু অনেকে পাঁজরের মাংস ফুটাইবার সময় কাঁদিয়া অস্থির হয়, সেরূপ স্থলে তাহাদের বুকে ও পিঠে গামছা জড়াইয়া তাহারই মধ্যে বাণ বিধাইয়া দেয়।

সন্ন্যাসীদলের মধ্যে যাহারা বেশী সৌখিন তাহারা কাঠমল্লিকা বা আকন্দের ফুল ভাঙ্গিয়া তাহার মালা মাথায় এবং গলায় পরে ও তদ্দ্বারা শিবের কাষ্ঠ সিংহাসনখানি সজ্জিত করে।

বাণফোড়া হইলে বাণের মাথায় তৈলসিক্ত বস্ত্রখণ্ড জড়াইয়া তাহাতে আগুণ ধরাইয়া দেয়; মসালের মত আলো জলিয়া উঠে তখন সকলে চক্রাকারে নাচিতে নাচিতে ভিন্ন ভিন্ন দলে নদীতীর হইতে গ্রামের দিকে অগ্রসর হয়; অনেক আমোদপ্রয়াসী লোক বাণ না ফুড়িয়াই এই দলের সঙ্গে মিশিয়া উর্দ্ধহস্তে ত্রিভঙ্গ ভাবে নাচিতে আরম্ভ করে। তাহাদের অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গী দেখিলে হাস্য সম্বরণ করা দুরূহ হইয়া উঠে।

দিবাবসানের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের ক্ষুদ্র বাজার এবং সংকীর্ণ রাজ-পথ লোকে লোকারণ্য হইয়া যায়। বাজারের শিবমন্দির-প্রাঙ্গনে এবং কালীবাড়ীতে বহুসংখ্যক স্ত্রীপুরুষের সমাগম হয়; হাসি গল্প, গান এবং উচ্চ কলরবে সমস্ত যায়গাটা গম্ গম্ করিতে থাকে। অনেক পুত্রবৎসল পিতা তাহাদের দুই তিন বৎসরের ছেলেদের নীলাম্বরী কাপড় পরাইয়া কোমরে লাল চাদর বা চিত্র বিচিত্র রুমাল বাঁধিয়া তাহাদিগকে কাঁধে লইয়া ধুপবাণ দেখিতে আসে।

বেলা শেষ হইতে না হইতে নানা রকমের সঙ বাজারে আসিয়া জড় হয়। স্থূল রসিকতা দ্বারা সাধারণ দর্শকের হাস্যরসের উদ্রেক করাই তাহাদের অভিপ্রায়; তাহাদের এই অভিপ্রায় সম্পূর্ণ রূপে সিদ্ধ হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সে সকল সঙের মধ্যে হাস্য-রস উদ্রেকের জন্য কোনই আয়োজন থাকে না, না থাকিলেও পল্লীগ্রামের নিম্ন শ্রেণীর লোকের আমোদের একটা আদর্শ লক্ষ্য করা অল্প আনন্দজনক নহে। অতএব এখানে সঙের দুই একটা নমুনা দেওয়া যাইতে পারে। কেহ একটা মুখস পরিয়া গায়ে খানিক চিটাগুড় ও কতকগুলা শিমুলের তুলায় কৃত্রিম লোম লাগাইয়া এবং চাদর পাকাইয়া তাহারই একটা লেজ বাঁধিয়া বাঘ

সাজিয়া হাজির হয়, একজন লোক তাহার কণ্ঠলগ্ন দড়ি গাছটি ধরিয়া অগ্রসর হয়, তাহাদের চারিদিকে ছেলে ও বুড়োতে পঞ্চাশ-জন, কোন সাহসী চাষার ছেলে রহস্যচ্ছলে সেই কৃত্রিম শার্দ্দূলের লেজে হাত দেয় আর ব্যাঘ্রপ্রবর 'আঁক' করিয়া তাহার দিকে লম্ফ প্রদান করে—দেখিয়া সকলে শশব্যস্তে ছুটিয়া পলায় এবং সকলের উদ্ঘাটিত মুখ বিবর হইতে হাসি উৎসারিত হইয়া পড়ে।

অন্যত্র একজন বৈরাগী অন্য একজন বাবাজীর সেবাদাসীকে সঙ্গে লইয়া খঞ্জনী বাজাইতে বাজাইতে চলিয়াছে এবং "বেলা গেল ও ললিতে কৃষ্ট এলো না" এই গান গাহিয়া আমোদলোলুপ পল্লী যুবকের দেহ ও মন আকর্ষণ করিতেছে; পথিমধ্যে বৈষ্ণবী-হারা বৈরাগী বৎসহারা ধেনুর ন্যায় ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া পূর্ব্বোক্ত বৈষ্ণবীচোর বাবাজীউকে আক্রমণ পূর্ব্বক তাহার ঝুলি ধরিয়া টানিতে লাগিল, উভয় পক্ষে বিপরীত ঝগড়া—শেষে মারা-মারী, মারামারীর চোটে বাবাজীউদের টিকি কাঠের মালা ছিঁড়িয়া গেল, ঝোলার মধ্যে হইতে মদের বোতল, ছোলাভাজা প্রভৃতি বাহির হইয়া পড়িল। ইত্যবসরে আর একজন লুব্ধ বৈরাগী আসিয়া বৈষ্ণবীকে লুফিয়া লইয়া গা ঢাকা দিল।

ক্রমে সন্ধ্যা গাঢ় হইয়া আসে। বাজারের দোকানে দোকানে এবং গৃহে গৃহে মৃৎ প্রদীপ জ্বলিয়া উঠে। সন্ন্যাসীর দল রাস্তা ঘুরিয়া গ্রাম্য জমীদারের বাড়ীর সম্মুখে খানিকক্ষণ খেলা করিয়া বাজারে প্রবেশ করে। একদল যাইতেছে, আর একদল আসিতেছে, ঢাক বাজিতেছে, এক সঙ্গে সন্ন্যাসীদের পা উঠিতেছে পড়িতেছে, বাণের আগায় ধ্বক্ ধ্বক্ করিয়া আলো জ্বলিতেছে; এবং মিনিটে মিনিটে সেই আলোতে যুগপৎ এক একমুঠো ধূপের গুঁড়া নিক্ষিপ্ত হইতেছে। আলো এক সঙ্গে ধপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, কুণ্ডলী-

কৃত আলোকদীপ্ত ধূম অন্ধকারপূর্ণ আকাশ তলে অনেক দূর পর্য্যন্ত আলোকিত করিয়া দেয়, ঢাক আরো সজোরে বাজিয়া উঠে, ঘর্ম্মাপ্লুত দেহ সন্ন্যাসীর দল উন্মত্তপ্রায় হইয়া শূন্যে দুই হাত তুলিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া আরো বেশী উৎসাহের সঙ্গে নাচিতে থাকে।

এইরূপে চক্রাকারে নাচিতে নাচিতে সমস্ত দল প্রথমে শিবমন্দিরের প্রাঙ্গনে তাহার পর কালীতলায় সমবেত হয়। সেখানে অনেকক্ষণ নৃত্য করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দল স্বস্ব গাজনতলায় ফিরিয়া আসে, আসিবার সময় গ্রামস্থ ভদ্রলোকের বাড়ীর সম্মুখে একবার তাহাদের নৃত্যকৌশল দেখাইয়া যায়। যে সকল কুলকামিনীর বস্ত্রালঙ্কারে ইহারা সজ্জিত হয় তাঁহারা বাতায়ন অন্তরাল হইতে কৌতুকপূর্ণ হাস্যবিস্ফারিত নেত্রে ইহাদের অপরূপ বেশ নিরীক্ষণ করেন কিন্তু তাঁহাদের বস্ত্রালঙ্কারের পরিণাম দেখিয়া তাঁহারা যে বিশেষ প্রীতি লাভ করেন এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় না।

ক্রমে রাত্রি অধিক হয়। গাজনতলার ঢকাধ্বনি ও কলরব থামিয়া যায়, ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম উন্মত্ত আনন্দোচ্ছ্বাসের পর শ্রান্তিভরে ঘুমাইয়া পড়ে; শুধু আকাশের অগণ্য নক্ষত্র মিটি মিটি চাহিয়া থাকে এবং উচ্ছৃঙ্খল বায়ু প্রবাহে গাছের পাতা ও বাঁসবন ঘন ঘন কাঁপিয়া উঠে, তাহাতে বোধ হয় যেন একটি পরমায়ুহীন বৎসর তাহার আনন্দ এবং বিষাদপূর্ণ বিচিত্র স্মৃতিভার বক্ষে লইয়া এই গাঢ় অন্ধকার সমাচ্ছন্ন নিদ্রাহীন স্তব্ধ নিশীথিনীর সুকোমল ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া অন্তিম নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে।

বাঙ্গলা জাতীয় সাহিত্য।

সহিত শব্দ হইতে সাহিত্য শব্দের উৎপত্তি। অতএব ধাতুগত অর্থ ধরিলে সাহিত্য শব্দের মধ্যে একটি মিলনের ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। সে যে কেবল ভাবে ভাবে ভাষায় ভাষায় গ্রন্থে গ্রন্থে মিলন তাহা নহে,—মানুষের সহিত মানুষের, অতীতের সহিত বর্ত্তমানের, দূরের সহিত নিকটের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ যোগসাধন সাহিত্য ব্যতীত আর কিছুর দ্বারাই সম্ভবপর নহে। যে দেশে সাহিত্যের অভাব সে দেশের লোক পরস্পর সজীববন্ধনে সংযুক্ত নহে—তাহারা বিচ্ছিন্ন।

পূর্ব্বপুরুষদের সহিতও তাহাদের জীবন্তযোগ নাই। কেবল পূর্ব্বাপর-প্রচলিত জড় প্রথাবন্ধনের দ্বারা যে যোগসাধন হয় তাহা যোগ নহে তাহা বন্ধন মাত্র। সাহিত্যের ধারাবাহিকতা ব্যতীত পূর্ব্বপুরুষদিগের সহিত সচেতন মানসিক যোগ কখনই রক্ষিত হইতে পারে না।

এক শৃঙ্খলে সারি সারি পাঁচ জন কয়েদীকে বাঁধিয়া রাখিলে তাহাকে সজীব যোগ বলা যায় না; কিন্তু আমাদের জীবনের এক দিনের সহিত অন্য দিনের, শৈশবের সহিত যৌবনের, যৌবনের সহিত বার্দ্ধক্যের যে যোগ তাহাই সজীব যোগ। তাহা একদিকে নিত্য অপরদিকে পরিবর্ত্তমান; সেই প্রাণময় পরিবর্দ্ধনশীল চেতনা-সূত্র অকাট্য; তাহার কোথাও বিচ্ছেদ কোথাও জড়ত্ব নাই।

আমাদের দেশের প্রাচীনকালের সহিত আধুনিককালের যদিও প্রথাগত বন্ধন আছে কিন্তু সজীব মানসিক যোগ নাই। এক জায়গায় কোথায় আমাদের মধ্যে এমন একটা নাড়ীর বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে যে, সে কাল হইতে মানসিক প্রাণরস অব্যাহতভাবে

প্রবাহিত হইয়া একাল পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছিতেছে না। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা কেমন করিয়া চিন্তা করিতেন, কার্য্য করিতেন, নব তত্ত্ব উদ্ভাবন করিতেন; তাহাদের সমস্ত শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ কাব্যকলা ধর্ম্মতত্ত্ব, রাজনীতি, সমাজতন্ত্রের মর্ম্মস্থলে তাঁহাদের জীবৎশক্তি তাঁহাদের চিৎশক্তি জাগ্রত থাকিয়া কি ভাবে সমস্তকে সর্ব্বদা সৃজন এবং সংযমন করিত, কি ভাবে প্রতিদিন বৃদ্ধি লাভ করিত পরিবর্ত্তন প্রাপ্ত হইত, আপনাকে কেমন করিয়া চতুর্দ্দিকে বিস্তার করিত, নূতন অবস্থাকে কেমন করিয়া আপনার সহিত সম্মিলিত করিত তাহা আমরা সম্যক্‌রূপে জানি না। মহাভারতের কাল এবং আমাদের বর্ত্তমান কালের মাঝখানকার অপরিসীম বিচ্ছেদকে আমরা পূরণ করিব কি দিয়া? যখন ভুবনেশ্বর ও কণারক মন্দিরের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হওয়া যায়, তখন মনে হয় এই আশ্চর্য্য শিল্পকৌশলগুলি কি বাহিরের কোন আকস্মিক আন্দোলনে কতকগুলি প্রস্তরময় বুদ্‌বুদের মত হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়াছিল? সেই শিল্পীদের সহিত আমাদের যোগ কোন্‌খানে? যাহারা এত অনুরাগ, এত ধৈর্য্য, এত নৈপুণ্যের সহিত এই সকল অভ্রভেদী সৌন্দর্য্য সৃজন করিয়া তুলিয়াছিল—আর আমরা যাহারা অর্দ্ধনিমীলিত উদাসীন চক্ষে সেই সকল ভুবনমোহিনী কীর্ত্তির এক একটি প্রস্তরখণ্ড খসিতে দেখিতেছি অথচ কোনটা যথাস্থানে পুনস্থাপন করিতে চেষ্টা করিতেছি না এবং পুনস্থাপন করিবার ক্ষমতাও রাখি না, আমাদের মাঝখানে এমন কি একটা মহাপ্রলয় ঘটিয়াছিল যাহাতে পূর্ব্বকালের কার্য্যকলাপ এখনকার কালের নিকট প্রহেলিকা বলিয়া প্রতীয়মান হয়—আমাদের জাতীয়-জীবন-ইতিহাসের মাঝখানের কয়েকখানি পাতা কে একেবারে ছিঁড়িয়া লইয়া গেল

যাহাতে আমরা তখনকার সহিত আপনাদিগের অর্থ মিলাইতে পারিতেছি না? এখন আমাদের নিকট বিধানগুলি রহিয়াছে কিন্তু সে বিধাতা নাই; শিল্পী নাই কিন্তু তাহাদের শিল্পনৈপুণ্যে দেশ আচ্ছন্ন হইয়া আছে। আমরা যেন কোন্ এক পরিত্যক্ত রাজধানীর ভগ্নাবশেষের মধ্যে বাস করিতেছি—সেই রাজধানীর ইষ্টক যেখানে খসিয়াছে আমরা সেখানে কেবল কর্দ্দম এবং গোময়পঙ্ক লেপন করিয়াছি—পুরী নির্ম্মাণ করিবার রহস্য আমাদের নিকট সম্পূর্ণ অবিদিত।

প্রাচীন পূর্ব্বপুরুষদের সহিত আমাদের এতই বিচ্ছেদ ঘটিয়া গেছে যে, তাঁহাদের সহিত আমাদের পার্থক্য উপলব্ধি করিবার ক্ষমতাও আমরা হারাইয়াছি। আমরা মনে করি, সেকালের ভারতবর্ষের সহিত এখনকার কালের কেবল নূতন পুরাতনের প্রভেদ। সেকালে যাহা উজ্জ্বল ছিল, এখন তাহা মলিন হইয়াছে, সেকালে যাহা দৃঢ় ছিল এখন তাহাই শিথিল হইয়াছে—অর্থাৎ আমাদিগকেই যদি কেহ সোনার জল দিয়া, পালিশ করিয়া, কিঞ্চিৎ ঝক্‌ঝকে করিয়া দেয় তাহা হইলেই সেই অতীত ভারতবর্ষ সশরীরে ফিরিয়া আসে। আমরা মনে করি, প্রাচীন হিন্দুগণ রক্তমাংসের মনুষ্য ছিলেন না, তাঁহারা কেবল সজীব শাস্ত্রের শ্লোক ছিলেন—তাঁহারা কেবল বিশ্বজগৎকে মায়া মনে করিতেন এবং সমস্ত দিন জপতপ করিতেন। তাঁহারা যে যুদ্ধ করিতেন, রাজ্যরক্ষা করিতেন, শিল্প চর্চ্চা ও কাব্যালোচনা করিতেন, সমুদ্র পার হইয়া বাণিজ্য করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে যে ভাল মন্দের সংঘাত ছিল, বিচার ছিল, বিদ্রোহ ছিল, মত বৈচিত্র্য ছিল—এক কথায়, জীবন ছিল, তাহা আমরা জ্ঞানে জানি বটে কিন্তু অন্তরে উপলব্ধি করিতে পারি না। প্রাচীন ভারতবর্ষকে কল্পনা করিতে গেলেই

নূতন পঞ্জিকার বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সংক্রান্তির মূর্ত্তিটি আমাদের মনে উদয় হয়।

এই আত্যন্তিক ব্যবধানের অন্যতম প্রধান কারণ এই যে, আমাদের দেশে তখন হইতে এখন পর্য্যন্ত সাহিত্যের মনোময় প্রাণময় ধারা অবিচ্ছেদে বহিয়া আসে নাই। সাহিত্যের যাহা কিছু আছে তাহা মাঝে মাঝে দূরে দূরে বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থিত। তখনকার কালের চিন্তাস্রোত ভাবস্রোত প্রাণস্রোতের আদিগঙ্গা শুকাইয়া গেছে, কেবল তাহার নদীখাতের মধ্যে মধ্যে জল বাধিয়া আছে—তাহা কোন একটি বহমান আদিম ধারার দ্বারা পরিপুষ্ট নহে, তাহার কতখানি প্রাচীন জল কতটা আধুনিক লোকাচারের বৃষ্টিসঞ্চিত, বলা কঠিন। এখন আমরা সাহিত্যের ধারা অবলম্বন করিয়া হিন্দুত্বের সেই বৃহৎ প্রবল নানাভিমুখী সচল তটগঠনশীল সজীবস্রোত বাহিয়া একাল হইতে সেকালের মধ্যে যাইতে পারি না। এখন আমরা সেই শুষ্কপথের মাঝে মাঝে নিজের অভিরুচি ও আবশ্যক অনুসারে পুষ্করিণী খনন করিয়া তাহাকে হিন্দুত্ব নামে অভিহিত করিতেছি। সেই বদ্ধ ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন হিন্দুত্ব আমাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি; তাহার কোনটা বা আমার হিন্দুত্ব, কোনটা বা তোমার হিন্দুত্ব; তাহা সেই কণ্ব কণাদ, রাঘব কৌরব, নন্দ উপনন্দ এবং আমাদের সর্ব্বসাধারণের তরঙ্গিত প্রবাহিত অখণ্ডবিপুল হিন্দুত্ব কিনা সন্দেহ।

এইরূপে সাহিত্যের অভাবে আমাদের মধ্যে পূর্ব্বাপরের সজীব যোগবন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেছে। কিন্তু সাহিত্যের অভাব ঘটিবার একটা প্রধান কারণ, আমাদের মধ্যে জাতীয়-যোগবন্ধনের অসদ্ভাব। আমাদের দেশে কনোজ কোশল কাশী কাঞ্চী প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র ভাবে আপন আপন পথে চলিয়া গিয়াছে,

এবং মাঝে মাঝে অশ্বমেধের ঘোড়া ছাড়িয়া দিয়া পরস্পরকে সংক্ষেপ করিতেও ছাড়ে নাই। মহাভারতের ইন্দ্রপ্রস্থ, রাজতরঙ্গিনীর কাশ্মীর, নন্দবংশীয়দের মগধ, বিক্রমাদিত্যের উজ্জয়িনী, ইহাদের মধ্যে জাতীয় ইতিহাসের কোন ধারাবাহিক যোগ ছিল না। সেইজন্য সম্মিলিত জাতীয় হৃদয়ের উপর জাতীয় সাহিত্য আপন অটল ভিত্তি স্থাপিত করিতে পারে নাই। বিচ্ছিন্ন দেশে বিচ্ছিন্নকালে গুণজ্ঞ রাজার আশ্রয়ে এক এক জন সাহিত্যকার আপন কীর্ত্তি স্বতন্ত্র ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। কালিদাস কেবল বিক্রমাদিত্যের, চাঁদবর্দ্দি কেবল পৃথ্বিরাজের, চাণক্য কেবল নন্দের। তাঁহারা তৎকালীন সমস্ত ভারতবর্ষের নহেন, এমন কি, তৎপ্রদেশেও তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী কোন যোগ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

সম্মিলিত জাতীয় হৃদয়ের মধ্যে যখন সাহিত্য আপন উত্তপ্ত সুরক্ষিত নীড়টি বাঁধিয়া বসে তখনি সে আপনার বংশ রক্ষা করিতে, ধারাবাহিকভাবে আপনাকে বহুদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত করিয়া দিতে পারে। সেই জন্য প্রথমেই বলিয়াছি সহিতত্বই সাহিত্যের প্রধান উপাদান; সে বিচ্ছিন্নকে এক করে, এবং যেখানে ঐক্য সেইখানে আপন প্রতিষ্ঠাভূমি স্থাপন করে। যেখানে একের সহিত অন্যের, কালের সহিত কালান্তরের, গ্রামের সহিত ভিন্ন গ্রামের বিচ্ছেদ, সেখানে ব্যাপক সাহিত্য জন্মিতে পারে না। আমাদের দেশে কিসে অনেক লোক এক হয়? ধর্ম্মে। সেই জন্য আমাদের দেশে কেবল ধর্ম্মসাহিত্যই আছে। সেই জন্য প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য কেবল শাক্ত এবং বৈষ্ণব কাব্যেরই সমষ্টি। রাজপুতগণকে বীরগৌরবে এক করিত, এই জন্য বীরগৌরব তাহাদের কবিদের গানের বিষয় ছিল। গ্রীক্‌গণ শিল্প-

চর্চ্চায়, জ্ঞানানুশীলনে, দেশরক্ষায়, রাজ্যচালনায়, আমোদ-প্রমোদে, সকল বিষয়েই একত্র হইতে জানিত, সেই জন্য প্রাচীন গ্রীস্ এমন সাহিত্যভূয়িষ্ঠ হইয়াছিল। রোমকেরা এবং ক্রমশঃ অধিকাংশ য়ুরোপীয় জাতিই সেই গ্রীসীয় প্রকৃতি লাভ করিয়া এমন বিচিত্র সাহিত্য এবং ঘনিষ্ঠ জাতীয় ঐক্য প্রাপ্ত হইয়াছে।

আমাদের ক্ষুদ্র বঙ্গদেশেও একটা সাধারণ সাহিত্যের হাওয়া উঠিয়াছে। ধর্ম্মপ্রচার হইতেই ইহার আরম্ভ। প্রথমে যাঁহারা ইংরাজী শিখিতেন তাঁহারা প্রধানতঃ আমাদের বণিক ইংরাজ-রাজের নিকট উন্নতি লাভের প্রত্যাশাতেই এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন; তাঁহাদের অর্থকরী বিদ্যা সাধারণের কোন কাজে লাগিত না। তখন সর্ব্বসাধারণকে এক শিক্ষায় গঠিত করিবার সঙ্কল্প কাহারও মাথায় উঠে নাই; তখন কৃতীপুরুষগণ যে যাহার আপন আপন পন্থা দেখিত।

বাঙ্গলার সর্ব্বসাধারণকে আপনাদের কথা শুনাইবার অভাব খৃষ্টীয় মিশনরিগণ সর্ব্বপ্রথমে অনুভব করেন,—এই জন্য তাঁহারা সর্ব্বসাধারণের ভাষাকে শিক্ষা-বহনের ও জ্ঞানবিতরণের যোগ্য করিয়া তুলিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

কিন্তু এ কার্য্য বিদেশীয়ের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে সম্ভবপর নহে। নব্যবঙ্গের প্রথম সৃষ্টিকর্ত্তা রাজা রামমোহন রায়ই প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গলা দেশে গদ্যসাহিত্যের ভূমিপত্তন করিয়া দেন।

ইতিপূর্ব্বে আমাদের সাহিত্য কেবল পদ্যেই বদ্ধ ছিল। কিন্তু রামমোহন রায়ের উদ্দেশ্যসাধনের পক্ষে পদ্য যথেষ্ট ছিল না। কেবল ভাবের ভাষা, সৌন্দর্য্যের ভাষা, রসজ্ঞের ভাষা নহে; যুক্তির ভাষা, বিবৃতির ভাষা, সর্ব্ববিষয়ের এবং সর্ব্বসাধারণের ভাষা তাঁহার আবশ্যক ছিল। পূর্ব্বে কেবল ভাবুকসভার জন্য পদ্য ছিল এখন জন-

সভার জন্য গদ্য অবতীর্ণ হইল। এই গদ্যপদ্যর সহযোগব্যতীত কখনও কোন সাহিত্য সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে পারে না। খাষ্ দরবার এবং আম্ দরবার ব্যতীত সাহিত্যের রাজ দরবার সরস্বতী মহারাণীর সমস্ত প্রজাসাধারণের উপযোগী হয় না। রামমোহন রায় আসিয়া সরস্বতীর সেই আম্ দরবারের সিংহদ্বার স্বহস্তে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিলেন।

আমরা আশৈশবকাল গদ্য বলিয়া আসিতেছি কিন্তু গদ্য যে কি দুরূহ ব্যাপার, তাহা আমাদের প্রথম গদ্যকারদের রচনা দেখিলেই বুঝা যায়। পদ্যে প্রত্যেক ছত্রের প্রান্তে একটি করিয়া বিশ্রামের স্থান আছে, প্রত্যেক দুই ছত্র বা চারি ছত্রের পর একটা করিয়া নিয়মিত ভাবের ছেদ পাওয়া যায়; কিন্তু গদ্যে একটা পদের সহিত আর একটা পদকে বাঁধিয়া দিতে হয়, মাঝে ফাঁক রাখিবার যো নাই; পদের মধ্যে কর্ত্তা কর্ম্ম ক্রিয়াকে এবং পদগুলিকে পরস্পরের সহিত এমন করিয়া সাজাইতে হয় যাহাতে গদ্যপ্রবন্ধের আদ্যন্ত-মধ্যে যুক্তিসম্বন্ধের নিবিড় যোগ ঘনিষ্ঠরূপে প্রতীয়মান হয়। ছন্দের একটা অনিবার্য্য প্রবাহ আছে; সেই প্রবাহের মাঝখানে একবার ফেলিয়া দিতে পারিলে কবিতা সহজে নাচিতে নাচিতে ভাসিয়া চলিয়া যায়; কিন্তু গদ্যে নিজে পথ দেখিয়া পায়ে হাঁটিয়া নিজের ভার সামঞ্জস্য করিয়া চলিতে হয়;—সেই পদ-ব্রজ বিদ্যাটি রীতিমত অভ্যাস না থাকিলে চাল্ অত্যন্ত আঁকাবাঁকা এলোমেলো এবং টল্‌মলে হইয়া থাকে। গদ্যের সুপ্রণালীবদ্ধ নিয়মটি আজকাল আমাদের অভ্যস্ত হইয়া গেছে, কিন্তু অনধিক-কাল পূর্ব্বে এরূপ ছিল না।

তখন যে গদ্য রচনা করাই কঠিন ছিল তাহা নহে—তখন লোকে অনভ্যাসবশতঃ গদ্য প্রবন্ধ সহজে বুঝিতে পারিত না।

দেখা যাইতেছে, পৃথিবীর আদিম অবস্থায় যেমন কেবল জল ছিল, তেমনি সর্ব্বত্রই সাহিত্যের আদিম অবস্থায় কেবল ছন্দতরঙ্গিতা প্রবাহশালিনী কবিতা ছিল। আমি বোধ করি, কবিতায় হ্রস্ব পদ, ভাবের নিয়মিত ছেদ, ও ছন্দ এবং মিলের ঝঙ্কারবশতঃ কথাগুলি অতি শীঘ্র মনে অঙ্কিত হইয়া যায় এবং শ্রোতাগণ তাহা সত্বর ধারণা করিতে পারে। কিন্তু ছন্দোবন্ধহীন বৃহৎকায় গদ্যের প্রত্যেক পদটি এবং পদের প্রত্যেক অংশটি পরস্পরের সহিত যোজনা করিয়া তাহার অনুসরণ করিয়া যাইতে বিশেষ একটা মানসিক চেষ্টার আবশ্যক করে। সেই জন্য রামমোহন রায় যখন বেদান্তসূত্র বাঙ্গলায় অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন, গদ্য বুঝিবার কি প্রণালী, তৎসম্বন্ধে ভূমিকা রচনা করা আবশ্যক বোধ করিয়াছিলেন। সেই অংশটি উদ্ধৃত করিতে ইচ্ছা করি।

"......এ ভাষায় গদ্যতে অদ্যাপি কোন শাস্ত্র কিম্বা কাব্য বর্ণনে আইসে না। ইহাতে এতদ্দেশীয় অনেক লোক অনভ্যাস-প্রযুক্ত দুই তিন বাক্যের অন্বয় করিয়া গদ্য হইতে অর্থ বোধ করিতে হঠাৎ পারেন না, ইহা প্রত্যক্ষ কানুনের তরজমার অর্থ-বোধের সময় অনুভব হয়।" অতঃপর কি করিলে গদ্যে বোধ জন্মে তৎসম্বন্ধে লেখক উপদেশ দিতেছেন।—"বাক্যের প্রারম্ভ আর সমাপ্তি এই দুইয়ের বিবেচনা বিশেষ মতে করিতে উচিত হয়। যে যে স্থানে যখন যাহা যেমন ইত্যাদি শব্দ আছে তাহার প্রতিশব্দ তখন তাহা সেইরূপ ইত্যাদিকে পূর্ব্বের সহিত অন্বিত করিয়া বাক্যের শেষ করিবেন। যাবৎ ক্রিয়া না পাইবেন তাবৎ পর্য্যন্ত বাক্যের শেষ অঙ্গীকার করিয়া অর্থ করিবার চেষ্টা না পাইবেন।" ইত্যাদি।

পুরাণ ইতিহাসে পড়া গিয়াছে, রাজগণ সহসা কোন ঋষির

তপোবনে অতিথি হইলে তাঁহারা যোগবলে মদ্যমাংসের সৃষ্টি করিয়া রাজা ও রাজানুচরবর্গকে ভোজন করাইতেন। বেশ দেখা যাইতেছে তপোবনের নিকট দোকানবাজারের সংস্রব ছিল না, এবং শালপত্রপুটে কেবল হরীতকী আমলকী সংগ্রহ করিয়া রাজ যোগ্য ভোজের আয়োজন করা যায় না—সেই জন্য ঋষিদিগকে তপঃপ্রভাব প্রয়োগ করিতে হইত। রামমোহন রায় যেখানে ছিলেন সেখানেও কিছুই প্রস্তুত ছিল না; গদ্য ছিল না, গদ্যবোধশক্তিও ছিল না;—যে সময়ে এ কথা উপদেশ করিতে হইত, যে, প্রথমের সহিত শেষের যোগ, কর্ত্তার সহিত ক্রিয়ার অন্বয় অনুসরণ করিয়া গদ্য পাঠ করিতে হয়, সেই আদিমকালে রামমোহন পাঠকদের জন্য কি উপহার প্রস্তুত করিতেছিলেন? বেদান্তসার, ব্রহ্মসূত্র, উপনিষৎ প্রভৃতি দুরূহ গ্রন্থের অনুবাদ। তিনি সর্ব্বসাধারণকে অযোগ্যজ্ঞান করিয়া তাহাদের হস্তে উপস্থিতমত সহজপ্রাপ্য আমলকী হরীতকী আনিয়া দিলেন না। সর্ব্বসাধারণের প্রতি তাঁহার এমন একটি আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল। আমাদের দেশে অধুনাতন কালের মধ্যে রামমোহন রায়ই সর্ব্বপ্রথমে মানবসাধারণকে রাজা বলিয়া জানিয়াছিলেন। তিনি মনে মনে বলিয়াছেন, সাধারণ নামক এই মহারাজকে আমি যথোচিত অতিথি সৎকার করিব—আমার অরণ্যে ইঁহার উপযুক্ত কিছুই নাই কিন্তু আমি কঠিন তপস্যার দ্বারা রাজভোগের সৃষ্টি করিয়া দিব।

কেবল পণ্ডিতদের নিকট পাণ্ডিত্য করা, জ্ঞানীদের নিকট খ্যাতি অর্জ্জন করা, রামমোহন রায়ের ন্যায় পরম বিদ্বান ব্যক্তির পক্ষে সুসাধ্য ছিল। কিন্তু তিনি পাণ্ডিত্যের নির্জ্জন অত্যুচ্চশিখর ত্যাগ করিয়া সর্ব্বসাধারণের ভূমিতলে অবতীর্ণ হইলেন

এবং জ্ঞানের অন্ন ও ভাবের সুধা সমস্ত মানবসভার মধ্যে পরিবেশন করিতে উদ্যত হইলেন।

এইরূপে বাঙ্গলাদেশে এক নূতন রাজার রাজত্ব, এক নূতন যুগের অভ্যুদয় হইল। নব্যবঙ্গের প্রথম বাঙ্গালী, সর্ব্বসাধারণকে রাজটীকা পরাইয়া দিলেন—এবং এই রাজার বাসের জন্য সমস্ত বাঙ্গলা দেশে বিস্তীর্ণ ভূমির মধ্যে সুগভীর ভিত্তির উপরে সাহিত্যকে সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। কালে কালে সেই ভিত্তির উপর নব নব তল নির্ম্মিত হইয়া সাহিত্যহর্ম্ম্য অভ্রভেদী হইয়া উঠিবে এবং অতীত ভবিষ্যতের সমস্ত বঙ্গহৃদয়কে স্থায়ী আশ্রয় দান করিতে থাকিবে অদ্য আমাদের নিকট ইহা দুরাশার স্বপ্ন বলিয়া মনে হয় না।

অতএব দেখা যাইতেছে বড় একটি উন্নত ভাবের উপর বঙ্গসাহিত্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যখন এই নির্ম্মাণকার্য্যের আরম্ভ হয় তখন বঙ্গভাষার না ছিল কোন যোগ্যতা, না ছিল সমাদর; তখন বঙ্গভাষা কাহাকে খ্যাতিও দিত না অর্থও দিত না; তখন বঙ্গভাষায় ভাব প্রকাশ করাও দুরূহ ছিল এবং ভাব প্রকাশ করিয়া তাহা সাধারণের মধ্যে প্রচার করাও দুঃসাধ্য ছিল। তাহার আশ্রয়দাতা রাজা ছিল না, তাহার উৎসাহদাতা শিক্ষিতসাধারণ ছিল না। যাঁহারা ইংরাজি চর্চ্চা করিতেন তাঁহারা বাঙ্গলাকে উপেক্ষা করিতেন এবং যাঁহারা বাঙ্গলা জানিতেন তাঁহারাও এই নূতন উদ্যমের কোন মর্য্যাদা বুঝিতেন না।

তখন বঙ্গসাহিত্যের প্রতিষ্ঠাতাদের সম্মুখে কেবল সুদূর ভবিষ্যৎ এবং সুবৃহৎ জনমণ্ডলী উপস্থিত ছিল—তাহাই যথার্থ সাহিত্যের স্থায়ী প্রতিষ্ঠা ভূমি; স্বার্থও নহে খ্যাতিও নহে, প্রকৃত সাহিত্যের ধ্রুব লক্ষ্যস্থল কেবল নিরবধিকাল এবং বিপুলা পৃথিবী।

সেই লক্ষ্য থাকে বলিয়াই সাহিত্য মানবের সহিত মানবকে, যুগের সহিত যুগান্তরকে প্রাণবন্ধনে বাঁধিয়া দেয়। বঙ্গসাহিত্যের উন্নতি ও ব্যাপ্তিসহকারে কেবল যে সমস্ত বাঙ্গালীর হৃদয় অন্তরতম যোগে বদ্ধ হইবে তাহা নহে,—এক সময় ভারতবর্ষের অন্যান্য জাতিকেও বঙ্গসাহিত্য আপন জ্ঞানান্ন বিতরণের অতিথিশালায়, আপন ভাবামৃতের অবারিত সদাব্রতে আকর্ষণ করিয়া আনিবে তাহার লক্ষণ এখন হইতেই অল্পে অল্পে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে।

এ পর্য্যন্ত বঙ্গসাহিত্যের উন্নতি জন্য যাঁহারা চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহারা একক ভাবেই কাজ করিয়াছেন। এককভাবে সকল কাজই কঠিন, বিশেষতঃ সাহিত্যের কাজ। কারণ, পূর্ব্বেই বলিয়াছি সাহিত্যের একটি প্রধান উপাদান সহিতত্ব। যে সমাজে জনসাধারণের মনের মধ্যে অনেকগুলি ভাব সঞ্চিত এবং সর্ব্বদা আন্দোলিত হইতেছে, যেখানে পরস্পরের মানসিক সংস্পর্শ নানা আকারে পরস্পর অনুভব করিতে পারিতেছে,—সেখানে সেই মনের সংঘাতে ভাব এবং ভাবের সংঘাতে সাহিত্য স্বতই জন্মগ্রহণ করে এবং চতুর্দ্দিকে সঞ্চারিত হইতে থাকে। এই মানবমনের সজীব সংশ্রব হইতে বঞ্চিত হইয়া কেবলমাত্র দৃঢ় সংকল্পের আঘাতে সঙ্গীহীন মনকে জনশূন্য কঠিন কর্ত্তব্যক্ষেত্রের মধ্য দিয়া চালনা করা, একলা বসিয়া চিন্তা করা, উদাসীনদের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার একান্ত চেষ্টা করা, সুদীর্ঘকাল একমাত্র নিজের অনুরাগের উত্তাপে নিজের ভাবপুষ্পগুলিকে প্রস্ফুটিত করিয়া তুলিবার প্রয়াস করা এবং চিরজীবনের প্রাণপণ উদ্যমের সফলতা সম্বন্ধে চিরকাল সন্দিহান হইয়া থাকা—এমন নিরানন্দের অবস্থা আর কি আছে! যে ব্যক্তি কাজ করিতেছে কেবল যে তাহারই কষ্ট তাহা নয় ইহাতে কাজেরও অসম্পূর্ণতা ঘটে।

এইরূপ উপবাসদশায় সাহিত্যের ফুলগুলিতে সম্পূর্ণ রং ধরে না, তাহার ফলগুলিতে পরিপূর্ণমাত্রায় পাক ধরিতে পায় না। সাহিত্যের সমস্ত আলোক ও উত্তাপ সর্ব্বত্র সর্ব্বতোভাবে সঞ্চারিত হইতে পারে না।

বৈজ্ঞানিকেরা বলেন পৃথিবীবেষ্টনকারী বায়ুমণ্ডলের একটি প্রধান কাজ, সূর্য্যালোককে ভাঙ্গিয়া বণ্টন করিয়া চারিদিকে যথাসম্ভব সমানভাবে বিকীর্ণ করিয়া দেওয়া। বাতাস না থাকিলে মধ্যাহ্ণ কালেও কোথাও বা প্রখর আলোক কোথাও বা নিবিড়তম অন্ধকার বিরাজ করিত।

আমাদের জ্ঞানরাজ্যের মনোরাজ্যের চারিদিকেও সেইরূপ একটা বায়ুমণ্ডলের আবশ্যকতা আছে। সমাজের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত করিয়া এমন একটা অনুশীলনের হাওয়া বহা চাই যাহাতে জ্ঞান এবং ভাবের রশ্মি চতুর্দ্দিকে প্রতিফলিত বিকীর্ণ হইতে পারে।

যখন বঙ্গদেশে প্রথম ইংরাজি শিক্ষা প্রচলিত হয়, যখন আমাদের সমাজে সেই মানসিক বায়ুমণ্ডল সৃজিত হয় নাই তখন সতরঞ্চের শাদা এবং কালো ঘরের মত শিক্ষা এবং অশিক্ষা পরস্পর সংলিপ্ত না হইয়া ঠিক পাশাপাশি বাস করিত। যাহারা ইংরাজি শিখিয়াছে এবং যাহারা শেখে নাই তাহারা সুস্পষ্টরূপে বিভক্ত ছিল—তাহাদের পরস্পরের মধ্যে কোন সংযোগ ছিল না, কেবল সংঘাত ছিল। শিক্ষিত ভাই আপন অশিক্ষিত ভাইকে মনের সহিত অবজ্ঞা করিতে পারিত কিন্তু কোন সহজ উপায়ে তাহাকে আপন শিক্ষার অংশ দান করিতে পারিত না।

কিন্তু দানের অধিকার না থাকিলে কোন জিনিষে পূরা অধিকার থাকে না। কেবল ভোগস্বত্ব এবং জীবনস্বত্ব নাবালক এবং স্ত্রীলোকের অসম্পূর্ণ অধিকার মাত্র। এক সময়ে আমাদের

ইংরাজি পণ্ডিতেরা মস্ত পণ্ডিত ছিলেন কিন্তু তাঁহাদের পাণ্ডিত্য তাঁহাদের নিজের মধ্যেই বদ্ধ থাকিত, দেশের লোককে দান করিতে পারিতেন না—এই জন্য সে পাণ্ডিত্য কেবল বিরোধ এবং অশান্তির সৃষ্টি করিত। সেই অসম্পূর্ণ পাণ্ডিত্যে কেবল প্রচুর উত্তাপ দিত কিন্তু যথেষ্ট আলোক দিত না।

এই ক্ষুদ্র সীমায় বদ্ধ ব্যাপ্তিহীন পাণ্ডিত্য কিছু অত্যুগ্র হইয়া উঠে; কেবল তাহাই নহে, তাহার প্রধান দোষ এই, যে, নবশিক্ষার মুখ্য এবং গৌণ অংশ সে নির্ব্বাচন করিয়া লইতে পারে না। সেই জন্য প্রথম প্রথম যাঁহারা ইংরাজি শিখিয়াছিলেন তাঁহারা চতুস্পার্শবর্ত্তীদের প্রতি অনাবশ্যক উৎপীড়ন করিয়াছিলেন এবং স্থির করিয়াছিলেন মদ্য মাংস ও মুখরতাই সভ্যতার মুখ্য উপকরণ।

চালের বস্তার চাল এবং কাঁকর পৃথক্ বাছিতে হইতে একটা পাত্রে সমস্ত ছড়াইয়া ফেলিতে হয়—তেমনি নবশিক্ষা অনেকের মধ্যে বিস্তারিত করিয়া না দিলে তাহার শস্য এবং কঙ্কর অংশ নির্ব্বাচন করিয়া ফেলা দুঃসাধ্য হইয়া থাকে। অতএব প্রথম প্রথম যখন নূতন শিক্ষায় সম্পূর্ণ ভাল ফল না দিয়া নানা প্রকার অসঙ্গত আতিশয্যের সৃষ্টি করে তখন অতিমাত্র ভীত হইয়া সে শিক্ষাকে রোধ করিবার চেষ্টা সকল সময়ে সদ্বিবেচনার কাজ নহে। যাহা স্বাধীনভাবে ব্যাপ্ত হইতে পারে তাহা আপনাকে আপনি সংশোধন করিয়া লয়, যাহা বদ্ধ থাকে তাহাই দূষিত হইয়া উঠে।

এই কারণে, ইংরাজি শিক্ষা যখন সঙ্কীর্ণ সীমায় নিরুদ্ধ ছিল তখন সেই ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে ইংরাজি সভ্যতার ত্যাজ্য অংশ সঞ্চিত হইয়া সমস্ত কলুষিত করিয়া তুলিতেছিল। এখন সেই শিক্ষা চারিদিকে বিস্তৃত হওয়াতেই তাহার প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে।

কিন্তু ইংরাজি শিক্ষা যে ইংরাজি ভাষা অবলম্বন করিয়া বিস্তৃত হইয়াছে তাহা নহে। বাঙ্গলা সাহিত্যই তাহার প্রধান সহায় হইয়াছে। ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙ্গালী এক সময়ে ইংরাজ রাজ্য স্থাপনের সহায়তা করিয়াছিল—ভারতবর্ষের মধ্যে বঙ্গসাহিত্য আজ ইংরাজি ভাবরাজ্য এবং জ্ঞানরাজ্য বিস্তারের প্রধান সহকারী হইয়াছে। এই বাঙ্গলা সাহিত্যযোগে ইংরাজিভাব যখন ঘরে বাহিরে সর্ব্বত্র সুগম হইল তখনই ইংরাজি সভ্যতার অন্ধ দাসত্ব হইতে মুক্তি লাভের জন্য আমরা সচেতন হইয়া উঠিলাম। ইংরাজি শিক্ষা এখন আমাদের সমাজে ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে এই জন্য আমরা স্বাধীনভাবে তাহার ভাল মন্দ ,তাহার মুখ্য গৌণ বিচারের অধিকারী হইয়াছি; এখন নানা চিত্ত নানা অবস্থায় তাহাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছে; এখন সেই শিক্ষার দ্বারা বাঙ্গালীর মন সজীব হইয়াছে এবং বাঙ্গালীর মনকে আশ্রয় করিয়া সেই শিক্ষাও সজীব হইয়া উঠিয়াছে।

আমাদের জ্ঞানরাজ্যের চতুর্দ্দিকে মানসিক বায়ুমণ্ডল এমনি করিয়া সৃজিত হয়। আমাদের মন যখন সজীব ছিল না তখন এই বায়ুমণ্ডলের অভাব আমরা তেমন করিয়া অনুভব করিতাম না, এখন আমাদের মানসপ্রাণ যতই সজীব হইয়া উঠিতেছে ততই এই বায়ুমণ্ডলের জন্য আমরা ব্যাকুল হইতেছি।

এতদিন আমাদিগকে জলমগ্ন ডুবারীর মত ইংরাজি সাহিত্যাকাশ হইতে নলে করিয়া হাওয়া আনাইতে হইত। এখনো সে নল সম্পূর্ণ ত্যাগ করিতে পারি নাই। কিন্তু অল্পে অল্পে আমাদের জীবনসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চারিদিকে সেই বায়ুসঞ্চারও আরম্ভ হইয়াছে। আমাদের দেশীয় ভাষার দেশীয় সাহিত্যের হাওয়া উঠিয়াছে।

যতক্ষণ বাঙ্গলা দেশে সাহিত্যের সেই হাওয়া বহে নাই, সেই

আন্দোলন উপস্থিত হয় নাই; যতক্ষণ বঙ্গসাহিত্য এক একটি স্বতন্ত্র সঙ্গীহীন প্রতিভাশিখর আশ্রয় করিয়া বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিতি করিতেছিল, ততক্ষণ তাহার দাবী করিবার বিষয় বেশি কিছু ছিল না। ততক্ষণ কেবল বলবান্ ব্যক্তিগণ তাহাকে নিজ বীর্য্যবলে নিজ বাহুযুগলের উপর ধারণপূর্ব্বক পালন করিয়া আসিতেছিলেন। এখন সে সাধারণের হৃদয়ের মধ্যে আসিয়া বাসস্থান স্থাপন করিয়াছে - এখন বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বত্রই সে অবাধিত অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে। এখন অন্তঃপুরেও সে পরিচিত আত্মীয়ের ন্যায় প্রবেশ করে এবং বিদ্বৎসভাতেও সে সমাদৃত অতিথির ন্যায় আসন প্রাপ্ত হয়। এখন, যাঁহারা ইংরাজিতে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন তাঁহারা বাঙ্গলা ভাষায় ভাব প্রকাশ করাকে গৌরব জ্ঞান করেন; এখন অতিবড় বিলাতী-বিদ্যাভিমানীও বাঙ্গলা পাঠকদিগের নিকট খ্যাতি অর্জ্জন করাকে আপন চেষ্টার অযোগ্য বোধ করেন না।

প্রথমে যখন ইংরাজি শিক্ষার প্রবাহ আমাদের সমাজে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন কেবল বিলাতী বিদ্যার একটা বালীর চর বাঁধিয়া দিয়াছিল;—সে বালুকারাশি পরস্পর অসংসক্ত, তাহার উপরে না আমাদের স্থায়ী বাসস্থান নির্ম্মাণ করা যায়, না তাহা সাধারণের প্রাণধারণযোগ্য শস্য উৎপাদন করিতে পারে। অবশেষে তাহারই উপরে যখন বঙ্গসাহিত্যের পলিমৃত্তিকা পড়িল তখন যে কেবল দৃঢ় তট বাঁধিয়া গেল, তখন যে কেবল বাঙ্গলার বিচ্ছিন্ন মানবেরা একত্র হইবার উপক্রম করিল তাহা নহে, তখন বাঙ্গলা হৃদয়ের চিরকালের খাদ্য এবং আশ্রয়ের উপায় হইল। এখন এই জীবনশালিনী জীবনদায়িনী মাতৃভাষা সন্তান-সমাজে আপন অধিকার প্রার্থনা করিতেছে।

সেই জন্যই আজ উপযুক্ত কালে এক সময়োচিত আন্দোলন স্বতই উদ্ভূত হইয়াছে। কথা উঠিয়াছে, আমাদের বিদ্যালয়ে অধিকতর পরিমাণে বাঙ্গলা শিক্ষা প্রচলিত হওয়া আবশ্যক।

কেন আবশ্যক? কারণ, ইংরাজি শিক্ষা দ্বারা আমাদের হৃদয়ে যে আকাঙ্ক্ষা যে অভাবের সৃষ্টি হইয়াছে বাঙ্গলা ভাষা ব্যতীত তাহা পূরণ হইবার সম্ভাবনা নাই। ইংরাজি শিখিয়া যদি কেবল সাহেবের চাকৃরি ও আপিসের কেরাণীগিরি করিয়াই আমরা সন্তুষ্ট থাকিতাম তাহা হইলে কোন কথাই ছিল না। কিন্তু ইংরাজি শিক্ষায় আমাদের মনে যে কর্ত্তব্যের আদর্শ স্থাপিত করিয়াছে তাহা লোকহিত। জনসাধারণের নিকটে আপনাকে কর্ম্মপাশে বদ্ধ করিতে হইবে, সকলকে শিক্ষা বিতরণ করিতে হইবে, সকলকে ভাবরসে সরস করিতে হইবে, সকলকে জাতীয় বন্ধনে যুক্ত করিতে হইবে।

দেশীয় ভাষা ও দেশীয় সাহিত্যের অবলম্বন ব্যতীত এ কার্য্য কথনই সিদ্ধ হইবার নহে। আমরা পরের হস্ত হইতে যাহা গ্রহণ করিয়াছি দান করিবার সময় নিজের হস্ত দিয়া তাহা বণ্টন করিতে হইবে।

ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে, সর্ব্বসাধারণের নিকট নিজের কর্ত্তব্য পালন করিবার, যাহা লাভ করিয়াছি তাহা সাধারণের জন্য সঞ্চয় করিবার, যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছি তাহা সাধারণের সমক্ষে প্রমাণ করিবার, যাহা ভোগ করিতেছি তাহা সাধারণের মধ্যে বিতরণ করিবার আকাঙ্ক্ষা আমাদের মনে উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু অদৃষ্টদোষে সেই আকাঙ্ক্ষা মিটাইবার উপায় এখনও আমাদের পক্ষে যথেষ্ট সুলভ হয় নাই। আমরা ইংরাজি বিদ্যালয় হইতে উদ্দেশ্য শিক্ষা করিতেছি কিন্তু উপায় লাভ করিতেছি না।

কেহ কেহ বলেন বিদ্যালয়ে বাঙ্গলা প্রচলনের কোন আবশ্যক নাই; কারণ, এ পর্য্যন্ত ইংরাজিশিক্ষিত ব্যক্তিগণ নিজের অনুরাগেই বাঙ্গলা সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছেন, বাঙ্গলা শিখিবার জন্য তাঁহাদিগকে অতিমাত্র চেষ্টা করিতে হয় নাই।

কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সময়ের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখন *কেবল ক্ষমতাশালী লেখকের উপর বাঙ্গলা সাহিত্য নির্ভর করি-*তেছে না, এখন তাহা সমস্ত শিক্ষিত সাধারণের সামগ্রী। এখন প্রায় কোন-না-কোন উপলক্ষে বাঙ্গলা ভাষায় ভাব প্রকাশের জন্য শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই উপর সমাজের দাবী দেখা যায়। কিন্তু সকলের শক্তি সমান নহে; অশিক্ষা ও অনভ্যাসের সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া আপনার কর্ত্তব্য পালন সকলের পক্ষে সম্ভব নহে। এবং বাঙ্গলা অপেক্ষাকৃত অপরিণত ভাষা বলিয়াই তাহাকে কাজে লাগাইতে হইলে সবিশেষ শিক্ষা এবং নৈপুণ্যের আবশ্যক করে।

প্রচলিত পদ্ধতিতে যেমন করিয়া ইংরাজি শিক্ষা দেওয়া হয় তাহাতে ছাত্রদের সমস্ত অবসর এবং সেই সঙ্গে সমস্ত উৎসাহ ও স্বাধীন চেষ্টার উদ্যম শোষণ করিয়া লয়। বৃক্ষের চারিদিকে আকাশের ন্যায় শিক্ষার চারিদিকে খানিকটা অবকাশের আবশ্যক করে;—এমন খানিকটা অবসর ও শক্তি থাকা চাই যাহা অবলম্বন করিয়া নবলব্ধ শিক্ষা সম্যক্‌রূপে আলোচিত প্রসারিত পরীক্ষিত হইতে পারে; কিন্তু বাঙ্গালীর ছেলেকে যখন কেবল ইংরাজি ভাষামাত্র নহে পরন্তু সমস্ত পাঠ্য বিষয়গুলিকেও ইংরাজিতে শিক্ষা করিতে হয় তখন তাহার অবকাশ এবং শক্তির শেষ সূচ্যগ্র ভূমি পর্য্যন্ত ছাড়িয়া দিতে হয়। অপরিচিত ভাষা এবং অপরিচিত বিষয় এই উভয় দৈত্যের দ্বারা একই সময়ে দক্ষিণে

বামে আক্রান্ত হইয়া বাঙ্গালীর ছেলের চিন্তা করিবার অবসরমাত্র থাকে না, কেবল সে অন্ধভাবে প্রাণপণ করিয়া যুঝিতে থাকে। অন্ততঃ যদি এণ্ট্রেন্স্ ক্লাস্ পর্য্যন্তও বাঙ্গলা ভাষায় বিষয় শিক্ষা ও ইংরাজিকে স্বতন্ত্র শিক্ষণীয় বিষয়স্বরূপে গণ্য করা হয় তবে ছাত্রগণ প্রকৃতরূপে শিক্ষা করিবার অবকাশ পায় এবং শিক্ষা সমাপনের পর স্বদেশের হিতসাধন ও জীবনের মহৎকর্ত্তব্য পালনের উপায় তাহাদের নিকট সুগম করিয়া দেওয়া হয়।

এখন বাঙ্গলা খবরের কাগজ, মাসিক পত্র,সভাসমিতি, আত্মীয়সমাজ সর্ব্বত্র হইতেই বঙ্গভূমি তাহার শিক্ষিত সন্তানদিগকে বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে আহ্বান করিতেছে। যাহারা প্রস্তুত নহে যাহারা অক্ষম, তাহারা কিছু-না-কিছু সঙ্কোচ অনুভব করিতেছে। অসাধারণ নির্লজ্জ না হইলে আজ কাল বাঙ্গলা ভাষার অজ্ঞতা লইয়া আস্ফালন করিতে কেহ সাহস করে না। এক্ষণে আমাদের বিদ্যালয় যদি ছাত্রদিগকে আমাদের বর্ত্তমান আদর্শের উপযোগী না করিয়া তোলে, আমাদের সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন হিতসাধনে সক্ষম না করে, যে বিদ্যা আমাদিগকে অর্পণ করে সঙ্গে সঙ্গে তাহার দানাধিকার যদি আমাদিগকে না দেয়, আমাদের পরমাত্মীয়দিগকে বুভুক্ষিত দেখিয়াও সে বিদ্যা পরিবেশন করিবার শক্তি যদি আমাদের না থাকে—তবে এমন বিদ্যালয় আমাদের বর্ত্তমানকাল ও অবস্থার পক্ষে অত্যন্ত অসম্পূর্ণ তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা অভাবে ছাত্রগণ যে বাঙ্গলা সমাজের জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হইতে পারিতেছে না, কেবল তাহাই নহে, তাহাদের নূতন শিক্ষাও সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতেছে না। কথন কথন আমাদের ইংরাজ শিক্ষকগণও আক্ষেপ করিয়া থাকেন যে, আমাদের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ইংরাজি ও বাঙ্গলায় যে সকল প্রবন্ধ

রচনা করেন অনেক সময় তাহাতে চিন্তা ও ভাবের অকিঞ্চিৎ-করতা লক্ষিত হয়; স্পষ্টই বুঝা যায় আমাদের শিক্ষিত বিদ্যাকে আমরা নিজের মনের চিন্তায় পরিণত করিতে কোন কালে অভ্যাস করি নাই—সে গুলিকে বলপূর্ব্বক অশ্রুসিক্ত চক্ষে সমগ্র গলাধঃ-করণ করিয়াছি। কিন্তু পরকীয় বিদ্যাকে স্বকীয় চিন্তায় পরিণত করিতে হইলে মাঝখানে স্বদেশীয় ভাষা আবশ্যক। বিশ্ববিদ্যা-লয়ের পাকশালায় ছত্রিশ অধ্যাপকে মিলিয়া ছত্রিশ বিদ্যার ব্যঞ্জন রন্ধন করিতে পারেন, কিন্তু নিজের হৃৎপিণ্ডের নিকটবর্ত্তী আজন্ম-কালীন পাকযন্ত্রটির মধ্যে তাহাকে পুনশ্চ পাক করিয়া লইলে তবেই সে যথার্থ আপনার হয়। আমরা রসনায় ইংরাজি বিদ্যার বিচিত্র আস্বাদ পাইতেছি সন্দেহ নাই কিন্তু যতক্ষণে তাহা বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের নাড়ীতে নাড়ীতে উত্তপ্ত রক্তরূপে প্রবাহিত না হয় ততক্ষণ, সে বিদ্যা যে হজম হইয়াছে তাহার কোন প্রমাণ নাই।

যেমন মাছ ধরিবার সময় দেখা যায়, অনেক মাছ যতক্ষণ বঁড়-শিতে বিদ্ধ হইয়া জলে খেলাইতে থাকে ততক্ষণ তাহাকে ভারি-মস্ত মনে হয়, কিন্তু ডাঙ্গায় টান মারিয়া তুলিলেই প্রকাশ হইয়া পড়ে যত বড়টা মনে করিয়াছিলাম তত বড়টা নহে; যেমন রচনা-কালে দেখা যায় একটা ভাব যতক্ষণ মনের মধ্যে অস্ফুট অপরিণত আকারে থাকে ততক্ষণ সেটাকে অত্যন্ত বিপুল এবং নূতন মনে হয় কিন্তু ভাষায় প্রকাশ করিতে গেলেই তাহা দুটো কথায় শেষ হইয়া যায় এবং তাহার নূতনত্বের উজ্জ্বলতাও দেখিতে পাওয়া যায় না—যেমন স্বপ্নে অনেক ব্যাপারকে অপরিসীম বিস্ময়জনক এবং বৃহৎ মনে হয় কিন্তু জাগরণমাত্রেই তাহা তুচ্ছ এবং ক্ষুদ্র আকার ধারণ করে তেমনি পরের শিক্ষাকে যতক্ষণে নিজের ডাঙ্গায় না টানিয়া তোলা যায় ততক্ষণ আমরা বুঝিতেই পারি না বাস্তবিক

কতখানি আমরা পাইয়াছি। আমাদের অধিকাংশ বিদ্যাই বঁড়শি-গাঁথা মাছের মত ইংরাজি ভাষার সুগভীর সরোবরের মধ্যে খেলাইয়া বেড়াইতেছে, আন্দাজে তাহার গুরুত্ব নির্ণয় করিয়া খুব পুলকিত গর্ব্বিত হইয়া উঠিয়াছি। যদি বঙ্গভাষার কূলে একবার টানিয়া তুলিতে পারিতাম তাহা হইলে সম্ভবতঃ নিজের বিদ্যাটাকে তত বেশি বড় না দেখাইতেও পারিত; নাই দেখাক্, তবু সেটা ভোগে লাগিত এবং আয়তনে ছোট হইলেও আমাদের কল্যাণ-রূপিণী গৃহলক্ষ্মীর স্বহস্তকৃত রন্ধনে, অমিশ্র অনুরাগ এবং বিশুদ্ধ শর্ষপ তৈল সহযোগে পরম উপাদেয় হইতে পারিত।

বাইবেলে কথিত আছে, যাহার নিজের কিছু আছে তাহাকেই দেওয়া হইয়া থাকে। যে লোক একেবারে রিক্ত তাহার পক্ষে কিছু গ্রহণ করা বড় কঠিন। জলাশয়েই বৃষ্টির জল বাধিয়া থাকে, শুষ্ক মরুভূমে তাহা দাঁড়াইবে কোথায়? আমরা নূতন বিদ্যাকে গ্রহণ করিব সঞ্চিত করিব কোন্‌খানে? যদি নিজের শুষ্ক স্বার্থ এবং ক্ষণিক আবশ্যক ও ভোগের মধ্যে সে প্রতিক্ষণে শোষিত হইয়া যায় তবে সে শিক্ষা কেমন করিয়া ক্রমশঃ স্থায়িত্ব ও গভীরতা লাভ করিবে, সরস্বতীর সৌন্দর্য্যশতদলে প্রফুল্ল হইয়া উঠিবে, আপনার তটভূমিকে স্নিগ্ধ শ্যামল, আকাশকে প্রতিফলিত, বহু-কাল ও বহুলোককে আনন্দে ও নির্ম্মলতায় অভিষিক্ত করিয়া তুলিবে?

বঙ্গসাহিত্যের পক্ষে আরও একটি কথা বলিবার আছে। আলোচনা ব্যতীত কোন শিক্ষা সজীবভাবে আপনার হয় না। নানা মানব মনের মধ্য দিয়া গড়াইয়া না আসিলে একটা শিক্ষার বিষয় মানব সাধারণের যথার্থ ব্যবহারযোগ্য হইয়া উঠে না। যে দেশে বিজ্ঞানশাস্ত্রের আলোচনা বহুকাল হইতে প্রচলিত

আছে সে দেশে বিজ্ঞান অন্তরে বাহিরে আচারে ব্যবহারে ভাষায় ভাবে সর্ব্বত্র সংলিপ্ত হইয়া গেছে। সে দেশে বিজ্ঞান একটা অপরিচিত শুষ্ক জ্ঞান নহে, তাহা মানব মনের সহিত মানব জীবনের সহিত সজীবভাবে নানা আকারে মিশ্রিত হইয়া আছে। এই জন্য সে দেশে অতি সহজেই বিজ্ঞানের অনুরাগ অকৃত্রিম হয়, বিজ্ঞানের ধারণা গভীরতর হইয়া থাকে। নানা মনের মধ্যে অবিশ্রাম সঞ্চরিত হইয়া সেখানে বিজ্ঞান প্রাণ পাইয়া উঠে। যে দেশে সাহিত্য চর্চ্চা প্রাচীন ও পরিব্যাপ্ত সে দেশে সাহিত্য কেবল গুটিকতক লোকের সখের মধ্যে বদ্ধ নহে। তাহা সমাজের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সহিত প্রবাহিত, তাহা দিনে নিশীথে মনুষ্যজীবনের সহিত নানা ভাবে নানা আকারে মিশ্রিত হইতেছে এই জন্য সাহিত্যানুরাগ সেখানে সহজ, সাহিত্যবোধ স্বাভাবিক। আমাদের দেশে বিদ্বান লোকদের মধ্যে বিদ্যার আলোচনা যথেষ্ট নাই এবং বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিকালের পূর্ব্বে অতি যৎসামান্যই ছিল।

কারণ, দেশীয় সাহিত্যের সম্যক্ বিস্তার অভাবে অনেকের মধ্যে কোন বিষয়ের আলোচনা অসম্ভব, এবং আলোচনা অভাবে বিদ্বান ব্যক্তিগণ চতুর্দ্দিক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কেবল নিজের মধ্যেই বদ্ধ। তাঁহাদের জ্ঞানবৃক্ষ চারিদিকের মানব মন হইতে যথেষ্ট পরিমাণে জীবনরস আকর্ষণ করিয়া লইতে পারে না।

আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে হাস্যলেশহীন একটা সুগভীর নিরানন্দ দেখিতে পাওয়া যায়, উপরোক্ত অভাব তাহার অন্যতম কারণ। কি করিয়া কালযাপন করিতে হইবে আমরা ভাবিয়া পাই না। আমরা সকালবেলায় চুপ করিয়া দ্বারের কাছে বসিয়া তামাক খাই, দ্বিপ্রহরে আপিসে যাই, সন্ধ্যাবেলায় ফিরিয়া আসিয়া তাস খেলি। সমাজের মধ্যে এমন একটা সর্ব্বব্যাপী প্রবাহ

নাই যাহাতে আমাদিগকে ভাসাইয়া রাখে, যাহাতে আমাদিগকে এক সঙ্গে টানিয়া লইয়া যাইতে পারে। আমরা যে যার আপন আপন ঘরে উঠিতেছি বসিতেছি গড়াইতেছি এবং যথাকালে—অধিকাংশতই অকালে—মরিতেছি। ইহার প্রধান কারণ, আমরা বিচ্ছিন্ন। আমাদের শিক্ষার সহিত সমাজের, আদর্শের সহিত চরিত্রের, ভাবের সহিত কার্য্যের, আপনার সহিত চতুর্দ্দিকের সর্ব্বাঙ্গীন মিশ খায় নাই। আমরা বীরত্বের ইতিহাস জানি কিন্তু বীর্য্য কাহাকে বলে জানি না, আমরা সৌন্দর্য্যের সমালোচনা অনেক পড়িয়াছি কিন্তু চতুর্দ্দিকে সৌন্দর্য্য রচনা করিবার কোন ক্ষমতা নাই; আমরা অনেক ভাব অনুভব করিতেছি কিন্তু অনেকের সহিত ভাগ করিয়া ভোগ করিব এমন লোক পাইতেছি না। এই সকল মনোরুদ্ধ ভাব সকল ক্রমশঃ বিকৃত ও অস্বাভাবিক হইয়া যায়। তাহা ক্রমে অলীক আকার ধারণ করে। অন্যদেশে যাহা একান্ত সত্য আমাদের দেশে তাহা অন্তঃসারশূন্য হাস্যকর আতিশয্যে পরিণত হইয়া উঠে।

হিমালয়ের মাথার উপরে যদি উত্তরোত্তর কেবলি বরফ জমিতে থাকিত তবে ক্রমে তাহা অতি বিপর্য্যয় অদ্ভুত এবং পতনোন্মুখ উচ্চতা লাভ করিত এবং তাহা ন দেবায় ন ধর্ম্মায় হইত—কিন্তু সেই বরফ নির্ঝররূপে গলিয়া প্রবাহিত হইলে হিমালয়েরও অনাবশ্যক ভার লাঘব হয় এবং সেই সজীব ধারায় সুদূরপ্রসারিত তৃষাতুর ভূমি সরস শস্যশালী হইয়া উঠে—ইংরাজি বিদ্যা যতক্ষণ বদ্ধ থাকে ততক্ষণ তাহা সেই জড় ·অচল বরফভারের মত—দেশীয় সাহিত্যযোগে তাহা বিগলিত প্রবাহিত হইলে তবে সেই বিদ্যারও সার্থকতা হয়, বাঙ্গালীর ছেলের মাথারও ঠিক থাকে এবং স্বদেশের তৃষাও নিবারিত হয়। অবরুদ্ধ ভাবগুলি অনেকের মধ্যে

ছড়াইয়া গিয়া তাহার আতিশয্যবিকার দূর হইতে থাকে। যে সকল ইংরাজি ভাব যথার্থরূপে আমাদের দেশের লোক গ্রহণ করিতে পারে—অর্থাৎ যাহা বিশেষরূপে ইংরাজি নহে, যাহা সার্ব্ব-ভৌমিক,—তাহাই থাকিয়া যায় এবং বাকি সমস্ত নষ্ট হইতে থাকে। আমাদের মধ্যে একটা মানসিক প্রবাহ উৎপন্ন হয়—সাধারণের মধ্যে একটা আদর্শের এবং আনন্দের ঐক্য জাগিয়া উঠে, বিদ্যার পরীক্ষা হয়, ভাবের আদান প্রদান চলে; ছাত্রগণ বিদ্যালয়ে যাহা শেখে বাড়িতে আসিয়া তাহার অনুবৃত্তি দেখিতে পায়, এবং বয়স্কসমাজে প্রবেশ করিবার সময় বিদ্যাভারকে বিদ্যালয়ের বহির্দ্বারে ফেলিয়া আসা আবশ্যক হয় না। এই যে স্কুলের সহিত গৃহের সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ, ছাত্রবয়সের সহিত কর্ম্মকালের সম্পূর্ণ ব্যবধান, নিজের সহিত আত্মীয়ের সম্পূর্ণ ভিন্ন শিক্ষা, এরূপ অস্বাভাবিক অবস্থা দূর হইয়া যায়; দেশীয় সাহিত্যের সংযো-জনীশক্তি প্রভাবে বাঙ্গালী আপনার মধ্যে আপনি ঐক্যলাভ করে—তাহার শিক্ষাও সম্পূর্ণ হইতে পারে তাহার জীবনও সফলতা প্রাপ্ত হয়।

কিন্তু এখনো আমাদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন যাঁহারা বাঙ্গালী ছাত্রদিগকে অধিকতর পরিমাণে বাঙ্গলা শিখাইবার আব-শ্যকতা অনুভব করেন না—এমন কি, সে প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেন। যদি তাঁহাদিগকে স্পষ্ট করিয়া জিজ্ঞাসা করা যায়, যে, আমরা যে দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি সেই দেশের ভাষায় আমা-দের নবলব্ধ জ্ঞান বিস্তার করিবার, আমাদের নবজাত ভাব প্রকাশ করিবার ক্ষমতা ন্যূনাধিক পরিমাণে আমাদের সকলেরই আয়ত্ত থাকা উচিত কি না—তাঁহারা উত্তর দেন উচিত; কিন্তু তাঁহাদের মতে, সে জন্য বিশেষরূপে প্রস্তুত হইবার আবশ্যকতা নাই;

তাঁহারা বলেন ইচ্ছা করিলেই বাঙ্গালীর ছেলেমাত্রই বাঙ্গলা শিখিতে ও লিখিতে পারে।

কিন্তু ইচ্ছা জন্মিবে কেন? সকলেই জানেন, পরিচয়ের পর যে সকল বিষয়ের প্রতি আমাদের পরম অনুরাগ জন্মিয়া থাকে, পরিচয় হইবার পূর্ব্বে তাহাদের প্রতি অনেক সময় আমাদের বৈমুখভাব থাকা অসম্ভব নহে। অনুরাগ জন্মিবার একটা অবসর দেওয়াও কর্ত্তব্য;—এবং পূর্ব্ব হইতে পথকে কিয়ৎপরিমাণেও সুগম করিয়া রাখিলে কর্ত্তব্যবুদ্ধি সহজেই তদভিমুখে ধাবিত হইতে পারে। সম্মুখে একেবারে অনভ্যস্ত পথ দেখিলে কর্ত্তব্য-ইচ্ছা স্বভাবতই উদ্বোধিত হইতে চাহে না।

কিন্তু, বৃথা এ সকল যুক্তি প্রয়োগ করা! আমাদের মধ্যে এমন এক দল লোক আছেন বাঙ্গালার প্রতি যাঁহাদের অনুরাগ, রুচি এবং শ্রদ্ধা নাই; তাঁহাদিগকে যেমন করিয়া যে দিকেই ফিরান যায় তাঁহাদের কম্পাসের কাঁটা ইংরাজির দিকেই ঘুরিয়া বসে। তাঁহারা অনেকে ইংরাজি আহার এবং পরিচ্ছদকে বিজাতীয় বলিয়া ঘৃণা করেন;—তাঁহারা আমাদের জাতির বাহ্য শরীরকে বিলাতী অশন বসনের সহিত সংসক্ত দেখিতে চাহেন না,—কিন্তু সমস্ত জাতির মনঃশরীরকে বিদেশীয় ভাষার পরিচ্ছদে মণ্ডিত এবং বিজাতীয় সাহিত্যের আহার্য্যে পরিবর্দ্ধিত দেখিতে তাঁহাদের আক্ষেপ বোধ হয় না। শরীরের সহিত বস্ত্র তেমন করিয়া সংলিপ্ত হয় না, মনের সহিত ভাষা যেমন করিয়া জড়িত হইয়া যায়। যাঁহারা আপন সন্তানকে তাহার মাতৃভাষা শিখিবার অবসর দেন না, যাঁহারা পরমাত্মীয়দিগকেও ইংরাজি ভাষায় পত্র লিখিতে লজ্জা বোধ করেন না, যাঁহারা "পদ্মবনে মত্তকরীসম" বাঙ্গলা ভাষার বানান এবং ব্যাকরণ ক্রীড়াচ্ছলে পদদলিত করিতে পারেন

অথচ ভ্রমক্রমে ইংরাজির ফোঁটা অথবা মাত্রার বিচ্যুতি ঘটিলে ধরণীকে দ্বিধা হইতে বলেন, যাঁহাদিগকে বাঙ্গলায় হস্তীমূর্খ বলিলে অবিচলিত থাকেন কিন্তু ইংরাজিতে ইগ্নোরেণ্ট্ বলিলে মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হন, তাঁহাদিগকে এ কথা বুঝান কঠিন, যে, তাঁহারা ইংরাজি শিক্ষার সন্তোষজনক পরিণাম নহেন।

কিন্তু ইংরাজি-অভিমানী, মাতৃভাষাদ্বেষী বাঙ্গালীর ছেলেকে আমরা দোষ দিতে চাহি না। ইংরাজির প্রতি এই উৎকট পক্ষপাত স্বাভাবিক। কারণ, ইংরাজি ভাষাটা একে রাজার ঘরের মেয়ে, তাহাতে আবার তিনি আমাদের দ্বিতীয় পক্ষের সংসার—তাঁহার আদর যে অত্যন্ত বেশি হইবে তাহাতে বিচিত্র নাই। তাঁহার যেমন রূপ তেমনি ঐশ্বর্য্য—আবার তাঁহার সম্পর্কে আমাদের রাজপুত্রদের ঘরেও আমরা কিঞ্চিৎ সম্মানের প্রত্যাশা রাখি। সকলেই অবগত আছেন ইহাঁর প্রসাদে উক্ত যুবরাজদের প্রাসাদ-দ্বারপ্রান্তে আমরা কখন কখন স্থান পাইয়া থাকি; আবার কখন কখন কর্ণপীড়নও লাভ হয়—সেটাকে আমরা পরিহাসের স্বরূপ উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করি কিন্তু চক্ষু দিয়া অশ্রুধারা বিগলিত হইয়া পড়ে।

আর আমাদের হতভাগিনী প্রথম পক্ষটি—আমাদের দরিদ্র বাঙ্গলা ভাষা-পাকশালার কাজ করেন—সে কাজটি নিতান্ত সামান্য নহে, তেমন আবশ্যকীয় কাজ আর আমাদের আছে কি না সন্দেহ কিন্তু তাঁহাকে আমাদের আপনার বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা করে। পাছে তাঁহার মলিন বসন লইয়া তিনি আমাদের ধনশালী নব কুটুম্বদের চক্ষে পড়েন এই জন্য তাঁহাকে গোপন করিয়া রাখি;—প্রশ্ন করিলে বলি, চিনি না!

সে দরিদ্র ঘরের মেয়ে। তাহার বাপের রাজত্ব নাই। সে

সম্মান দিতে পারে না, সে কেবলমাত্র ভালবাসা দিতে পারে। তাহাকে যে ভালবাসে তাহার পদবৃদ্ধি হয় না, তাহার বেতনের আশা থাকে না, রাজদ্বারে তাহার কোন পরিচয় প্রতিপত্তি নাই। কেবল যে অনাথাকে সে ভালবাসে সেই তাহাকে গোপনে ভালবাসার পূর্ণ প্রতিদান দেয়। এবং সেই ভালবাসার যথার্থ স্বাদ যে পাইয়াছে সে জানে, যে, পদমান প্রতিপত্তি এই প্রেমের নিকট তুচ্ছ।

রূপকথায় যেমন শুনা যায় এ ক্ষেত্রেও সেইরূপ দেখিতেছি—আমাদের ঘরের এই নূতন রাণী সুয়া রাণী নিস্ফল, বন্ধ্যা। এতকাল এত যত্নে এত সম্মানে সে মহিষী হইয়া আছে কিন্তু তাহার গর্ভে আমাদের একটি সন্তান জন্মিল না। তাহার দ্বারা আমাদের কোন সজীব ভাব আমরা প্রকাশ করিতে পারিলাম না। একেবারে বন্ধ্যা যদি বা না হয় তাহাকে মৃতবৎসা বলিতে পারি, কারণ, প্রথম প্রথম গোটাকতক কবিতা এবং সম্প্রতি অনেকগুলা প্রবন্ধ জন্মলাভ করিয়াছে কিন্তু সংবাদপত্রশয্যাতেই তাহারা ভূমিষ্ঠ হয় এবং সংবাদপত্ররাশির মধ্যেই তাহাদের সমাধি।

আর, আমাদের দুয়ারাণীর ঘরে আমাদের দেশের সাহিত্য, আমাদের দেশের ভাবী আশা ভরসা, আমাদের হতভাগ্য দেশের একমাত্র স্থায়ী গৌরব জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এই শিশুটিকে আমরা বড় একটা আদর করি না; ইহাকে প্রাঙ্গণের প্রান্তে উলঙ্গ ফেলিয়া রাখি, এবং সমালোচনা করিবার সময় বলি—ছেলেটার শ্রী দেখ! ইহার না আছে বসন, না আছে ভূষণ; ইহার সর্ব্বাঙ্গেই ধূলা! ভাল তাই মানিলাম,—ইহার বসন নাই, ভূষণ নাই, কিন্তু ইহার জীবন আছে। এ প্রতিদিন বাড়িয়া উঠিতে থাকিবে। এ মানুষ হইবে এবং সকলকে মানুষ করিবে। আর

আমাদের ঐ সুয়োরাণীর মৃত সন্তানগুলিকে বসনে ভূষণে আচ্ছন্ন করিয়া যতই হাতে হাতে কোলে কোলে নাচাইয়া বেড়াইনা কেন কিছুতেই উহাদের মধ্যে জীবনসঞ্চার করিতে পারিব না।

আমরা যে কয়টি লোক বঙ্গভাষার আহ্বানে একত্র আকৃষ্ট হইয়াছি, আপনাদের যথাসাধ্য শক্তিতে এই শিশু সাহিত্যটিকে মানুষ করিবার ভার লইয়াছি—আমরা যদি এই অভূষিত ধূলি-মলিন শিশুটিকে বক্ষে তুলিয়া লইয়া অহঙ্কার করি, ভরসা করি কেহ কিছু মনে করিবেন না। যাঁহারা রাজসভায় বসিতেছেন তাঁহারা ধন্য, যাঁহারা প্রজাসভায় বসিতেছেন তাঁহাদের জয়জয়-কার,—আমরা এই উপেক্ষিত অধীন দেশের প্রচলিত ভাষায় অন্তরের সুখ দুঃখ বেদনা প্রকাশ করি, ঘরের কড়ি খরচ করিয়া তাহা ছাপাই এবং ঘরের কড়ি খরচ করিয়া কেহ তাহা কিনিতে চাহেন না—আমাদের অনুগ্রহ করিয়া কেবল একটুখানি অহঙ্কার করিতে দিবেন! সেও বর্ত্তমানের অহঙ্কার নহে ভবিষ্যতের অহ-ঙ্কার—আমাদের নিজের অহঙ্কার নহে, ভাবী বঙ্গদেশের, সম্ভবতঃ ভাবী ভারতবর্ষের অহঙ্কার! তখন আমরাই বা কোথায় থাকিব, আর এখনকার দিনের উড্ডীয়মান বড় বড় জয়পতাকাগুলিই বা কোথায় থাকিবে! কিন্তু এই সাহিত্য তখন অঙ্গদকুণ্ডলউষ্ণীষে ভূষিত হইয়া সমস্ত জাতির হৃদয়সিংহাসনে রাজমহিমায় বিরাজ করিবে এবং সেই ঐশ্বর্য্যের দিনে মাঝে মাঝে এই বাল্য সুহৃদ-দিগের নাম তাহার মনে পড়িবে এই স্নেহের অহঙ্কারটুকু আমাদের আছে!

আজ আমরা এ কথা বলিয়া অলীক গর্ব্ব করিতে পারিব না, যে, আমাদের অদ্যকার তরুণ বঙ্গসাহিত্য পৃথিবীর ঐশ্বর্য্যশালী বয়স্ক সাহিত্যসমাজে স্থান পাইবার অধিকারী হইয়াছে—বঙ্গসাহি-

[illegible] রসের খাঁটি অত্যন্ত, অল্পই বঙ্গসাহিত্যের আদরণীয় [illegible] আমরা, এ কথা স্বীকার করি।—কিন্তু স্বীকার করিয়াও [illegible] বঙ্গসাহিত্যকে ক্ষুদ্র মনে হয় না।—সে কি কেবল অনুরাগের [illegible] তাহা নহে। আমাদের বঙ্গসাহিত্যে এমন একটি সময় আসিয়াছে যখন সে আপন ভাবী সম্ভাবনাকে আপনি অন্তরের মধ্যে অনুভব করিতেছে. এই জন্য বর্তমান প্রত্যক্ষ দৈন্য যুক্ত হইয়াও সে আপনাকে অবহেলাযোগ্য বলিয়া মনে করিতে পারিতেছে না। বসন্তের প্রথম অভ্যাগমে যখন বনভূমিতলে মুকুল এবং কুসুমাঙ্কুর, নব কিশলয়ের প্রচুর উদ্গম অনারব্ধ আছে—যখন বনশ্রী আপন অপরিসীম পুষ্পৈশ্বর্য্যের সম্পূর্ণ পরিচয় দিবার অবসর প্রাপ্ত হয় নাই—তখনও সে যেমন আপন অঙ্গে প্রত্যঙ্গে শিরায় উপশিরায় এক নিগূঢ় জীবনরসসঞ্চার, এক বিপুল ভাবী মহিমা উপলব্ধি করিয়া আসন্ন যৌবনগর্ব্বে সহসা উৎফুল্ল হইয়া উঠে,—সেইরূপ আজ বঙ্গসাহিত্য আপনি অন্তরের মধ্যে এক নূতন প্রাণশক্তি এক বৃহৎ বিকাশের পূর্ব্বসূচনা অনুভব করিয়াছে—সমস্ত বঙ্গহৃদয়ের সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষার আন্দোলন সে আপনার নাড়ীর মধ্যে উপলব্ধি করিতেছে—সে জানিতে পারিয়াছে সমস্ত বাঙ্গালীর অন্তর অন্তঃপুরের মধ্যে তাহার স্থান হইয়াছে; এখন সে ভিখারিণীবেশে কেবল ক্ষমতাশালীর দ্বারে দাঁড়াইয়া নাই, তাহার আপন গৌরবের প্রাসাদে তাহার অক্ষুণ্ণ অধিকার প্রতিদিন বিস্তৃত ও দৃঢ় হইতেছে চলিয়াছে। এখন হইতে সে সম্পদে বিপদে সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে সমস্ত বাঙ্গালীর

গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ
প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।

[illegible] বঙ্গসাহিত্য অদ্য প্রায় একশত বৎসর হইল জন্মলাভ করি-

য়াছে; আর এক শত বৎসর পরে যদি এই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সভার শততম বার্ষিক উৎসব উপস্থিত হয় তবে সেই উৎসব সভায় যে সৌভাগ্যশালী বক্তা বঙ্গসাহিত্যের জয়গান করিতে দণ্ডায়মান হইবেন, তিনি আমাদের মত প্রমাণরিক্তহস্তে কেবলমাত্র অন্তরের আশা এবং অনুরাগ, কেবলমাত্র আকাঙ্ক্ষার আবেগ লইয়া, কেবলমাত্র অপরিস্ফুট অনাগত গৌরবের সূচনার প্রতি লক্ষ্য করিয়া অতিপ্রত্যুষের অকস্মাৎ-জাগ্রত একক বিহঙ্গের অনিশ্চিত মৃদু কাকলীর স্বরে সুরে বাঁধিবেন না—তিনি স্ফুটতর অরুণালোকে জাগ্রত বঙ্গকাননে বিবিধ কণ্ঠের বিচিত্র কলগানের অধিনেতা হইয়া বর্ত্তমানের উৎসাহে আনন্দধ্বনি উচ্ছ্বিত করিয়া তুলিবেন—এবং কোন কালে যে অমানিশীথের একাধিপত্য ছিল, এবং অদ্যকার আমরা, যে, প্রদোষের অন্ধকারে ক্লান্তি এবং শান্তি, আশা এবং নৈরাশ্যের দ্বিধার মধ্যে সকরুণ দুর্ব্বল কণ্ঠের গীতগান সমাপ্ত করিয়া নিদ্রা গিয়াছিলাম সে কথা কাহারও মনেও থাকিবে না।*

আলোচনা।

ফেরোজশা মেটা।

মাননীয় ফেরোজশা মেটা ভারতমন্ত্রীসভায় পুলিস্ বিলের যে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন তাহা আমাদের কর্ত্তৃপুরুষদিগের সহ্য হয় নাই। হঠাৎ একটা বজ্রের শব্দ শুনিলে ছেলেরা কাঁ

* এই প্রবন্ধ ১৫শে চৈত্র রবিবার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সাম্বৎসরিক উৎসব সভায় পঠিত হয়।

উঠে—তাঁহারা মনে করে কে যেন উপর হইতে তাহাদের প্রতি
ভারি একটা অন্যায় করিল, যেন তাহাদের কোথায় এক জায়গায়
গায় যা লাগিয়াছে—শ্রীযুক্ত মেটা ভারত সভায় যে বক্তৃতা করিয়া-
ছিলেন তাহাতে যদিও তিনি কাহাকেও আঘাত করেন নাই
তথাপি হঠাৎ তাহার শব্দে এবং নূতন আলোকের ছটায় সাহেবদের
মনে হইল তাঁহাদের নিবিড় সবিবেক সুকোমল পৃষ্ঠে বুঝি
কে মুষ্টিপাত করিল অমনি তাঁহারা বিচলিত হইয়া উঠিলেন। একটা
নূতন আলোক অকস্মাৎ একটা জ্যোতিষ্ক কথাসাতের মত মর্ত্য-
লোকের আকাশের গায়ে চমক দিয়া গিয়াছিল—তাই সাহেবরা
অকস্মাৎ এতই চকিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, যে, তাঁহারা মনে
করিতে পারেন নাই তাঁহাদিগকে কেহ আঘাত করে নাই।

মেটা বলিয়াছিলেন—যিনি বিচারে দোষী সাব্যস্ত হইয়া
তাঁহার আপিলের অধিকার না দিলে অবিচারের সম্ভাবনা
আছে। কর্তৃপুরুষেরা ক্ষাপা হইয়া বলিয়া উঠিলেন—কেন,
আমরা কি তবে সকলেই অবিচারী? গম্ভীরভাবে ইহার উত্তর
দিতে বসিলে আমাদের কর্তাদের বুদ্ধির প্রতি অসম্মান প্রদর্শন
করা হয়—কেবল, এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করি, তবে কোন আপ-
রাধের জন্য কোন প্রকার বাঁধা বিচারপ্রণালী থাকে কেন?
আমাদের স্বর্গসম্ভব সিবিলসার্বিসের সভ্যগণকেও আইন পালন
করিয়া বিচার করিতে হয় এ অপমান তাঁহারা স্বীকার করেন
কেন? নিয়ম মাত্রই ত মানুষের স্বেচ্ছাধীন বিবেচনা, স্বাধীন
ধর্ম্মবুদ্ধি এবং অবাধ জনমবৃত্তির প্রতি সন্দেহ প্রকাশ।

তাহার পরে আবার বাজেটের আলোচনা কালেও আনা-
দের বাঙ্গলাদেশের ছোট বিরাট স্কুলবালকদের মত পলা করিয়া
শ্রীযুক্ত মেটাকে বিস্তর উপদেশপূর্ণ ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন। তিনি

বলেন মেটা সাহেব খুব ভাল ছেলে শুনিয়াছিলাম কিন্তু তিনি আমাদের আশানুরূপ উচ্চ নম্বর রাখিতে পারিতেছেন না অতএব তাঁহাকে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করা যায়। কর্ত্তাদের মতে, বজেটের আলোচনায় শ্রীযুক্ত মেটা কোন প্রকার কাজের পরামর্শ দেন নাই কেবল সাধারণভাবে বিরোধ প্রকাশ করিয়াছেন।

মেটা সাহেব বলিয়াছিলেন, সৈন্যবিভাগের খরচ অত্যন্ত বেশি বাড়িয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব্ব রাজস্বসচিব সার্ অক্লাণ্ড কলভিন্‌ও ঐ কথা বলিয়াছেন।

ওয়েষ্ট্‌ল্যাণ্ড্ সাহেব পাকেপ্রকারে বলেন খরচ বাড়ে নাই এক্সচেঞ্জের দুর্ব্বিপাকে অধিক টাকা নষ্ট হইতেছে। তিনি বলেন পৌণ্ডের হিসাবে হিসাব ধরিলে খরচ কম দৃষ্ট হইবে। এ কৈফিয়ৎটার মধ্যে কিছু চোখে ধূলা দেওয়া আছে এইরূপ আমরা অনুমান করি। ভারতবর্ষে যখন রৌপ্যমুদ্রায় অধিকাংশ খরচ নির্ব্বাহিত হয় তখন পৌণ্ড্‌হিসাবে হিসাব করিয়া খরচ কম দৃষ্ট হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাহাতে ব্যয়ের ন্যূনতা প্রমাণ হয় না। অতএব ওয়েষ্ট্‌ল্যাণ্ড্ সাহেবের এ যুক্তির মধ্যে সরলতা নাই এবং তাহাতে আমাদের কোন সান্ত্বনাও দেখি না।

আমরা কাজের কথা কি বলিব? আমরা যদি বলি, সাহেব কর্ম্মচারীদিগকে ক্ষতিপূরণবৃত্তি (কম্পেন্সেশন্ অ্যালাউয়েন্স) দিবার আবশ্যক নাই, তোমরা বলিবে, না দিলে নয়। বর্ত্তমান এক্সচেঞ্জের হিসাবে ধরিয়াও তোমাদের স্বদেশের সহিত এখানকার খরচের তুলনা করিয়া দেখ। এখানে বিদেশে থাকিয়া তোমাদের খরচ বেশি হয়? কেন হয়? এমন যদি বুঝিতাম এখানে তোমাদের যেরূপ চাল্ বিলাতেও তোমাদের সেই চাল্ তাহা হইলে আমাদের কোনও আপত্তির কারণ ছিল না। বিলাতের মধ্যবিত্ত অব-

কার কয় ... অধিক বৎসরের মধ্যে কয়দিন শ্যাম্পেন্-ডিনার
ভোগ করিয়া থাকেন? এ কথা কি সাহেবরা অস্বীকার করিতে
পারেন যে, তার পর তাঁহারা বিস্তর অনভ্যস্ত এবং অনাবশ্যক
নবাবী করিয়া থাকেন? সে সমস্ত যদি তাঁহারা কিঞ্চিৎ খাটো
করিতে প্রস্তুত হইতেন তাহা হইলে কি আমাদের এই সকল
অল্প-উপবাসীদের কষ্টসঞ্চিত উদরান্নে হাত দিতে হইত?

গল্পে কথিত আছে, বাবু যখন গোয়ালার বিল্ হইতে তাহার
অর্ধেক পাওনা কাটিয়া দিলেন তখনো সে প্রসন্নমুখে তাঁহাকে
প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল—তাহার প্রসন্নতার কারণ জিজ্ঞাসা
করিলে সে কহিল, এখনো দুধে পৌছায় নাই। অর্থাৎ কাটাটা
কেবল উপর উপর দিয়াই গিয়াছে। প্রতিকূল এক্সচেঞ্জেও এখনো
সাহেবদের হুইস্কি সোডা এবং মুর্গি মটনে আঘাত করে নাই তাহা
বড় জোর শ্যাম্পেন টোকে, এবং অতিরিক্ত ঘোড়া ঘোড়দৌড়ের
উপর দিয়াই গিয়াছে; কিন্তু কম্পেন্সেশন অ্যালাউয়েন্স আমা-
দের মোটা চাউল এবং বহুজলমিশ্রিত কলাইয়ের ডালে গিয়া
হস্তক্ষেপ করিয়াছে।

আমরা বলিতেছি, তোমাদের ভারত শাসনের যন্ত্রটা অত্যন্ত
বহুব্যয়সাধ্য হইয়াছে—যদি অধিকতর পরিমাণে দেশী লোক
নিয়োগ কর তাহা হইলে সস্তা হয়। তাহাতে যে কাজ খারাপ
হয় এমন কোনও প্রমাণ নাই। তোমরা বলিবে সে কোন মতেই
হইতে পারে না।

তোমাদের কথাটা এই, আমরা সৈন্য বিভাগের বিস্তার করিব,
ভারতবর্ষের ছশো পাঁচশ মাইল দূরে যেখানে যত ভীমরুলের চাক
আছে গায়ে পড়িয়া সবগুলাতে খোঁচা মারিয়া বেড়াইব, ইংরাজ-
কর্মচারীদিগকে ক্ষতিপূরণবৃত্তি দিব, এবং মোটা পদের ইংরাজ

কর্ম্মচারী নিয়োগ করিয়া ভারতবর্ষের রক্তরিক্ত ...র মোটা দাঁত বসাইয়া খাদ্য শোষণ করিব—ইহার অন্যথা হইবে না, এক্ষণে ব্যয়-সংক্ষেপ সম্বন্ধে আমাদিগকে কাজের পরামর্শ দাও।

অনেক সময় যথার্থ কাজের পরামর্শ অত্যন্ত সহজ এবং পুরাতন। অজীর্ণ রোগী যত বড় ডাক্তারের নিকট উপদেশ লইতে যাক্ সকলেই বলিবেন তুমি পথ্যাসংযম কর। কিন্তু রোগী যদি বলে "ওটা কোন কাজের কথা হইল না—আমি ঘৃতপক্ক অখাদ্য খাইবই, এবং ক্ষুধার অবস্থা যেমনই থাক্ আহারের পরিমাণ বাড়াইতে থাকিব, তুমি যদি বড় ডাক্তার হও আমাকে একটা চিকিৎসার উপায় বলিয়া দাও"—তবে সে রোগীর নিকট খাদ্য পরিবর্ত্তন, বায়ুপরিবর্ত্তন প্রভৃতি স্বাস্থ্যতত্ত্বের সমস্ত মূলনীতিই নিতান্ত বাজে এবং সাধারণ কথা বলিয়াই মনে হইবে।

বিবাহ করিতে উদ্যত কোন যুবকের প্রতি পাঞ্চ্ পত্রিকায় একটি অত্যন্ত সহজ এবং সংক্ষিপ্ত উপদেশ ছিল - সেটি এই:—"এমন কাজ করিয়োনা!" অপব্যয় করিতে উদ্যত গবর্মেণ্টের প্রতিও এতদপেক্ষা সহজ এবং সঙ্গত উপদেশ হইতে পারে না। ফেরোজশা মেটা সেই উপদেশটি দিয়াছিলেন,—তাহাতেই কর্ত্তারা অত্যন্ত উষ্মা প্রকাশ পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন ইহা কোন কাজের উপদেশ হইল না।

বেয়াদব।

কৌন্সিল্ সভায় একটা নূতন জীবনের লক্ষণ দেখা দিয়াছে ইহাতেই রাজপুরুষেরা কিছু ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। এতদিন মন্ত্রণাকার্য্য যেন যন্ত্রের মত চলিয়া আসিতেছিল এখন হঠাৎ তাহারই মাঝখানে একটা ব্যথিত হৃদয়ের আওয়াজ শুনিয়া ছোট

হইতে, বড়কর্ত্তা পর্য্যন্ত ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছেন, তাঁহারা বলিতেছেন মন্ত্রিসভার [illegible] মধ্যে ভারতবর্ষের হৃদয়ের মত এমন একটা সজীব পদার্থকে হঠাৎ আনয়ন করা কেহ প্রত্যাশা করে নাই — কৌন্সিল সভায় এত বড় বেয়াদবি ইতিপূর্ব্বে কখনো ঘটে নাই।

কিন্তু, হায়, এই অবাধ্য বেয়াদবটিকে আর ত চাপিয়া রাখা যায় না! এ এখন সর্ব্বত্রই প্রবেশ করিতেছে। সভা, সমিতি, সাহিত্য, সংবাদপত্র, সমুদ্রপারের পার্লামেণ্ট পরিষদ, সর্ব্বত্রই ইহার অভ্যুদয় দেখা যাইতেছে। অবশেষে সজীব ভারতবর্ষ তাহার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা দুর্গমতম স্থানের দ্বারমোচন করিয়াছে, সে ভারতমন্ত্রিসভায় প্রবেশ প্রাপ্ত হইয়াছে।

যাহার হস্ত আশ্রয় করিয়া ভারতবর্ষের হৃদয় এমন অসম্ভব-স্থানে আপনাকে প্রকাশ করিতে পারিয়াছে সেই ফিরোজ শা মেটার নিকট অদ্যকার হইতে আমরা ভারতবাসী প্রকাশ্যে কৃতজ্ঞ রহিলাম। [illegible] মেটা যে কাজে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন তাহাতে সফল হইতে পারেন নাই কিন্তু তাহা হইতে উচ্চতর সফলতা লাভ করিয়াছেন।

কিন্তু এই উপলক্ষ্যে গবর্মেন্ট এবং প্রজার মধ্যে আর এক বিভাগের সৃষ্টি হইল। মন্ত্রিসভায় এক পক্ষে ভারতবর্ষ এবং অন্যপক্ষে গবর্মেন্ট দণ্ডায়মান হইলেন; ইহাতে মাঝে মাঝে সংঘাত সংঘর্ষ হইবেই। সর্ব্বত্রই এইরূপ হইয়া থাকে। যেখানে জীবন প্রবেশ করিয়াছে সেইখানেই জীবনের যুদ্ধ অনিবার্য্য।

কিন্তু আমরা দুর্ব্বল পক্ষ। এ সংঘাতে কি আমাদের ভাল হইবে? যাঁহারা কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ প্র্যাক্টিক্যাল ফলের দিকে দৃষ্টি রাখেন তাঁহারা [illegible] নিরাশ হইবেন। অনেক সময় কেবল দলাদলির জিদ্ বজায় রাখিতে গিয়া গবর্মেন্ট আমাদের

সঙ্গত প্রস্তাবকেও অগ্রাহ্য করিবেন। কিন্তু সভ্যসমাজে গায়ের জোর একমাত্র জোর নহে; ক্রমশ আমরাই আবিষ্কার করিতে থাকিব যে যুক্তির বল, ঐক্যের বল, নিষ্ঠার বল, অধ্যবসয়ের বল সামান্য নহে। আমরা নিজে যুঝিয়া চেষ্টা করিয়া যতটুকু ক্ষুদ্র ফল পাই সেও পরের অযাচিত বদান্যতার অপেক্ষা মহত্তর।

আমরা যে আমরা, আমাদের লোক যে আমাদেরই লোক, এই চেতনাটি যত প্রকারে যত আকারে সজাগ হইয়া উঠে ততই আমাদের মঙ্গল; আমাদের কাজ আমাদের দেশের লোক করিতেছে ইহা আমরা যেখানে যত পরিমাণে দেখিতে পাই ততই আমাদের পক্ষে আনন্দের বিষয়। সম্ভবতঃ অনেকস্থলে আমরা অনেক ভ্রম করিব, অনেক অযথাচরণ করিব, এমন কি, অনভিজ্ঞতা বশতঃ আমাদের নিজেদের স্বার্থেও আঘাত দিব তথাপি পরিণামে তাহাতে আমাদের পরিতাপের বিষয় থাকিবে না! অতএব ভারতমন্ত্রীসভায় যে লোক আমাদে[illegible] ব্যথিত হইয়া কর্ত্তৃপক্ষের লাঞ্ছনা শিরোধার্য্য করিয়া আমাদের হইয়া লড়িয়াছেন রাজপুরুষেরা তাঁহার উপদেশকে যতই তুচ্ছ জ্ঞান করুন, তাঁহার সকল চেষ্টাই নিষ্ফল হউক্, তথাপি তাঁহাকে আমরা ভারতবাসীরা যে আপনার লোক বলিয়া এক সকৃতজ্ঞ আত্মীয়তার আনন্দ অনুভব করিতেছি সেই আনন্দের মূল্য নাই। তাঁহাকে আমাদের সুহৃৎ জানিয়া তাঁহার প্রতি আমাদের প্রীতি প্রকাশ করিয়া আমরা অলক্ষিত ভাবে আপনারা সকলেই ঘনিষ্ঠতর সৌহার্দ্যবন্ধনে বদ্ধ হইতেছি।

এক্ষণে কর্ত্তৃগণের নিকট নিবেদন এই যে, ভারতবর্ষের নবজাগ্রত হৃদয়টি যদি তাঁহাদের রাজসভায়, আরামশালায়, পাঠ্যপুস্তকে, তাঁহাদের সুখস্বপ্নে, তাঁহাদের সুরচিত সংকল্পের মাঝখানে

গিয়া হঠাৎ প্রকাশ করে তবে তাহার সেই বেয়াদবিটি মাপ করিতে হইবে। হৃদয় জিনিষটাই বেয়াদব—তাহাদের নিজের পার্লামেন্টে, সাহিত্যে, সমাজে, তাহার অনেক পরিচয় পাওয়া পাওয়া যায়। তবে যে ভারতবর্ষে তাহার অস্তিত্ব তাঁহাদের অতিমাত্র অসহ্য বোধ হইতেছে, তাহার একটা কারণ, ভারতবর্ষবাসীদের হৃদয়ের চর্চা তাঁহাদের অনভ্যস্ত হইয়া গেছে। অন্য কোন কারণ আছে কি না জানি না।

কথামালার একটি গল্প।

এক কৃষক কৃষিকর্ম্মের কৌশল সকল বিলক্ষণ অবগত ছিল। সে পুত্রদিগকে ঐ সকল কৌশল শিখাইবার নিমিত্ত, মৃত্যুর পূর্ব্ব ক্ষণে বলিল, হে পুত্রগণ! আমি এক্ষণে ইহলোক হইতে প্রস্থান করিতেছি। আমার যে কিছু সংস্থান আছে, দ্রাক্ষা ক্ষেত্র ভূমিতে অনুসন্ধান করিলে পাইবে। পুত্রেরা মনে করিল ঐ সকল ভূমির অভ্যন্তরে পিতার গুপ্তধন স্থাপিত আছে।

কৃষকের মৃত্যুর পর, তাহারা গুপ্তধনের লোভে সেই সকল ভূমির অতিশয় খনন করিল। এইরূপে যার পর নাই পরিশ্রম করিয়া তাহারা গুপ্তধন কিছু পাইল না বটে, কিন্তু, ঐ সকল ভূমি অতিশয় খনন হওয়াতে, সে বৎসর এত শস্য জন্মিল, যে, গুপ্তধন পাইয়াও তাহারা পরিশ্রমের সম্পূর্ণ ফল পাইল।

কথামালা। ৩৮ পৃষ্ঠা

আমাদের পোলিটিক্যাল ক্ষেত্র হইতে কোন গুপ্তধন পাই আমাদের সকল দুঃখ দূর হইবে এরূপ যাহারা প্রত্যাশা করে তাহারা নিরাশ হইবেন—কিন্তু সকলে একত্র মিলিয়া কর্ষণে যে শ জন্মিবে তাহাতে পরিশ্রমের সম্পূর্ণ ফল পাওয়া যাইবে।

—

প্রেম-পঞ্জিকা।

(Charles Kent-রচিত Love's Calendar কবিতার অনুকরণ)

চারিদিকে যবে ফুটিবে কুসুম,
গাছে বিকাশিবে কিশলয়,
বহিবে মন্দ দখিণা বাতাস,
পাখীরা গাহিবে বনময় ;
জগৎ জুড়িয়া মধুরতা,
তখন কহিয়ো প্রেম-কথা।

বাতাস যখন ঢালিবে হুতাশ
কুসুম পত্র শুকাইবে,
ধূলা-বালুকায় ভরিবে ভুবন,
কোকিল পাপিয়া লুকাইবে,
জগৎ জুড়িয়া অলসতা,
তখন্ কহিয়ো প্রেম-কথা।

গগন যখন তিমির-মগন,
ঘিরিবে সঘন ঘনঘটা,
পড়িবে বৃষ্টি, ধাঁধিয়া সৃষ্টি
ঝলিবে বিজলী খর-ছটা ;
জগৎ জুড়িয়া ব্যাকুলতা
তখন কহিয়ো প্রেম-কথা।

প্রভাতে যখন শুভ্র মেঘেরা
করিবে নিত্য ছুটোছুটি,

হংসী ভাসিবে স্বচ্ছ সরোজে
কাশের চামর রবে ফুটি ;
জগৎ জুড়িয়া উজ্জ্বলতা,
তখন কহিয়ো প্রেম-কথা।

শীতল যখন বহিবে সমীর
পড়িবে শিশির সারারাতি,
হবে নির্ম্মল নদনদীজল,
ক্ষেত্রে খেলিবে শ্যাম ভাতি।
জগৎ জুড়িয়া শীতলতা,
তখন কহিয়ো প্রেম-কথা।

গাঁদাফুলে যবে ভরিবে বাগান,
রবিকর হবে প্রিয়তর,
উষার দৃষ্টি কুহেলি-আকুল,
হিমে নিশীথিনী জরজর ;
জগৎ জুড়িয়া অসাড়তা
তখন কহিয়ো প্রেম-কথা।

প্রেমের নিন্দা কভু করিয়ো না,
ঘোর বিদ্রোহ জানিবে তা;
শীত বসন্তে সন্ধ্যা প্রভাতে
সকল সময় প্রেম নেতা।
প্রেমের সমান কোথাও নাহি,
— আমরা তাহার বিজয় গাহি।

গ্রন্থ সমালোচনা।

রঘুবংশ। দ্বিতীয় ভাগ। শ্রীনবীনচন্দ্র দাস এম, এ, কর্ত্তৃক অনুবাদিত। মূল্য এক টাকা।

বাঙ্গলা ভাষায় সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থের অনুবাদ করা নিরতিশয় কঠিন কাজ; কারণ, সংস্কৃত কবিতার শ্লোকগুলি ধাতুময় কারুকার্য্যের ন্যায় অত্যন্ত সংহতভাবে গঠিত—বাঙ্গলা অনুবাদে তাহা বিশ্লিষ্ট এবং বিস্তীর্ণ হইয়া পড়ে। কিন্তু নবীন বাবুর রঘুবংশ অনুবাদ খানি পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি। মূল গ্রন্থখানি পড়া না থাকিলেও এই অনুবাদের মাধুর্য্যে পাঠকদের হৃদয় আকৃষ্ট হইবে সন্দেহ নাই। অনুবাদক সংস্কৃত কাব্যের লাবণ্য বাঙ্গলাভাষায় অনেকটা পরিমাণে সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন ইহাতে তাঁহার যথেষ্ট ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু পঞ্চদশ সর্গে তিনি যে দ্বাদশাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন তাহা আমাদের কর্ণে ভাল ঠেকিল না। বাঙ্গলার পয়ার ছন্দে প্রত্যেক ছত্রে যথেষ্ট বিশ্রাম আছে,—তাহা চতুর্দ্দশ অক্ষরের হইলেও তাহাতে অন্যূন ষোলটি মাত্রা আছে—এই জন্য পয়ার ছন্দে যুক্ত অক্ষর ব্যবহার করিবার স্থান পাওয়া যায়; কিন্তু দ্বাদশাক্ষর ছন্দে যথেষ্ট বিশ্রাম না থাকাতে যুক্ত অক্ষর ব্যবহার করিলে ছন্দের সামঞ্জস্য নষ্ট হইয়া যায়; যেন কুঠির পান্সীতে মহাজনী নৌকার মাল তোলা হয়। দ্বাদশাক্ষর ছন্দে ধীর গমনের গাম্ভীর্য্য না থাকাতে তাহাতে সংস্কৃত কাব্যসুলভ ঔদার্য্য নষ্ট করে। আমরা সমালোচ্য অনুবাদ হইতে একটি পয়ারের এবং একটি দ্বাদশাক্ষরের শ্লোক পরে পরে উদ্ধৃত করিলামঃ—

প্রসবান্তে কৃশা এবে কোশল-নন্দিনী,
শয্যায় শোভিছে পাশে শয়ান কুমার—

[illegible] শ্রীগাত্রী যথা ভুবনতরঙ্গিনী
প্লাবিলে পুলকে পথ পুলিনে যাঁহার।

যে অন্নদাত্রী মাতা [illegible]
শশীন্দ্রের কণা উৎক্ষিপ্ত আসনে
আসিলা বসুধা স্ফুরিত কিরণে,
যাঁর তটে নীর সমুদ্র-মেখলা।

শেষোক্ত কবিতাটির প্রত্যেক যুক্ত অক্ষরে রসনা বাধা প্রাপ্ত [illegible] কিন্তু শব্দের অনুসারে প্রত্যেক যুক্ত অক্ষরে ছন্দের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে। এমন কি, দ্বিতীয় ছত্রে আর একটি যুক্ত অক্ষরের [illegible] যায়।

কুসুমের তোড়া। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য এক আনা।

এই ক্ষুদ্র কাব্য গ্রন্থখানির মধ্যে "উনবিংশ শতাব্দী [illegible]" কবিতাটি আমাদের ভাল লাগিয়াছে।

শীতের বসন্ত। শ্রীনিতাইসুন্দর সরকার প্রণীত। মূল্য চারি আনা।

গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিতেছেন—"পাখী গান গাহিয়া যায়,—মিঠে, কি কড়া,—ভালরূপে শুনিয়া, ভাল কি মন্দ বলিবে,—সে আর কোন ধার ধারে না; সে শুধু, আপন মনে আপনিই, নীলাকাশ প্রতিধ্বনিত করিয়া, গাহিয়া যায়।" অতএব তবেও যদি আমরা এই গ্রন্থনিহিত গান কয়টি ভাল না বলিলেও, গ্রন্থকারের নীলাকাশ প্রতিধ্বনিত করিবার কোন ব্যাঘাত হইবে না।